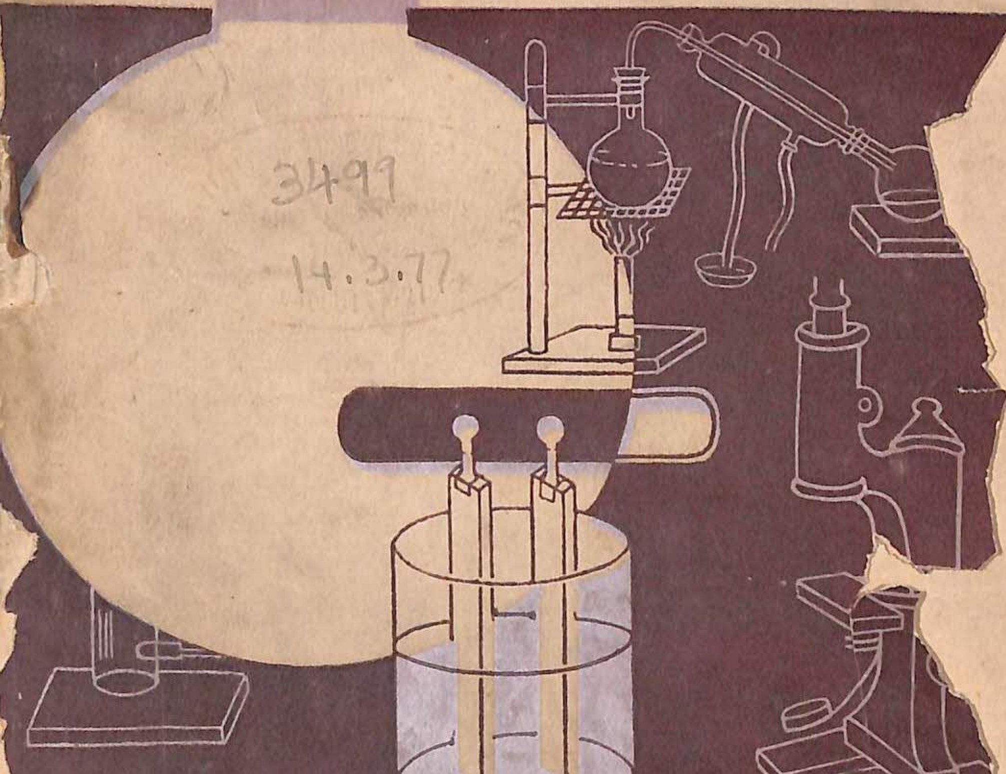
মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞান



শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
ও
অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস

মাধ্যমিক

ভৌত বিজ্ঞান

নবম শ্রেণীর পাঠ্য (Class IX)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নবপ্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থানুযায়ী নির্দিষ্ট ভৌত বিজ্ঞান (Physical Science) বিষয়ক পাঠ্যসূচী অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক হিসাবে লিখিত

মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞান

(নবম শ্রেণীর পাঠ্য)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত 'মানব-কল্যাণে রসায়ন', দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংদাস পুরস্কার' প্রাপ্ত 'বিজ্ঞান ভারতী', 'কিশোর বিজ্ঞানী', 'মাধ্যমিক বিজ্ঞান' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ-প্রণেতা।

ও

অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস, এম. এস.-সি., ডি-ফিল.

কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও 'মাধ্যমিক বিজ্ঞান' গ্রন্থ-প্রণেতা।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

10, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-12

প্রকাশক :
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
পক্ষে শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
10, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-12

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, 1974
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, 1974

চিত্রশিল্পী :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীচিত্ত রায়
কলিকাতা।

মূল্য—চার টাকা আশি পয়সা মাত্র।

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শংকর প্রিন্টার্স
27/3B, হরি ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-6

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : সাধারণ তথ্যাদি

দ্বিতীয় অধ্যায় : পদার্থ-বিদ্যা

তৃতীয় অধ্যায়: রসায়ন

প্রথম অধ্যায়

ঃ সাধারণ তথ্যাদি ঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ সাধারণ তথ্যাদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিমাপের একক ও পদ্ধতি

(Units and Systems of Measurement)

পাঠ্যসূচী: বিভিন্ন ভৌত রাশি ও তাহাদের এককসমূহ; পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি; পরিমাপের বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশলঃ সাধারণ স্কেল, সাধারণ তুলাদণ্ড, পরিমাপক চোঙ, ঘড়ি।

রাশি ও একক (Quantities and Units):

বিজ্ঞান হইল যে-কোন বিষয়ের সুনির্দিষ্ট ও সঠিক জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের সঠিক পরিমাপ জানা একান্ত প্রয়োজন। কোন-কিছু মাপিয়া সঠিক সংখ্যা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে না পারিলে তৎসম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত সুনির্দিষ্ট জ্ঞান হয় না। দৈনন্দিন জীবনেও আমরা দুইটি দণ্ডের কোন্‌টি বড় পাশাপাশি ধরিয়া তাহা বলিতে পারি; কিন্তু কতটা বড় তাহা উহাদের **দৈর্ঘ্য** (length) না মাপিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। দুধ কিনিতে গেলে উহার **আয়তন** (volume) মাপিয়া লইতে হয়; মাছ কিনিবার সময় উহার **ভর** (mass) * অর্থাৎ বস্তু-পরিমাণ ওজন করিয়া লই। কোন কাজ করিতে কত **সময়** (time) লাগে তাহা হিসাব করিতে হয়। আমরা এই দৈর্ঘ্য, আয়তন, ভর ও সময়ের পরিমাপ যথাক্রমে মিটার (metre), লিটার (litre), গ্রাম (gram) ও মিনিট (minute) এককের (unit) কোন গুণিতক সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করি।

দৈর্ঘ্য, আয়তন, ভর, সময় প্রভৃতির বিভিন্ন পরিমাণ, অর্থাৎ বিভিন্ন **রাশি** (quantity) পরিমাপ করিতে হইলে সেই জাতীয় রাশির একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণকে মূল, বা প্রমাণ (standard) মাপকাঠি হিসাবে ধরিয়া লইতে হয়, যাহাকে বলা হয় ঐ রাশির **একক** (unit)। কোন রাশি তাহার এককের কত গুণ, বা কত ভগ্নাংশ সেই সংখ্যার দ্বারা রাশিটির পরিমাপ প্রকাশ করা হয়; অতএব বলা যায়, **রাশির পরিমাপ = সংখ্যা × রাশির একক।**

* কোন বস্তুর ভর (mass) ও ওজনের (weight) মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে; এখানে সাধারণভাবে উহাদের সমার্থক বলা হইল।

আমরা বলি, কোন পাত্রে 10 লিটার জল আছে। তরল পদার্থের আয়তন প্রকাশ করিবার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আয়তনকে **একক** (unit) ধরা হইয়াছে, যাহা লিটার (litre) নামে চিহ্নিত। বুঝা যায়, আয়তনের ঐ নির্দিষ্ট একক, বা মাপকাঠির 10গুণ জল ঐ পাত্রে আছে। এইরূপ দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন, ভর, গতিবেগ, উষ্ণতা, সময় প্রভৃতির জন্য বিভিন্নরূপ একক নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

প্রাথমিক একক ও লব্ধ একক :

(Fundamental Units and Derived Units)

প্রত্যেক রাশিরই এক-একটি সুনির্দিষ্ট একক আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক তিনটি স্বাধীন ও অন্য-নিরপেক্ষ ; অপরাপর সকল রাশির এককই ইহাদের সাহায্যে পাওয়া যাইতে পারে। এইজন্য **দৈর্ঘ্য** (length), **ভর** (mass) ও **সময়** (time) — এই তিনটির একককে বলা হয় **প্রাথমিক একক** (fundamental units) ; আর অন্যান্য বিভিন্ন রাশির একক এই তিনটি প্রাথমিক এককের ভিত্তিতে পাওয়া যায় বলিয়া উহাদের বলে **লব্ধ একক** (derived units)। এইভাবে, বস্তুর ক্ষেত্রফল, আয়তন, ঘনত্ব, গতিবেগ প্রভৃতি বিভিন্ন রাশির একক ঐ প্রাথমিক একক তিনটি হইতেই পাওয়া যাইতে পারে ; যেমন—**ক্ষেত্রফল** হইল দুইটি দৈর্ঘ্যের (linear measure) গুণফল (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) ; **আয়তন** হইল তিনটি দৈর্ঘ্যের গুণফল (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × বেধ) ; **ঘনত্ব** বলিতে বুঝায় ভর ও আয়তনের ভাগফল (ভর ÷ আয়তন)। আবার, কোন চলমান বস্তুর **গতিবেগ** বলিতে আমরা বুঝি, একক সময়ে বস্তুটি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করে, অর্থাৎ (দূরত্ব, বা দৈর্ঘ্য ÷ সময়)। এইভাবে বিভিন্ন রাশির একক উক্ত প্রাথমিক একক তিনটি হইতে পাওয়া যায়।

প্রধান দুইটি পরিমাপ-পদ্ধতি :

(Two main Systems of measurement)

উল্লিখিত তিনটি প্রাথমিক একক প্রকাশ করিবার দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে : (a) সি. জি. এস্. পদ্ধতি (C. G. S. system) ও (b) এফ্. পি. এস্. পদ্ধতি (F. P. S. system) :

(a) **সি. জি. এস্. পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক হইল সেন্টিমিটার (centimetre), ভরের একক গ্র্যাম (gram) এবং সময়ের একক

সেকেণ্ড (second) ধরা হইয়াছে। এই সেন্টিমিটার, গ্র্যাম ও সেকেণ্ড শব্দ তিনটির ইংরাজী আদ্যক্ষর লইয়া পদ্ধতিটির নামকরণ করা হইয়াছে সি. জি. এস্. (C. G. S.) পদ্ধতি।

এই পরিমাপ-পদ্ধতিটি প্রথমে ফরাসীদেশে উদ্ভাবিত হয় বলিয়া ইহাকে **ফরাসী পদ্ধতি** (French system)ও বলা হয়। আজকাল যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পৃথিবীর সর্বত্র এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয় এবং ইহা সাধারণতঃ **মেট্রিক পদ্ধতি** (Metric system) নামে পরিচিত। ইদানীংকালে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক আলোচনায়ই কেবল নহে, দৈনন্দিন জীবনেও এই পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে; তথাপি তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য পূর্ব প্রচলিত এফ. পি. এস. পদ্ধতিটিও জানা দরকার।

(b) **এফ্. পি. এস্. পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক ফুট (foot), ভরের একক পাউণ্ড (pound) ও সময়ের একক সেকেণ্ড (second) ধরা হইয়াছে। এই প্রাথমিক একক তিনটির ইংরাজী আদ্যক্ষর লইয়া ইহার নাম করা হইয়াছে এফ্. পি. এস. (F. P. S.) পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিটির প্রথম প্রচলন ঘটে ইংল্যাণ্ডে এবং সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে ইহার প্রচলন ছিল বলিয়া এই পদ্ধতিকে **বৃটিশ পদ্ধতি** (British system)ও বলা হয়। আজকাল ইংল্যাণ্ড ব্যতীত বিশেষ কোথাও ইহার আর তেমন প্রচলন নাই।

বিভিন্ন রাশির একক
(Units of different quantities)

A. দৈর্ঘ্যের একক (Unit of Length) :

1. সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের নির্দিষ্ট একক হইল **সেন্টিমিটার** (centimetre)। ফরাসীদেশের প্যারিস নগরীর নিকটবর্তী সেভার্ন নামক স্থানে 'আন্তর্জাতিক ওজন ও পরিমাপ সংস্থা'য় (International Bureau of Weights and Measures) প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম সংকর-ধাতুতে নির্মিত একটি দণ্ড 0°C তাপমাত্রায় রক্ষিত আছে; উহার উপরে দুইটি সুনির্দিষ্ট চিহ্নের মধ্যবর্তী দূরত্বকে এক **মিটার** (metre) দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। এক মিটারের 10 ভাগের এক ভাগকে বলা হয় ডেসিমিটার (decimetre), তাহার আবার 10 ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ মিটারের

100 ভাগের এক ভাগকে বলে **সেন্টিমিটার** (centimetre, সংক্ষেপে cm.), যে-দৈর্ঘ্যকে এই পদ্ধতিতে মূল একক (unit) ধরা হইয়াছে।

আবার, সেন্টিমিটারের 10 ভাগের এক ভাগকে বলে এক মিলিমিটার (millimetre)। পক্ষান্তরে, মিটারের দশ-দশ গুণিতক দৈর্ঘ্যকে যথাক্রমে ডেকামিটার (decametre), হেক্টোমিটার (hectometre) ও কিলোমিটার (kilometre) বলা হয়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দৈর্ঘ্য-রাশি মাপিবার জন্য মিটারের এইরূপ ভগ্নাংশিক ও গুণিতক দৈর্ঘ্য-মাপ এতদ্বিষয়ক আলোচনাকালে বিশেষ সুবিধাজনক হয়। সংক্ষেপে বলা যায়:

10 মিলিমিটার = 1 সেন্টিমিটার	10 মিটার = 1 ডেকামিটার
10 সেন্টি ,, = 1 ডেসিমিটার	10 ডেকামিটার = 1 হেক্টোমিটার
10 ডেসি ,, = 1 মিটার	10 হেক্টো ,, = 1 কিলোমিটার
অর্থাৎ 1000 মিলি ,, = 1 মিটার।	অর্থাৎ 1 কিলোমিটার = 1000 মিটার।

2. এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক (unit) হইল **ফুট** (foot)। লণ্ডনে 'বৃটিশ বণিক-সভা'র (British Board of Trade) দপ্তরে ব্রোঞ্জ-নির্মিত যে দণ্ডটি 62° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রক্ষিত আছে, তাহার উপরে দুইটি সুনির্দিষ্ট চিহ্নের মধ্যবর্তী দূরত্ব, বা দৈর্ঘ্যকে বলা হয় 1 **গজ** (yard); গজের এক-তৃতীয়াংশকে বলা হয় 1 **ফুট**, যাহাকে এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য পরিমাপের নির্দিষ্ট একক ধরা হইয়াছে।

এই পদ্ধতিতে ফুটের 12 ভাগের এক ভাগকে ইঞ্চি (inch) এবং 1760 গজে 1 মাইল (mile) ছাড়া আর কোন ভগ্নাংশিক, বা গুণিতক দৈর্ঘ্য নাই।

B. ভরের একক (Unit of Mass):

1. সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে ভরের একক হইল **গ্র্যাম** (gram)। প্যারিসের সেভার্নে 'আন্তর্জাতিক ওজন ও পরিমাপ সংস্থা'য় প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম সংকর-ধাতুতে নির্মিত একটি বর্তুলাকার ধাতুখণ্ড রক্ষিত আছে, যাহার ভরকে বলা হয় 1 **কিলোগ্র্যাম** (kilogram)। এক কিলোগ্র্যামের সহস্র ভাগের এক ভাগকে বলা হয় 1 গ্র্যাম (gram), যাহাকে এই পদ্ধতিতে ভর, বা বস্তু-পরিমাণের নির্দিষ্ট একক ধরা হইয়াছে।

ভরের মূল পরিমাণ হিসাবে গ্র্যাম-একককে দৈর্ঘ্যের সেন্টিমিটার-এককের ভিত্তিতে এইভাবে স্থির করা হইয়াছে: 4° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এক ঘন

সেন্টিমিটার (cubic centimetre, সংক্ষেপে c.c.) আয়তনবিশিষ্ট বিশুদ্ধ জলের ভর হইল এক **গ্র্যাম** (gram)।

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের মত ভরেরও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাশি পরিমাপের সুবিধার জন্য দশমিক ভগ্নাংশ ও গুণিতক মাপ প্রচলিত আছে, যাহা সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

10 মিলিগ্র্যাম = 1 সেন্টিগ্র্যাম	10 গ্র্যাম = 1 ডেকাগ্র্যাম
10 সেন্টিগ্র্যাম = 1 ডেসিগ্র্যাম	10 ডেকাগ্র্যাম = 1 হেক্টোগ্র্যাম
10 ডেসিগ্র্যাম = 1 গ্র্যাম	10 হেক্টোগ্র্যাম = 1 কিলোগ্র্যাম
অর্থাৎ 1000 মিলিগ্র্যাম,	অর্থাৎ 1 কিলোগ্র্যাম = 1000 গ্র্যাম।
বা 100 সেন্টিগ্র্যাম = 1 গ্র্যাম।	

2. এফ্. পি. এস. পদ্ধতিতে ভরের একক হইল **পাউণ্ড** (pound)। লণ্ডনে 'বৃটিশ বণিক-সভা'র কার্যালয়ে রক্ষিত প্ল্যাটিনাম ধাতুতে নির্মিত একটি সুনির্দিষ্ট ধাতু-খণ্ডের ভরকে ধরা হয় এক পাউণ্ড। পাউণ্ড অপেক্ষা বৃহত্তর ভর মাপিতে হইলে **কোয়ার্টার** (28 পাউণ্ড), **হন্দর** (4 কোয়ার্টার, বা 112 পাউণ্ড) এবং **টন** (20 হন্দর, বা 2,240 পাউণ্ড) পরিমাপ ব্যবহৃত হয়। আবার, ক্ষুদ্রতর ভর মাপিতে আউন্স (ounce, পাউণ্ডের 16 ভাগের একভাগ) মাপ ব্যবহার করা হয়। এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে ভরের এইরূপ পরিমাপ বাস্তব ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নহে, প্রচলনও তেমন নাই।

C. সময়ের একক (Unit of Time) :

সি. জি. এস্. ও এফ্. পি. এস. উভয় পদ্ধতিতেই সময়ের একক হইল **সেকেণ্ড** (second)। পৃথিবীর কোন স্থানে পর-পর দুই দিন সূর্য ঠিক মধ্য-গগনে উঠিবার সময়ের ব্যবধানকে বলা হয় স্থানীয় এক **সৌর দিবস** (Solar Day)। যে-কোন স্থানে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এই সৌর দিবসের মান বিভিন্ন হইয়া থাকে এবং একটি পূর্ণ বৎসরে সৌর দিবসের গড় মানকে বলা হয় **গড় সৌর দিবস** (Mean Solar Day)। এই গড় সৌর দিবসের 24 ভাগের এক ভাগ সময়-কালকে বলা হয় এক **ঘণ্টা** (hour) ; এক ঘণ্টার 60 ভাগের এক ভাগকে বলে এক **মিনিট** (minute) ; এক মিনিটের 60 ভাগের এক ভাগ সময় হইল এক **সেকেণ্ড** (second)।

উল্লিখিত প্রাথমিক একক তিনটি ছাড়াও, ক্ষেত্রফল (area) ও আয়তন

(volume) লব্ধ একক হইলেও প্রায়শঃই উহাদের একক ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে ; সুতরাং উহাদের আলোচনাও নিম্নে করা হইল :

D. ক্ষেত্রফলের একক (Unit of Area) : সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক হইল **বর্গ সেন্টিমিটার** (square centimetre, সংক্ষেপে sq. cm.)। যে বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটার, তাহার ক্ষেত্রফলকে বলা হয় এক 'বর্গ সেন্টিমিটার'।

আবার, এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক হইল **বর্গ ফুট** (square foot)। কোন বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য এক ফুট হইলে উহার ক্ষেত্রফলকে বলা হয় এক বর্গ ফুট (অর্থাৎ $12 \times 12 = 144$ বর্গ ইঞ্চি)।

E. আয়তনের একক (Unit of Volume) : সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে আয়তনের একক ধরা হয় **ঘন সেন্টিমিটার** (cubic centimetre, সংক্ষেপে c.c.)। যে ঘনকের (cube) প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটার, তাহার আয়তন হইল এক 'ঘন সেন্টিমিটার' (c. c.)। ঘন সেন্টিমিটার অপেক্ষা বৃহত্তর আয়তন পরিমাপের জন্য প্রায়শঃই (বিশেষতঃ তরল পদার্থের ক্ষেত্রে) আর একটি একক ব্যবহৃত হয়, যাহাকে বলে **লিটার** (litre)। 1 লিটার = 1000 ঘন সেন্টিমিটার।

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে আয়তনের একক হইল **ঘন ফুট** (cubic foot)। কোন ঘনকের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য এক ফুট হইলে তাহার আয়তনকে বলা হয় এক 'ঘন ফুট'। ঘন ফুট অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আয়তন মাপিতে হইলে (বিশেষতঃ তরল পদার্থের ক্ষেত্রে) **গ্যালন** (gallon) একক ব্যবহার করা হয়। 62° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় 10 পাউণ্ড বিশুদ্ধ জলের আয়তনকে বলে এক গ্যালন। 1 গ্যালন = 0·16 ঘন ফুট।

পদ্ধতি দুইটির পারস্পরিক সম্পর্ক :

(Relation between C.G.S. & F.P.S. measures)

উল্লিখিত দুইটি পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাশির যে-সকল একক আলোচিত হইয়াছে কয়েকটি ক্ষেত্রে তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নে দেওয়া হইল :

(i) **দৈর্ঘ্য :** 1 সেন্টিমিটার = 0·394 ইঞ্চি ; 1 ইঞ্চি = 2·54 সেন্টিমিটার, 1 গজ = 3 ফুট = 0·914 মিটার ; 1 মিটার = 1·09 গজ = 39·4 ইঞ্চি ; 1 মাইল = 1·64 কিলোমিটার ; 1 কিলোমিটার = 0·62 মাইল।

(ii) ভর : 1 কিলোগ্রাম = 2·21 পাউণ্ড ; 1 পাউণ্ড = 454 গ্র্যাম = 0·454 কিলোগ্র্যাম।

(iii) আয়তন : 1 লিটার = 1000 সি. সি. = 0·22 গ্যালন ; 1 গ্যালন = 4·54 লিটার = 0·16 ঘন ফুট।

(iv) ক্ষেত্রফল : 1 বর্গ ফুট = 929 বর্গ সেন্টিমিটার = 0·093 বর্গ মিটার ; 1 বর্গ মাইল = 2·69 বর্গ কিলোমিটার।

কয়েকটি রাশির পরিমাপ-কৌশল

(Some Measuring Devices)

যে-কোন রাশির সঠিক পরিমাপের জন্য অবশ্যই কোন-না-কোনরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। পাঠ্যসূচী অনুসারে দৈর্ঘ্য, আয়তন, ভর ও সময়ের পরিমাপ-কৌশল সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

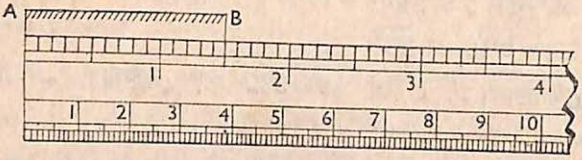
A. দৈর্ঘ্য পরিমাপের কৌশল :

(Devices for Measurement of Length)

কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করিবার জন্য আমরা সাধারণতঃ **স্কেল** (scale) ব্যবহার করিয়া থাকি। সাধারণ স্কেল প্রকৃতপক্ষে কাঠ, বা ইস্পাত-নির্মিত চ্যাপ্‌টা ও লম্বা একটি পাত মাত্র। এই পাতের কোন এক প্রান্তের কাছাকাছি কোন নির্দিষ্ট স্থানে একটি দাগ কাটিয়া উহাকে প্রারম্ভ-বিন্দু হিসাবে শূন্য (0) চিহ্নিত করা হয় এবং তাহা হইতে সঠিক এক ইঞ্চি দূরত্বে পর-পর এক-একটি দাগ কাটিয়া উহাদের 1, 2, 3, 4...চিহ্নিত করা হয়। দৈনন্দিন কাজে সাধারণতঃ এফ্. পি. এস্. পদ্ধতির এক ফুট (12 ইঞ্চি) দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট স্কেল ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ উহা শূন্য হইতে 12 পর্যন্ত অংশাঙ্কিত থাকে ; উহাকে বলা হয় **ফুট-স্কেল**। প্রতি ইঞ্চির ব্যবধানকে আবার 10-টি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া ছোট ছোট দাগ কাটা থাকে ; কাজেই এইরূপ প্রতিটি ক্ষুদ্রতর ভাগের দৈর্ঘ্য হয় এক ইঞ্চির এক-দশমাংশ, অর্থাৎ 0·1 ইঞ্চি।

মেট্রিক, বা সি. জি. এস্. পদ্ধতির পরিমাপই বর্তমানে সমধিক প্রচলিত ; ইহাকে বলা হয় **সেন্টিমিটার স্কেল** (centimetre scale)। ইহার নির্মাণ-পদ্ধতি ফুট-স্কেলেরই অনুরূপ ; এই স্কেলে শূন্য (0) চিহ্নিত দাগ হইতে পর-পর সঠিক এক সেন্টিমিটার দূরত্বে দাগ কাটিয়া 1, 2, 3, 4...প্রভৃতি

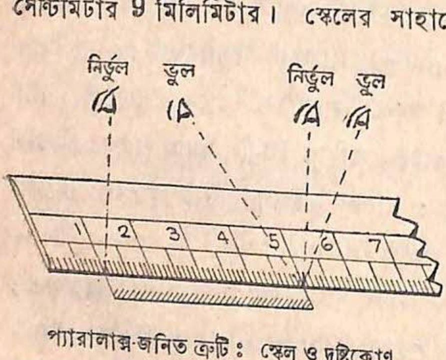
সংখ্যা চিহ্নিত থাকে এবং সাধারণতঃ 10 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ 1 ডেসিমিটার দীর্ঘ স্কেল ব্যবহার করা হয়। স্কেলের প্রতি সেন্টিমিটার অংশ অনুরূপভাবে আবার



সাধারণ স্কেল : দুই পার্শ্বে ইঞ্চি ও সেন্টিমিটার অংশাঙ্কিত

10 ভাগে ভাগ করা থাকে, যাহাদের এক-এক অংশ 0·1 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ 1 মিলিমিটার (m.m.) হয়। প্রচলিত কোন-কোন স্কেলের এক পার্শ্ব ইঞ্চি ও অপর পার্শ্ব সেন্টিমিটার হিসাবের দাগে অংশাঙ্কিত থাকে। ইহাতে একই সঙ্গে উভয় পদ্ধতির দৈর্ঘ্যের মাপ ও উভয়ের সম্পর্ক স্থির করা সম্ভব হয়।

যে বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপিতে হইবে সেই বস্তুর এক প্রান্তকে স্কেলের শূন্য চিহ্নিত দাগের উপরে স্থাপন করিতে হয় এবং বস্তুটির অপর প্রান্ত স্কেলের কোন্ দাগের সঙ্গে সঠিক মিলিয়া যায় তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। ইঞ্চি, বা সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কয়টি বড় বিভাগ (big division) ও কয়টি ছোট (0·1 ইঞ্চি, বা 1 মিলিমিটার) বিভাগের দাগের সঙ্গে পরিমেয় বস্তুটির অপর প্রান্ত হুবহু মিলিয়া গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেই বস্তুটির দৈর্ঘ্য জানা যায়; যেমন ধরা যাউক, একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য এইভাবে মাপিয়া যেন দেখা গেল, ফুট-স্কেলে 1·5 ইঞ্চি এবং সেন্টিমিটার-স্কেলে 3·9 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ 3 সেন্টিমিটার 9 মিলিমিটার। স্কেলের সাহায্যে কোন-কিছুর দৈর্ঘ্য এইভাবে পরিমাপ করিবার সময়ে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বস্তুর যে-কোন প্রান্ত স্কেলের দাগের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সময় শিক্ষার্থীর চোখ সর্বদা লম্বভাবে (সোজাসুজি দ্রষ্টব্য দাগের উপর হইতে) ফেলিতে হইবে: এদিক-ওদিক হইতে কৌণিকভাবে দেখিলে দৈর্ঘ্যের মাপ সঠিক হয় না। এই ব্যতিক্রমের কারণকে আলোকবিজ্ঞানে বলে **প্যারালাক্স**



প্যারালাক্স-জনিত ত্রুটি : স্কেল ও দৃষ্টিকোণ

(parallax), বাংলায় বলা যায় 'দৃষ্টি-বৈষম্য'। ব্যাপারটির তাৎপর্য প্রদত্ত চিত্র হইতে বুঝা যাইবে।

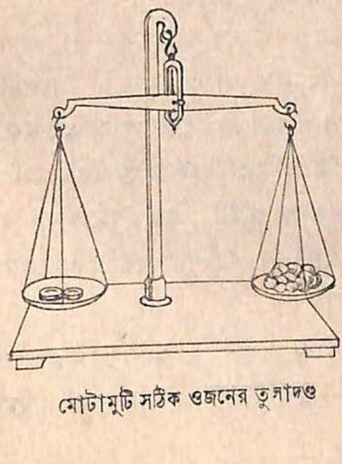
সাধারণ স্কেলের সাহায্যে বস্তুর দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ সঠিকভাবে মাপা সম্ভব হয় না, মোটামুটি চলিতে পারে মাত্র। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নিখুঁতভাবে দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য এক বিশেষ ধরনের **ভার্নিয়ার (vernier)** নামক পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, যাহার আলোচনা পাঠ্যসূচী অনুসারে এখানে নিষ্প্রয়োজন। যথেষ্ট বেশী দূরত্ব, বা দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য উল্লিখিত সাধারণ স্কেলের ভিত্তিতেই **দীর্ঘ পরিমাপক ফিতা** (measuring tape), **চেইন** (chain) প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

B. ভর ও ওজন পরিমাপের কৌশল ঃ

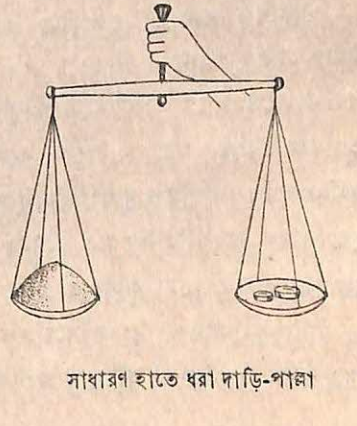
(Devices for measuring Mass and Weight)

সাধারণতঃ আমরা যদিও বস্তুর ভর (mass) ও ওজন (weight) একই বলিয়া মনে করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি রাশি। কোন বস্তুতে মোট যে-পরিমাণ জড় পদার্থ (matter) থাকে, তাহাই হইল বস্তুটির **ভর**; পক্ষান্তরে, মাধ্যাকর্ষণের ফলে বস্তুটি যে আকর্ষণ-বলে (force of gravity) ভূ-পৃষ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইল বস্তুটির **ওজন**। কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ভর সর্বদা ও সর্বত্র একই থাকে,—ভর, বা বস্তু-পরিমাণের কোন পরিবর্তন সম্ভব নহে। কিন্তু একই বস্তুর ওজন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হইয়া থাকে; কারণ ভূ-পৃষ্ঠের স্থানভেদে পৃথিবীর আকর্ষণ-বল ভৌগোলিক কারণে বিভিন্ন হয়।

বস্তুর ভর পরিমাপের জন্য সাধারণতঃ তুলাদণ্ড, বা দাড়ি-পাল্লা ব্যবহার করা



মোটামুটি সঠিক ওজনের তুলাদণ্ড



সাধারণ হাতে ধরা দাড়ি-পাল্লা

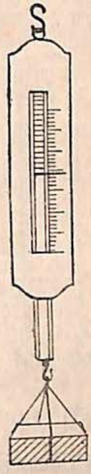
হয়। সাধারণ ব্যবহৃত দুই প্রকার তুলাদণ্ডের চিত্র উপরে প্রদত্ত হইল। অনুভূমিক অবস্থানে একটি ভারী পাটাতনের উপরে লম্বভাবে দণ্ডায়মান একটি লৌহদণ্ড হইতে ঝুলানো অবস্থায় কৌশলে একটি কিলকের (pivot) সাহায্যে অপর একটি তুলাদণ্ডের মধ্যবিন্দুটি এমনভাবে স্থাপিত হয়, যাহাতে উহা ভূ-সমান্তরালভাবে থাকে এবং এদিক-ওদিক দুলিতে পারে। এই ভূ-সমান্তরাল দণ্ডটিকে বলা হয় তুলাদণ্ডের **অক্ষ** (axis) ; এই অক্ষ-দণ্ডটির দুই প্রান্ত হইতে দুইটি সমান ভারী পাত্র, বা প্যান (pan) ঝুলানো থাকে, যাহাতে অক্ষ-দণ্ডটি দুইদিকে সমান ভারী হইয়া ভূ-সমান্তরালভাবে স্থির থাকিতে পারে। ইহাই সাধারণ তুলাদণ্ডের যান্ত্রিক ব্যবস্থা। অবশ্য হাতে-ধরা আর এক রকম সাধারণ তুলাদণ্ড আছে, যাহার কাঠের অক্ষ-দণ্ডটির ঠিক মধ্যবর্তী একটি ছিদ্র-পথে প্রবিষ্ট একটি দড়ির হাতল ধরিয়া ঝুলাইয়া তুলিলে অক্ষ-দণ্ডটি ভূ-সমান্তরাল-ভাবে স্থির থাকে। ইহারও দুই প্রান্তে সমভারী দুইটি প্যান ঝুলানো থাকে। সাধারণতঃ বাজার-হাটে এইরূপ তুলাদণ্ডই সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

যাহা হউক, এইরূপ যে-কোন তুলাদণ্ডের একটি প্যানে যে-বস্তুটির ভর মাপিতে হইবে তাহা রাখা হয় এবং অপর প্যানে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট জ্ঞাত ভরের ধাতব খণ্ড (1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 250 গ্রাম প্রভৃতি) বাটখারা (weight) চাপানো হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না অক্ষ-দণ্ডটি অনুভূমিকভাবে স্থির হয়, কোন দিকে ঝুঁকিয়া না থাকে। এই অবস্থায় বস্তুটির ভর (mass) তৌল-খণ্ডগুলির (weights) জ্ঞাত মোট ভরের সমান হয়। এই পদ্ধতিতে পরিমেয় বস্তুটির ভর তুলনামূলকভাবে জ্ঞাত ভরের সমান করা হয় মাত্র ; ইহাকেই আমরা সাধারণভাবে বস্তুর ওজন (weight) বলি।

উল্লিখিত সাধারণ তুলাদণ্ডে বস্তুর ভর পরিমাপ সঠিক হয় না, কারণ, ইহার যান্ত্রিক গঠনে ও ব্যবহারে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদিতে বস্তুর ভর অতি নিখুঁতভাবে পরিমাপ করিবার জন্য একপ্রকার তুলাদণ্ড ব্যবহৃত হয়, যাহাকে বলে **রাসায়নিক তুলাদণ্ড** (chemical balance)। ইহারও মূল পরিমাপ-পদ্ধতি অবশ্য একই, কিন্তু ইহাতে নানারূপ সূক্ষ্ম যান্ত্রিক ব্যবস্থাদি থাকে। ইহার জটিল গঠন ও ব্যবহার-পদ্ধতি পাঠক্রমের এই পর্যায়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

সাধারণ তুলাদণ্ড, বা রাসায়নিক তুলাদণ্ড কোনটির দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে বস্তুর ওজন (weight) পরিমাপ করা হয় না ; তুলনামূলক ভর (mass)-পরিমাণ

পাওয়া যায় মাত্র। বস্তুর প্রকৃত ওজন মাপিবার সহজতম পদ্ধতি হইল **স্প্রিঙ-তুলাদণ্ড** (spring balance) ব্যবহার। এইরূপ তুলাদণ্ডের মূল গঠন হইল একটি বিশেষ ধরনের ইস্পাত-নির্মিত স্প্রিঙ (spring), অর্থাৎ চক্রাকারে জড়ানো লম্বা তারকুণ্ডলী, যাহার অগ্র ও নিম্নপ্রান্তে সংযুক্ত এক-একটি বক্র আংটা থাকে। স্প্রিঙটির পশ্চাদ্ভাগে সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন ওজন-পরিমাপক একটি অংশাঙ্কিত লৌহপাত, বা স্কেল সংলগ্ন থাকে এবং মধ্যবর্তী এক স্থানে একটি কাঁটা (pointer) দৃঢ়ভাবে লাগানো থাকে। কোন বস্তুর ওজন মাপিবার সময় এই তুলাদণ্ডের উপরের আংটাটি হাতে ধরিয়া, বা কোন-কিছুতে আটকাইয়া যন্ত্রটিকে ঝুলাইয়া রাখিতে হয় এবং নীচের আংটাটির সঙ্গে পরিমেয় বস্তুটিকে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিতে হয়। এই অবস্থায় বস্তুটির ওজন অনুযায়ী স্প্রিঙটি প্রসারিত হইয়া উহার সঙ্গে সংলগ্ন কাঁটাটি নীচে নামিবে এবং স্কেলটির উপরে কোন একটি দাগে আসিয়া মিলিবে। স্কেলের উপরে এই দাগে চিহ্নিত পরিমাপ-সংখ্যা দেখিয়া বস্তুটির সঠিক ওজন সরাসরি জানা যায়।



সাধারণ স্প্রিঙ-তুলাদণ্ড

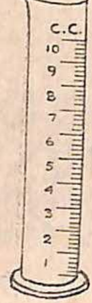
কোন বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে এই স্প্রিঙ-তুলাদণ্ডে ওজন করিলে দেখা যায়, উহার ওজন-নির্দেশক কাঁটাটি স্কেলের উপরে সর্বত্র একই দাগে স্থির হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায়, বস্তুর ওজন কোন স্থির, বা অপরিবর্তনীয় ধর্ম নহে, স্থানভেদে একই বস্তুর ওজন বিভিন্ন হয়। ইহার কারণ মোটামুটি পূর্বেই বলা হইয়াছে। অপর পক্ষে, কোন বস্তুর ভর তুলাদণ্ডের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে পরিমাপ করিলে দেখা যায়, উহার ভরের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না।

C. তরল পদার্থের আয়তন মাপিবার কৌশল :

(Measuring Devices for Liquids)

যে-কোন কঠিন পদার্থের কোন সুনির্দিষ্ট আকার থাকে ; সুতরাং উহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ পরিমাপ করিলে উহার আয়তন (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × বেধ) গণনা করিয়া সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু তরল পদার্থের কোন নির্দিষ্ট আকার নাই ; উহা যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। সুতরাং তরল পদার্থের আয়তন মাপিবার জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়।

তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের সহজতম উপায় হইল **পরিমাপক চোঙ** (measuring cylinder) ব্যবহার। ইহা উপর-নীচে সমান বৃত্তীয় ব্যাসবিশিষ্ট লম্বা ধরনের কাচনির্মিত একপ্রকার পাত্রবিশেষ। ইহার বৃত্তাকার ভূমির ক্ষেত্রফল জানা থাকিলে ভূমি হইতে কোন নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত চোঙটির আভ্যন্তরীণ আয়তন গণনার দ্বারা সহজেই নির্ণয় করা যায়। এই নির্দিষ্ট উচ্চতায় চোঙের বহির্গাত্রে একটি স্থায়ী দাগ কাটিয়া উহার পার্শ্বে আয়তনের উল্লিখিতভাবে লব্ধ মানের (ঘন সেন্টিমিটার, সি.সি.) সংখ্যাবাচক দাগ (বিশেষ পদ্ধতিতে) কাটা হয়। এইভাবে চোঙটির গায়ে 1, 2, 3, 4 …প্রভৃতি সি. সি. আয়তনের দাগ পর-পর কাটা থাকে। এইরূপে প্রস্তুত সি.সি. দাগ-কাটা পরিমাপক চোঙ কিনিতে পাওয়া যায়। এখন, এইরূপ পরিমাপক চোঙে কিছু পরিমাণ তরল পদার্থ ঢালিলে তরলের উপরিতল চোঙের যে-দাগের সহিত একই অনুভূমিক তলে থাকে, তাহা লক্ষ্য করিলেই উহার গাত্রস্থ অংশাঙ্কিত সংখ্যা হইতে পরিমেয় তরলের আয়তন সরাসরি জানা যায়। আয়তনের নিখুঁত পরিমাপের জন্য পরিমাপক চোঙের এক-এক সি. সি. অংশকে সমান 10 ভাগে ভাগ করিয়া 0·1 সি. সি. অংশও চিহ্নিত থাকে।



পরিমাপক চোঙ

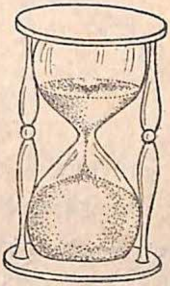
যাহা হউক, পরিমাপক চোঙের সাহায্যে তরলের আয়তন মাপিবার সময় দুইটি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। চোঙে কোন তরল পদার্থ লইলে লক্ষ্য করা যায়, উহার উপরিতলটি সঠিক অনুভূমিক হয় না; সাধারণতঃ অধিকাংশ তরলের ক্ষেত্রে উহা অবতল হইয়া থাকে। তরলের এইরূপ বক্রতলের নিম্নপ্রান্তটি চোঙের যে দাগে থাকে তাহাই তরলের আয়তন সঠিকভাবে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়তঃ, বক্রতলের নিম্ন প্রান্তটির অবস্থান লক্ষ্য করিবার সময় শিক্ষার্থীর চোখ ইহার অনুভূমিক তলে রাখিতে হইবে; কিছুমাত্র উপর, বা নীচ হইতে লক্ষ্য করিলে আয়তনের সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না। প্যারালাক্স-জনিত এই ত্রুটির কারণ স্কেল সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

D. সময় পরিমাপের কৌশল : (Devices for measuring Time)

সময়ের কোন সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন; সময় অবিরাম বহিয়া যাইতেছে। সময়ের গতি সম্পর্কে মানুষ প্রথম ধারণা করে দিন-রাত্রির ক্রমিক আবর্তন ও

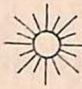
বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তন হইতে। প্রকৃতপক্ষে, দিন-রাত্রির ক্রমাবর্তনের ভিত্তিতেই সময়ের একক সৌর দিবস, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড ইত্যাদি স্থির করা হইয়াছে।

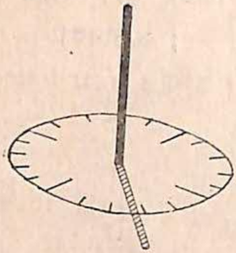
সূর্যের আবর্তন হইতে দিন-রাত্রির সময়-কালই কেবল স্থির করা যায়; কিন্তু তাহার আংশিক সময় পরিমাপের জন্য অবশ্যই কোন-না-কোন বস্তুর বাহ্যিক পরিবর্তনের হার লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বিভিন্ন যুগে মানুষ এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল; প্রাচীনকালে সময় পরিমাপের জন্য **জল-ঘড়ি** (water-clock), **বালি-ঘড়ি** (sand-clock) ইত্যাদির প্রচলন ছিল। সাধারণ বালি-ঘড়ির একটি চিত্র প্রদত্ত হইল; কাচের দুইটি গোলকাকার এক-মুখ-খোলা সম-মাপের পাত্র পরস্পর একটি সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথে যুক্ত আছে, খোলা মুখ দুইটি বিপরীত দিকে রহিয়াছে। এই যন্ত্রটির এক মুখ কোন সমতল স্থানে স্থাপন করিলে গোলকদ্বয় একটির উপর আর একটি লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকে। এখন উপরের গোলকটি শুষ্ক ও সূক্ষ্ম বালি ভরিয়া পূর্ণ করা হইত এবং সংযোজক ছিদ্রপথে এই বালি কত সময়ে কতটা, অর্থাৎ কি হারে নীচের গোলকে পড়িত, তাহা লক্ষ্য করিয়া সময়ের পরিমাপ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা হইত। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বালি ছিদ্রপথে নীচে পড়িতে যে সময় লাগিত তাহাকেই সময়ের মাপকাঠি, বা একক ধরা হইত। মোটামুটি অনুরূপ কৌশলে জল-ঘড়িও এককালে উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হইয়াছিল।


একপ্রকার বালি-ঘড়ি

সময় পরিমাপের জন্য উপরোক্ত ধরনের ঘড়ি ব্যতীত আকাশে সূর্যের অবস্থান-পরিবর্তনের ভিত্তিতে একপ্রকার ঘড়ির প্রচলন ছিল, যাহাকে বলা হইত **সূর্য-ঘড়ি** (Sun-dial)। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পরস্পর লম্বভাবে দুইটি সরল রেখা অঙ্কিত করিয়া উহাদের ছেদ-বিন্দুতে একটি দণ্ড লম্বভাবে দণ্ডায়মান রাখা হইত। রেখা দুইটির মধ্যবর্তী সমকোণ চারিটিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সমান ভাগে অংশাঙ্কিত করা হইত। দিবাভাগে আকাশে সূর্যের স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে লম্বমান দণ্ডটির ছায়াও বিভিন্ন দাগের উপর দিয়া ক্রমশঃ সরিতে থাকে। ছায়াটি কখন কোন্ দাগের উপরে আসে তাহা লক্ষ্য করিয়া সময়ের একটা মোটামুটি পরিমাপ আন্দাজ করা যায়। কিন্তু সূর্য-ঘড়ির

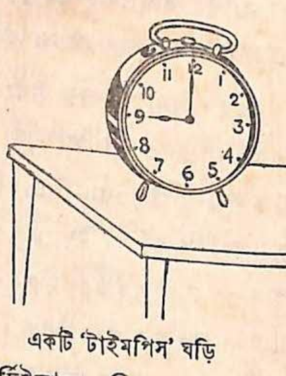
প্রধান অসুবিধা হইল, ইহা সম্পূর্ণরূপে সূর্যের উপরে নির্ভরশীল বলিয়া রাত্রিকালে, বা মেঘাচ্ছন্ন দিনে উহা কোন কাজে লাগিত না। দিল্লীর একাংশে 'যন্ত্র-মন্তর' নামক একটি সংগ্রহ-শালায় কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন একটি বৃহদাকার সূর্য-ঘড়ি রহিয়াছে।





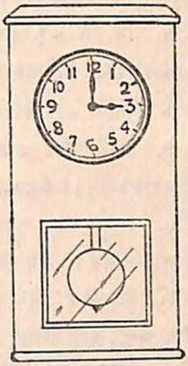
প্রাচীনকালে প্রচলিত সূর্য-ঘড়ি

আজকাল আধুনিক যে-সকল উন্নত ধরনের ঘড়ি আমরা ব্যবহার করি তাহা বহু বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে প্রস্তুত সূক্ষ্ম যন্ত্রবিশেষ। যে-কোন আধুনিক ঘড়ির মূল অংশ হইল একটি স্প্রিঙ (spring), অর্থাৎ ইস্পাত-নির্মিত একপ্রকার পাতের জড়ানো-কুণ্ডলী। ঘড়িতে দম দিবার সময় কুণ্ডলীটি গুটাইয়া ছোট হয়; অতঃপর উহা যখন নিজ প্রসারণ-বলে ধীরে-ধীরে খুলিয়া বড় হইতে থাকে তখন স্প্রিঙটির মুক্ত প্রান্তের সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন প্রকার দাঁত-কাটা চাকা (toothed wheel) ধীরে-ধীরে ঘুরিয়া ঘড়ির কাঁটা দুইটিকে ডায়ালের উপরে সুনির্দিষ্ট গতিবেগে ঘুরায়। ঘড়ির ডায়ালটি 1 হইতে 12 পর্যন্ত চিহ্নিত 12-টি সমান ভাগে বিভক্ত থাকে এবং প্রতি অংশ আবার 5-টি সমান ভাগে ভাগ করা থাকে। কাজেই ডায়ালের চক্রাকার পূর্ণ অংশটি $12 \times 5 = 60$-টি সমান অংশে বিভক্ত হয়। ঘড়ির স্প্রিঙ-এর গঠন ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন থাকে যাহাতে এক মিনিট সময়ে বড়, অর্থাৎ মিনিটের কাঁটাটি ডায়ালের একটি ছোট বিভাগ অতিক্রম করে এবং উহা ক্রমাগত ঘুরিয়া ডায়ালের পূর্ণ চক্রাংশ, অর্থাৎ 60-টি মিনিটের বিভাগ ঘুরিয়া আসিলে ছোট, অর্থাৎ ঘণ্টার কাঁটাটি পাঁচটি মিনিটের-বিভাগ অতিক্রম করে, অর্থাৎ এক ঘণ্টা সময় বুঝা যায়। এইভাবে ডায়ালের উপরে কাঁটা দুইটির অবস্থান দেখিয়া ঘণ্টা ও মিনিটের সময়-কাল সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করা সম্ভব হয়। বড় **দেয়াল-ঘড়ি** (wall-clock) ও ছোট **হাত-ঘড়ির** (wrist watch) যান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলতঃ এই একইরূপ। অবশ্য হাত-ঘড়িতে অনুরূপ



একটি 'টাইমপিস' ঘড়ি

আর একটি পৃথক যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেকেণ্ড পর্যন্ত সময় পরিমাপের জন্য একটি সূক্ষ্ম কাঁটা সন্নিবিষ্ট থাকে। এই সেকেণ্ডের কাঁটাটি ডায়ালের পূর্ণ এক চক্র ঘুরিলে এক মিনিট, অর্থাৎ মিনিটের বড় কাঁটাটি ডায়ালের একটি ছোট বিভাগ অতিক্রম করিয়া তাহা নির্দেশ করে। এইভাবে হাত-ঘড়িতে সময়ের সূক্ষ্মতর সেকেণ্ড বিভাগ পর্যন্ত পরিমাপ করা যায়। আবার দেয়াল-ঘড়িতে স্প্রিঙ-এর সহিত সংলগ্ন একটি **পেণ্ডুলাম** (pendulum), বা দোলক নীচে ঝুলানো থাকে, যাহা সর্বদা সমতালে, অর্থাৎ সমান সময়-কালে এদিকে-ওদিকে দুলিতে থাকে, যাহার ফলে স্প্রিঙ-এর সম্প্রসারণ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।



পেণ্ডুলামযুক্ত দেওয়াল-ঘড়ি

আধুনিক ঘড়ির একটি মূল অসুবিধা হইল এই যে, ইহার যন্ত্রাংশগুলি ধাতুনির্মিত এবং ধাতুমাত্রেই উত্তাপে প্রসারিত এবং ঠাণ্ডায় সংকুচিত হয়। সুতরাং স্প্রিঙ-এর আকার ও দোলকের দৈর্ঘ্য ঋতুভেদে স্বভাবতঃই পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সাধারণতঃ কোন ঘড়ি সারা বৎসর সঠিক সময় নির্দেশ করিতে পারে না। যে-কোন ঘড়ি সাধারণতঃ শীতকালে ফাস্ট (fast), অর্থাৎ দ্রুতগতি এবং গ্রীষ্মকালে স্লো (slow), অর্থাৎ মন্থরগতি হয়। আজকাল অবশ্য বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশলে ঘড়ির এইরূপ ফাস্ট, বা স্লো চলিবার প্রবণতা অনেকটা রোধ করা সম্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ডের গ্রীন-উইচ মানমন্দিরে (Greenwich Observatory) এমন একটি ঘড়ি রহিয়াছে, যাহা অতি বিস্ময়করভাবে সারা বছর সঠিক সময় দেয়; উহা দিনে এক সেকেণ্ডের 1000 ভাগের এক ভাগ সময়ের বেশী কখনই স্লো, বা ফাস্ট হয় না। ইহার সময়ই সারা পৃথিবীতে **'প্রমাণ সময়'** (standard time) বলিয়া স্বীকৃত; যাহাকে বলা হয় 'গ্রীনউইচ সময়' (Greenwich time)।

অনুশীলনী

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. একক কাহাকে বলে? 'প্রাথমিক একক' ও 'লব্ধ একক' বলিতে কি বুঝায় তাহা উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর। এককের সাহায্যে কোন রাশির পরিমাপসূচক সংজ্ঞা কিভাবে প্রকাশ করা হয়?

2. সাধারণ স্কেলের গঠন ও ব্যবহার-পদ্ধতি আলোচনা কর। প্যারালাক্স বা দৃষ্টিবৈষম্য-জনিত ত্রুটি বলিতে কি বুঝায়? উহা সংশোধনের উপায় বর্ণনা কর।

3. তরল পদার্থের আয়তনের একক কি? পরিমাপক-চোঙের সাহায্যে তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের কৌশল বর্ণনা কর।

4. সি. জি. এস্. ও এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে ভরের একক কি? সাধারণ তুলাদণ্ড দ্বারা কোন বস্তুর ভর পরিমাপ করা হয় কিভাবে, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর। এইরূপ তুলাদণ্ডের প্রধান ত্রুটি কি এবং তাহার কারণ ব্যাখ্যা কর।

5. কোন বস্তুর ওজন বলিতে কি বুঝায়? ওজন পরিমাপের বিভিন্ন কৌশল সবিস্তারে আলোচনা কর। স্প্রিঙ-তুলাদণ্ড ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা কি বুঝাইয়া দাও।

6. প্রাচীনকালে সময় পরিমাপের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর। সময়ের একক কি?

7. আধুনিক বিভিন্ন ধরনের ঘড়ির মূল কার্যপ্রণালী সংক্ষেপে আলোচনা কর। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ঘড়ি 'ফাস্ট', বা 'স্লো' চলিবার কারণ কি?

8. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:—(i) স্প্রিঙ-তুলাদণ্ড, (ii) গড় সৌর দিবস, (iii) গ্যালন ও লিটার, (iv) ভর ও ওজনের পার্থক্য, (v) সূর্য-ঘড়ি, (vi) প্যারালাক্স।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, তাহা টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :

(i) সি. জি. এস্. পদ্ধতিকে অনেক সময় মেট্রিক পদ্ধতিও বলা হয়।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(ii) দৈর্ঘ্যের একক স্বাধীন ও অন্য-নিরপেক্ষ, কিন্তু আয়তনের একক দৈর্ঘ্যের এককের উপর নির্ভরশীল বলিয়া উহাকে লব্ধ একক বলা হয়। — ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(iii) ভরের একক হইল প্রাথমিক একক, কিন্তু ঘনত্বের একক লব্ধ একক।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(iv) এক মিটার এক গজ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(v) এক মাইল এক কিলোমিটার অপেক্ষা বৃহত্তর।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(vi) এক কিলোগ্রাম দুই পাউণ্ডের সমান।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(vii) এক গ্যালন 0·16 ঘন ফুটের সমান।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(viii) সাধারণ তুলাদণ্ড দ্বারা বস্তুর ওজন পরিমাপ করা হয়। — ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(xi) কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ওজন ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র একই থাকে, কিন্তু উহার ভর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার হয়।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(x) যে-কোন ঘড়ি সাধারণতঃ শীতকালে 'ফাস্ট' ও গ্রীষ্মকালে 'স্লো' চলে।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

2. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল, টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :

(i) এক ইঞ্চি কত সেণ্টিমিটারের সমান ?—0·62 (...) ; 2·54 (...) ; 30·48 (...)।

(ii) এক টন কত পাউণ্ডের সমান ?—20 (...) ; 2240 (...)।

(iii) স্প্রিঙ-তুলাদণ্ড দ্বারা কি পরিমাপ করা হয় ?—ভর (...) ; ওজন (...)।

(iv) কোন বস্তুকে স্প্রিঙ-তুলাদণ্ড দ্বারা কলিকাতায় ও দার্জিলিঙে পরিমাপ করিলে প্রথম ক্ষেত্রের তুলনায় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিরূপ পরিমাপ পাওয়া যাইবে ?—অধিকতর (...) ; সমান (...) ; ক্ষুদ্রতর (...)।

(v) পরিমাপক চোঙে জল লইলে উহার উন্মুক্ত তলটি কিরূপ হইয়া থাকে ?—অনুভূমিক (...) ; উপরের দিকে উত্তল (...) ; নীচের দিকে অবতল (...)।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তিগুলি নির্ভুল কর :

(i) যে-কোন — পরিমাপ করিতে হইলে ঐ জাতীয় — একটি নির্দিষ্ট পরিমাণকে মূল, বা প্রমাণ — হিসাবে ধরিয়া লইতে হয়, যাহাকে বলা হয় ঐ রাশির —।

(ii) কোন স্থানে পর-পর দুই দিন সূর্য ঠিক — উঠিবার সময়ের ব্যবধানকে বলা হয় এক —। পরিমাপের — পদ্ধতিতেই সময়ের একক হইল —।

(iii) —ফারেনহাইট তাপমাত্রায় — পাউণ্ড জলের আয়তনকে বলা হয় এক —।

(iv) স্কেলের সাহায্যে কোন বস্তুর — পরিমাপকালে বস্তুটির কোন একটি প্রান্ত স্কেলের দাগের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সময় সর্বদা — দৃষ্টি ফেলিতে হইবে ; এদিক-ওদিক হইতে দেখিলে — মাপ সঠিক হয় না। এই ব্যতিক্রমের কারণকে ইংরাজীতে বলা হয় —, বাংলায় বলা যায় —।

(v) কঠিন পদার্থের — ও — উভয়ই সুনির্দিষ্ট, কিন্তু তরল পদার্থের সুনির্দিষ্ট — থাকিলেও উহার কোন নির্দিষ্ট — নাই। তরল পদার্থের — পরিমাপের সহজতম উপায় হইল পরিমাপক —।

(vi) বস্তুর ক্ষেত্রফল হইল দুইটি — গুণফল (—×—) ; সুতরাং ক্ষেত্রফলের — বলা হয় — একক। কোন রাশির — হইল কোন সংখ্যা × রাশির —।

(vii) কোন বস্তুর — তুলাদণ্ডের সাহায্যে — স্থানে — করিলে উহার — কোনরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পদার্থ ও শক্তি
(Matter and Energy)

পাঠ্যসূচী: পদার্থ ও শক্তি; ভর ও ওজন; শক্তির বিভিন্ন রূপ; শক্তির রূপান্তর; ভর-সংরক্ষণ ও শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র।

পদার্থ ও শক্তি (Matter and Energy):

বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন বস্তুর সমাবেশে এই পার্থিব জড়জগৎ গঠিত। ইহাদের মধ্যে কোনটি কঠিন, কোনটি তরল, কোনটি বা অদৃশ্য গ্যাসীয় পদার্থ। বস্তু (object, or body) মাত্রই পদার্থের (matter) সংগঠিত রূপ; পদার্থ প্রাকৃতিক, বস্তু কৃত্রিম। বিভিন্ন প্রকার বস্তু একই পদার্থে গঠিত হইতে পারে। ইট, বা হাড়ি-কলসী দৃশ্যতঃ বিভিন্ন হইলেও উহাদের সংগঠক উপাদান একই পদার্থ, মাটি; লোহার বাল্‌তিই হউক, কাটারী-ছুরিই হউক, পদার্থটি লোহা। এইভাবে বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন রূপে আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে। অবশ্য সকল পদার্থ দেখা যায় না; যেমন, গ্যাসীয় পদার্থ বায়ু আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু নানাভাবে উহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাই। পক্ষান্তরে, কঠিন, বা তরল যাবতীয় পদার্থ আমরা দেখিতে, ধরিতে ও অনুভব করিতে পারি। এইভাবে পদার্থমাত্রই কোন-না-কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; পদার্থের ওজন থাকে এবং কিছু স্থান অধিকার করে। সুতরাং বলা যায়, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ওজনবিশিষ্ট ও স্থান-অধিকারী তাহাই **পদার্থ** (matter)।

পক্ষান্তরে, তাপ, আলোক, শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও ইহাদের কোন পদার্থিক অস্তিত্ব নাই; ইহাদের বলা হয় **শক্তি** (energy),—পদার্থকে আশ্রয় করিয়া যাহাদের বাহ্যিক প্রকাশ লক্ষিত হয়। যেমন, তাপ আমরা দেখিতে পাই না এবং উহা ধরা-ছোঁয়াও যায় না; কিন্তু কোন উত্তপ্ত বস্তু স্পর্শ করিলে আমরা উহাতে তাপের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। অনুরূপভাবে, আমরা কখনও আলোক দেখি না, আলোকিত বস্তু দেখি; কোন উৎস হইতে আলোক নির্গত, অথবা কোন বস্তু হইতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে আসিয়া পৌছিলে আমাদের দর্শনের অনুভূতি জন্মে, আমরা বস্তুটিকে

দেখিতে পাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাপ, বা আলোক স্বয়ং কোন পদার্থ নহে, কিন্তু পদার্থকে আশ্রয় করিয়া উহাদের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে।

অতএব বুঝিতে হইবে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি পদার্থ ও শক্তির পারস্পরিক সংযোগ ও সমাবেশে বিরাজমান ও ক্রিয়াশীল রহিয়াছে; পদার্থ ও শক্তির অস্তিত্ব-বোধ পরস্পর নির্ভরশীল।

ভর ও ওজন

(Mass and Weight)

বস্তুর ভর (Mass of a body): সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, বল প্রয়োগ না করিলে কোন বস্তুকেই স্থানচ্যুত করা যায় না; কিন্তু সকল বস্তুর ক্ষেত্রে অবশ্যই সমান বল লাগে না। যেমন, একটি হাল্‌কা চেয়ার আমরা অনায়াসে ঠেলিয়া সরাইতে পারি; কিন্তু একটি ভারী আলমারি ঠেলিয়া সরানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ইহার কারণ, চেয়ারের তুলনায় আলমারিটিতে বেশী পরিমাণ পদার্থ আছে বলিয়াই উহাকে স্থানচ্যুত করিতে বেশী বল প্রয়োগ করিতে হয়। কোন বস্তু যে-পরিমাণ জড় পদার্থে গঠিত, তাহাকে বলা হয় বস্তুটির **ভর** (mass)। প্রত্যেক বস্তুরই কিছু-না-কিছু ভর আছে এবং কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ভর সর্বদা ও সর্বত্রই সুনির্দিষ্ট থাকে; উহা বস্তুর একটি নিজস্ব মূলগত ভৌত ধর্ম।

বস্তুর ওজন (Weight of a body): যে-কোন বস্তুকে মাটি হইতে কিছুটা উপরে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা মাটিতে পতিত হয়। কিন্তু কৌতূহলী মনে অবশ্যই প্রশ্ন উঠিতে পারে, বস্তুটি মাটিতে পড়ে কেন? উহা তো উপরেও উঠিতে পারিত! বিজ্ঞানী নিউটন সর্বপ্রথম ইহার সঠিক কারণ নির্দেশ করিতে সক্ষম হন। তাঁহার মতে, পৃথিবীর প্রবল আকর্ষণের প্রভাবে যে-কোন পার্থিব বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে আকৃষ্ট হয় এবং এই জন্যই কোন বস্তুকে উপর হইতে ছাড়িয়া দিলে তাহা সর্বদাই সবেগে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে। কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর এই নিম্নমুখী আকর্ষণ-বলকে বলা হয় বস্তুটির **ওজন** (weight)। ভর ও ওজনের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে; যে বস্তুর ভর যত বেশী, তাহার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ-বল, অর্থাৎ বস্তুটির ওজনও তত বেশী হইয়া থাকে।

ভর ও ওজনের পার্থক্য (Difference between Mass and Weight) :

সাধারণভাবে বস্তুর 'ভর' ও 'ওজন' কথা দুইটি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়, যেন উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাদের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলগত প্রভেদ রহিয়াছে। কোন বস্তুতে কি পরিমাণ জড় পদার্থ আছে 'ভর' হইল তাহার পরিমাপ ; আর, বস্তুটির উপরে পৃথিবীর যে নিম্নমুখী আকর্ষণ-বল ক্রিয়া করে 'ওজন' হইল তাহার পরিমাপ। সুতরাং বস্তুর ভর ও ওজন কখনই সমার্থক হইতে পারে না।

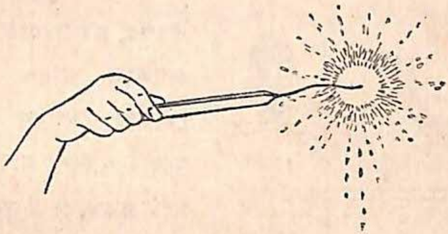
কোন বস্তুর ভর সম্পূর্ণভাবে উহার নিজস্ব একটি মৌলিক ধর্ম ; উহা পারিপার্শ্বিক অপর কোন বিষয়ের উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নহে। কোন বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠের যে-স্থানেই লইয়া যাওয়া হউক না কেন, উহার ভরের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে না। পক্ষান্তরে, কোন বস্তুর ওজন অপরিবর্তনীয় ধ্রুবক রাশি নহে ; ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে একই বস্তুর ওজন বিভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন, কোন উচ্চ পর্বতের পাদদেশ অপেক্ষা উহার শীর্ষে বস্তুর ওজন কিছুটা কম হয়। ইহার কারণ, পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে কোন বস্তুর দূরত্ব বৃদ্ধি পাইলে বস্তুটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ স্বভাবতঃই হ্রাস পাইয়া থাকে। এই জন্যই উচ্চ পর্বতের উপরে যে-কোন বস্তুর ওজন সমতলভূমি অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। আবার, পৃথিবী যেহেতু সম্পূর্ণ গোলাকার নহে, বরঞ্চ উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা ; সুতরাং কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে বিষুব-রেখায় ওজন করিলে যে ওজন পাওয়া যাইবে, একই কারণে উত্তর, বা দক্ষিণ মেরুতে বস্তুটির ওজন তদপেক্ষা কিছু বেশী হইবে।

ভর-সংরক্ষণ সূত্র

(Law of Conservation of Mass)

কয়লা, বা কাঠ পোড়াইলে সামান্য ছাই পড়িয়া থাকে। ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর তার জ্বালাইলে উজ্জ্বল আলোক ছড়ায়, সামান্য কিছু ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। মোমবাতি জ্বলিবার সময় দৃশ্যতঃ মোম গলিয়া ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায় ; কেরোসিন, বা স্পিরিট জ্বালাইলে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া যায়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই সকল ঘটনায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, জড় পদার্থ ধ্বংস, বা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে ; দৃশ্যতঃ যাহাকে পদার্থের বিনাশ,

বা বিলুপ্তি বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ তাহা পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তর মাত্র। জড় পদার্থের উৎপত্তি, বা বিনাশ ঘটিতে পারে না ; এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হইতে পারে মাত্র।

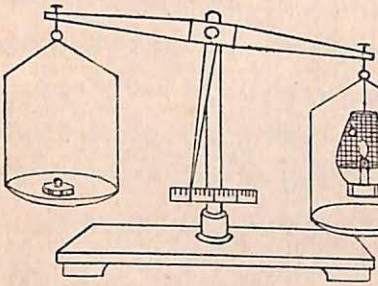


ম্যাগ্নেসিয়াম-তারের দহন

মোমের দহনকালে উহার সহিত বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে ; কিন্তু উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থগুলি অদৃশ্যভাবে বায়ুতে মিশিয়া যায় বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পদার্থের বিলুপ্তি, বা বিনাশ ঘটিল। কেরোসিন, স্পিরিট প্রভৃতি পদার্থের দহনেও এই একই ব্যাপার ঘটে। পক্ষান্তরে, ম্যাগনেসিয়াম-তার বায়ুতে পোড়াইলে উহার সহিত বায়ুর অক্সিজেন যুক্ত হইয়া একটি নূতন (অর্থাৎ, যৌগিক) পদার্থ গঠিত হয়, ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড ; যাহা ভস্মরূপে দেখা যায়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, নির্দিষ্ট ওজনের ম্যাগ্নেসিয়াম অপেক্ষা তাহার ভস্মের ওজন বেশী হয় ; এই বর্ধিত ওজন দহনকালে ম্যাগ্নেসিয়ামের সহিত সংযুক্ত অক্সিজেনের ওজনের সমান। এইজন্যই ম্যাগ্নেসিয়াম-তার বায়ুতে পোড়াইলে উৎপন্ন ধাতুভস্ম ওজনে বাড়ে ; কিন্তু মূল ম্যাগ্নেসিয়ামের পরিমাণ একই থাকে।

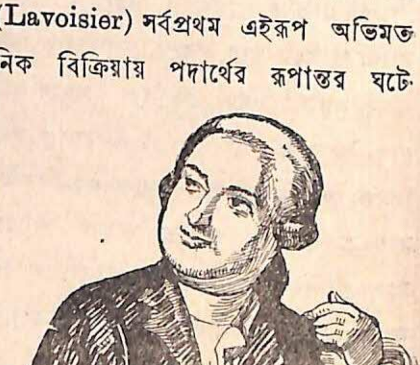
পরীক্ষা ঃ একটি কাচের চিমনীর নিম্নমুখে ছিপি আঁটিয়া তাহার উপরে ছোট একখানা মোম দণ্ডায়মান রাখা হইল। চিমনীর ভিতরে বায়ু প্রবেশের জন্য ছিপিটির গায়ে কয়েকটি ছিদ্র করা থাকে। এখন চিমনীটির উপরদিকে সংলগ্ন একটি তার-জালির আবরণের সঙ্গে কয়েক খণ্ড শুষ্ক কলিচুন ও কষ্টিক সোডা বাঁধিয়া রাখা হইল। এইবার, সর্বসমেত চিমনীটিকে একটি তুলাদণ্ডের এক দিকে ঝুলাইয়া অপর পাল্লায় উপযুক্ত ওজন দিয়া তুলাদণ্ডটিকে উভয় দিকে সম-ভার করা হইল। অতঃপর একটি জ্বলন্ত পাটকাঠির সাহায্যে মোমবাতিটি জ্বালাইলে মোম পুড়িয়া নিঃশেষ হইতে থাকিবে এবং দেখা

যাইবে, তুলাদণ্ডের মোমের দিকের পাল্লাটি ক্রমে ভারী হইয়া নীচে নামিতেছে। ইহার কারণ, মোমের দহনে উহার সহিত নীচের ছিদ্রপথে আগত বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে যে-সকল অদৃশ্য গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন, হয় তাহারা চিমনীর তার-জালিতে আবদ্ধ চুন ও কষ্টিক সোডায় শোষিত হইয়া চিমনীর মধ্যেই থাকিয়া যায় এবং এইজন্যই সামগ্রিকভাবে ওজন বাড়ে। ইহা হইতে বুঝা যায়, মোম দৃশ্যতঃ নিঃশেষ হইলেও উহার পদার্থিক উপাদানের বিলুপ্তি ঘটে না, অন্য পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অদৃশ্যভাবে নূতন পদার্থে রূপান্তরিত হয় মাত্র ; বিক্রিয়ক পদার্থগুলির মোট বস্তু-পরিমাণ, অর্থাৎ ভরের বস্তুতঃ কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না।



ভর-সংরক্ষণ সূত্রের পরীক্ষা

এইরূপ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করিয়া 1774 খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাঁভয়সিয়ে (Lavoisier) সর্বপ্রথম এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, "যে-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের রূপান্তর ঘটে মাত্র ; বিক্রিয়ার পূর্বে ও পরে মোট পদার্থিক পরিমাণের, অর্থাৎ ভরের কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি কখনও ঘটিতে পারে না। অন্য কথায়, পার্থিব পদার্থের সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই ; পদার্থ নিত্য ও অবিনশ্বর।" পদার্থের, অর্থাৎ উহার ভরের অবিনাশিতা সম্পর্কিত এই তথ্যটিকে বলা হয় **ভর-সংরক্ষণ সূত্র** (Law of Conservation of Mass)।



ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাঁভয়সিয়ে (1743-94)

পৃথিবীতে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে অহরহ বহু বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটিতেছে। দৃশ্যতঃ কোন-কোন ক্ষেত্রে পদার্থের উৎপত্তি (অর্থাৎ, ভর-বৃদ্ধি), আবার কোন-কোন

ক্ষেত্রে বিনাশ (অর্থাৎ ভর-হ্রাস) ঘটে বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে মোট ভরের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। পৃথিবীর উৎপত্তিকালে পার্থিব পদার্থসমূহের মোট যে ভর ছিল সামগ্রিকভাবে আজও তাহাই আছে; বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে পারস্পরিক রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে পদার্থের রূপান্তর ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে মাত্র। ইহাই ভর-সংরক্ষণ (Conservation of mass) সূত্রের মূল তথ্য।

শক্তির বিভিন্ন রূপ
(Different forms of Energy)

জড় পদার্থমাত্রই স্বভাবতঃ স্থির ও নিশ্চল থাকে। উহার যে-কোনরূপ পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে কোন-না-কোন শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। শক্তির কোন পদার্থিক অস্তিত্ব নাই; জড় পদার্থ আশ্রয় করিয়াই শক্তির বাহিক প্রকাশ লক্ষিত হয়। সুতরাং, জড় পদার্থের কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিলে সেই সঙ্গে পরোক্ষভাবে শক্তির অস্তিত্ব বুঝা যায়।

শক্তি প্রধানতঃ সাত প্রকার: (i) যান্ত্রিক শক্তি (mechanical energy), (ii) আলোক-শক্তি (light energy), (iii) তাপ-শক্তি (heat energy), (iv) তড়িৎ শক্তি (electrical energy), (v) রাসায়নিক শক্তি (chemical energy), (vi) শব্দ-শক্তি (sound energy) ও (vii) চৌম্বক শক্তি (magnetic energy)। বস্তুতঃ, সকল প্রকার শক্তির মূল উৎস হইল সূর্য; সৌর-শক্তি (solar energy) কয়লা, কাঠ, তেল প্রভৃতি বিভিন্ন জড় পদার্থে সঞ্চিত থাকে এবং উহাদের জ্বালাইয়া আমরা বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়ায় তাপ, আলোক, রাসায়নিক ইত্যাদি বিভিন্নরূপ শক্তি উৎপাদন করিতে সক্ষম হই।

শক্তির রূপান্তর (Transformation of Energy):

শক্তির উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার-ভেদের মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভবপর। উপযুক্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে-কোন প্রকার শক্তি হইতে অপর কোন প্রকার শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে ইহার অজস্র দৃষ্টান্ত আমরা নিয়ত লক্ষ্য করি। বস্তুতঃ, প্রায় যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনাতেই শক্তির কোন-না-কোন প্রকার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার শক্তির পারস্পরিক রূপান্তরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(i) **তাপ ও যান্ত্রিক শক্তিঃ** ট্রেন, ষ্টীমার, বা জাহাজ যে বাষ্পীয় ইঞ্জিনে চলে তাহা তাপ-শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের কৌশল মাত্র। ইঞ্জিনের চুল্লীতে কয়লা, বা তৈল জাতীয় যে জ্বালানী ব্যবহার করা হয় তাহাতে নিহিত তাপ-শক্তি উহার দহনকালে বিমুক্ত ও নির্গত হয়। এই তাপের সাহায্যে বয়লারের জল বাষ্পীভূত করা হইয়া থাকে এবং সেই বাষ্পের চাপে ষ্টীমার, বা ট্রেনের ইঞ্জিন চলে। অতএব, ট্রেন, ষ্টীমার প্রভৃতি চলিবার গতি-শক্তি, বা যান্ত্রিক শক্তি হইল মূল ব্যবহৃত জ্বালানীর তাপ-শক্তির রূপান্তর মাত্র।

দ্রুত ধাবমান ট্রেনে হঠাৎ ব্রেক কষিলে রেলের লৌহ-পাটি ও চাকার আকস্মিক দ্রুত ঘর্ষণে অনেক সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। ইহা গতি-শক্তি, বা যান্ত্রিক শক্তির আলোক ও তাপ-শক্তিতে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত। এই ধরনের আরও নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন যুগে কাঠে-কাঠে ঘষিয়া, বা চকমকি-পাথর ঠুকিয়া অগ্নি ও আলোক উৎপাদন করা হইত। ইহাও ঘর্ষণ-জনিত যান্ত্রিক শক্তির তাপ ও আলোক-শক্তিতে রূপান্তর মাত্র।

(ii) **তড়িৎ-শক্তির তাপ ও আলোক-শক্তিতে রূপান্তরঃ** বৈদ্যুতিক বাতির তার-কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিবার ফলে আলোক সৃষ্টি হয় এবং তার-কুণ্ডলীটি অত্যুত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই ক্ষেত্রে তড়িৎ-শক্তি আলোক ও তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। আবার, ইলেক্‌ট্রিক হিটার, ইস্ত্রি ইত্যাদিতে সরু তারের মধ্য দিয়া শক্তিশালী তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিয়া তড়িৎ-শক্তিকে প্রধানতঃ তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়; যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভেদে ইহাতে লক্ষ্যণীয় তেমন কিছু আলোকের উৎপত্তি ঘটে না।

(iii) **তড়িৎ-শক্তির যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরঃ** তড়িৎ-প্রবাহের ফলে বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক ট্রেন প্রভৃতি যে চলে, তাহা কৌশলে তড়িৎ-শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র।

শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র
(Law of Conservation of Energy)

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে, বিভিন্ন প্রকার শক্তির মধ্যে নানাভাবে পারস্পরিক রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন একপ্রকার শক্তি ব্যয় করিলে অপর কোন প্রকার শক্তি কি

পরিমাণে পাওয়া যায় ? বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শক্তির রূপান্তর-কালে মোট শক্তির কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না ; কোন এক প্রকার শক্তি যে পরিমাণ ব্যয়িত হয়, ঠিক সেই পরিমাণ অপর কোনপ্রকার শক্তির উদ্ভব ঘটে। অন্য কথায় বলা যায়, "শক্তির সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই ; বিভিন্ন প্রকার শক্তির মধ্যে কেবল পারস্পরিক রূপান্তর ঘটিয়া থাকে মাত্র। যখনই কোন একপ্রকার শক্তির আপাত-বিলোপ ঘটে, তখনই ঠিক তুল্যাংক পরিমাণ অপর কোন একপ্রকার শক্তির উদ্ভব হয় ; শক্তির মোট পরিমাণ স্থির, অপরিবর্তিত থাকে।" এই তথ্যটিকে বলা হয় **শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র** ।

ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বাষ্পীয় ইঞ্জিনে তাপ-শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে, যে-পরিমাণ তাপ-শক্তি ব্যয় করা হইবে ইঞ্জিনটি হইতে ঠিক সম-পরিমাণ যান্ত্রিক কার্য পাওয়া যাইবে। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য ঠিক এইরূপ ঘটে না ; ইঞ্জিনটি হইতে প্রাপ্ত যান্ত্রিক শক্তি বস্তুতঃ ব্যয়িত তাপ-শক্তি অপেক্ষা অনেকটা কম হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ, ইঞ্জিনে সরবরাহকৃত শক্তির কিছু অংশ ইঞ্জিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঘর্ষণ-জনিত বাধা অতিক্রম করিতে অপচয় হইয়া যায়। এই জন্যই ইঞ্জিন হইতে মোট যে কার্য পাওয়া যায় তাহা ব্যয়িত তাপ-শক্তি অপেক্ষা বেশ কিছুটা কম হইয়া থাকে। কিন্তু ইঞ্জিনে সরবরাহকৃত শক্তির কত অংশ কোন্ দিকে অযথা অপচিত হইয়া গেল, তাহার সূক্ষ্ম হিসাব করা সম্ভব হইলে অবশ্যই দেখা যাইত, মোট শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই ; শক্তির যে-অংশ দৃশ্যতঃ বিলুপ্ত হইল বলিয়া মনে হয়, ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি অবশ্যই অলক্ষিতে অন্য কোন-না-কোন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই যুক্তি শক্তি-সংরক্ষণ সূত্রটির মূল তথ্যানুযায়ী বলিয়া অবশ্যই স্বীকৃত ও সমর্থনযোগ্য।

অনুশীলনী

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. কোন বস্তুর ভর ও ওজন বলিতে কি বুঝায়? 'বস্তুর ভর একটি স্থির অপরিবর্তনীয় ধর্ম, কিন্তু ওজন পরিবর্তনশীল'—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

2. কোন বস্তুর সঠিক ওজন পরিমাপ করা যায় কিভাবে? ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে একই বস্তুর ওজন বিভিন্ন হয় কেন, তাহা ব্যাখ্যা কর।

3. ভর-সংরক্ষণ সূত্রটি ব্যাখ্যা কর এবং ইহার সমর্থনে একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

4. পদার্থের অবিনাশিতা ধর্মের মূল তাৎপর্য উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা কর। ভর-সংরক্ষণ সূত্রটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে প্রযোজ্য কি-না, তাহা যুক্তি সহকারে আলোচনা কর: (ক) কয়লা, বা কাঠ বায়ুতে পোড়াইলে, (খ) ম্যাগনেসিয়াম-তার জ্বালাইলে, (গ) লোহায় মরিচা ধরিলে।

5. শক্তি বলিতে কি বুঝায়? শক্তি প্রধানতঃ কয় প্রকার? বিভিন্ন প্রকার শক্তির মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তর উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা কর।

6. শক্তি-সংরক্ষণ সূত্রটি লিখ এবং উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর:

(i) যে-কোন পদার্থ ই চোখে দেখা যায়।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(ii) শক্তির নিজস্ব কোন বস্তু-সত্তা নাই, পদার্থকে আশ্রয় করিয়া উহার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(iii) বস্তুর ওজন একপ্রকার নিম্নমুখী আকর্ষণ-বল।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(iv) কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ওজন ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্রই সমান থাকে।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(v) সকল প্রকার শক্তির মূল উৎস হইল সূর্য।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

2. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল, তাহা টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর:

(i) কোন বস্তু যে-পরিমাণ জড় উপাদানে গঠিত, তাহাকে কি বলা হয়?—বস্তুটির ভর (...) ; বস্তুটির ওজন (...)।

(ii) ভূ-পৃষ্ঠের তুলনায় খনিগর্ভে কোন বস্তুর ওজন কিরূপ হয়?—বেশী (...) ; সমান (...) ; কম (...)।

(iii) কলিকাতার তুলনায় উত্তর মেরুতে কোন বস্তুর ওজন কিরূপ হইবে?—বেশী (...) ; সমান (...) ; কম (...)।

(iv) লোহায় মরিচা ধরিলে উহার ওজনের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে?—ওজন বৃদ্ধি পায় (...) ; ওজন হ্রাস পায় (...) ; ওজনের পরিবর্তন ঘটে না (...)।

(v) ছুরি, কাঁচি ইত্যাদিতে শান দিবার সময়ে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ কি?—যান্ত্রিক ক্রিয়া (...) ; বৈদ্যুতিক প্রবাহ (...) ; রাসায়নিক বিক্রিয়া (...)।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তিগুলি নির্ভুল কর:

(i) যে-কোন — কোন-না-কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ওজন-বিশিষ্ট ও স্থান-অধিকারী; পক্ষান্তরে, — পদার্থিক অস্তিত্ব নাই, পদার্থকে আশ্রয় করিয়া — বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে।

(ii) কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর নিম্নমুখী আকর্ষণ-বলকে বলা হয় বস্তুটির —, আর উহার সংগঠক জড় পদার্থের পরিমাণকে বলা হয় উহার —।

(iii) পদার্থের — নাই, — নাই; পদার্থ অবিনশ্বর। আপাতদৃষ্টিতে কোন-কোন ক্ষেত্রে পদার্থের উৎপত্তি, বা বিনাশ ঘটে বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে — কিছুমাত্র — ঘটে না; এক পদার্থ অন্য পদার্থে — হয় মাত্র।

(iv) ইঞ্জিনের জ্বালানীর — যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু এইরূপ রূপান্তরকালে মোট — কোনরূপ — ঘটে না।

পদার্থের অবস্থান্তর

(Change of State of Matter)

পাঠ্যসূচী: পদার্থের অবস্থান্তর—গলন, হিমায়ন, স্ফুটন, বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন ; স্ফুটনাংক ও গলনাংক এবং উহাদের উপর বিভিন্ন বাহ্যিক বিষয়ের প্রভাব ; লীন তাপ।

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ তিনটি মাত্র ভৌতাবস্থায় থাকিতে পারে,—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা। পদার্থের স্বাভাবিক গঠন ও পারিপার্শ্বিক চাপ ও তাপের সাধারণ অবস্থায় যে-কোন পদার্থ স্বভাবতঃ এই ত্রিবিধ অবস্থার কোন একটি অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত কৌশলে চাপ ও তাপের পরিবর্তন ঘটাইয়া পদার্থকে যে-কোন একটি অবস্থা হইতে অপর কোন অবস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভবপর। পাঠ্যসূচী অনুসারে পদার্থের এইরূপ ত্রিবিধ অবস্থার পারস্পরিক রূপান্তর-করণের বিবিধ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াদি নিম্নে আলোচিত হইল।

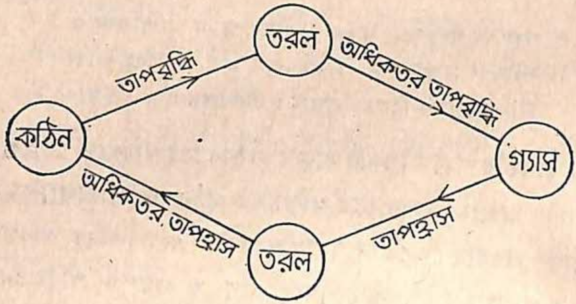
পদার্থের অবস্থান্তর

(Change of State of Matter)

চাপ প্রয়োগ করিলে সকল পদার্থেরই আয়তন কিছু-না-কিছু হ্রাস পায়। কঠিন ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রে চাপের প্রভাবে আয়তন-হ্রাস বিশেষ লক্ষ্যণীয় হয় না। কিন্তু যথোচিত চাপ বৃদ্ধি করিলে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন যথেষ্ট কমে ; এমন কি, উপযুক্ত চাপে কোন-কোন গ্যাসকে তরলে পরিণত করাও যায়। অবশ্য কেবল চাপ বৃদ্ধি করিয়া তরল পদার্থকে কঠিন পদার্থে পরিণত করা বাস্তবে সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ, পদার্থের অবস্থান্তরে চাপের প্রভাব থাকিলেও কার্যতঃ কেবলমাত্র চাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে সকল পদার্থের অবস্থান্তর ঘটানো যায় না

পদার্থের অবস্থান্তর ঘটাইবার কার্যকরী উপায় হইল তাহার **তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি**। কঠিন পদার্থ লোহাকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করিলে তাহা গলিয়া তরল হয়। উষ্ণতা যথোপযুক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি করিতে পারিলে ঐ তরল লোহাকে

গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করাও সম্ভব হইতে পারে। পক্ষান্তরে, এই একই যুক্তিতে আবার গ্যাসীয় পদার্থের তাপমাত্রা যথেষ্ট হ্রাস করিলে তাহা আয়তনে কমিয়া তরলে পরিণত হয়, তাপমাত্রা আরও কমাইলে তরল পদার্থ কঠিন অবস্থা ধারণ করে। তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে পদার্থের এইরূপ অবস্থান্তর নিম্নের ছকটি হইতে সহজেই বুঝা যায় :



তাপের প্রভাবে পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থান্তর

পদার্থের অবস্থান্তরের এই তথ্য জলের ক্ষেত্রে সহজে প্রমাণিত হয়। জল কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় তিনটি অবস্থায়ই থাকিতে পারে। এক খণ্ড বরফ উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে বায়ুমণ্ডলীয় সাধারণ উষ্ণতায়ই তাহা গলিয়া জলে পরিণত হয়; এই জল আরও উত্তপ্ত করিলে বাষ্পে পরিণত হইয়া উবিয়া যায়। কৌশলে এই বাষ্প ধরিয়া রাখিয়া তাহার তাপ-হ্রাস, অর্থাৎ ঠাণ্ডা করিলে তাহা আবার জলে পরিণত হয় এবং আরও ঠাণ্ডা করিলে জল জমিয়া কঠিন বরফে রূপান্তরিত হয়। কেবল জল নহে, বস্তুতঃ যে-কোন পদার্থের ক্ষেত্রেই তাপ-মাত্রার যথোপযুক্ত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাইতে পারিলে তাহার অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে।

পদার্থের অবস্থান্তরের ইহা একটি সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সকল পদার্থ উত্তাপে গলে না; যেমন—কাঠ, কাগজ, কয়লা প্রভৃতি উত্তাপে তরল হয় না, পুড়িয়া যায়। ইহা পদার্থের ভৌত অবস্থান্তর (change of physical state) নহে, রাসায়নিক রূপান্তর (chemical change), বিজ্ঞানের বিচারে যাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার।

গলন ও হিমায়ন (Melting and Freezing) :

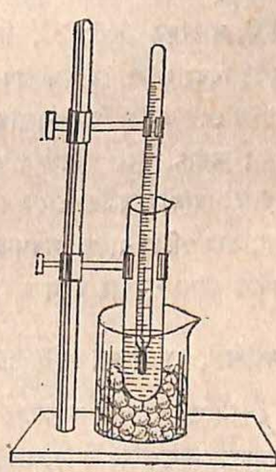
উপযুক্ত উত্তাপে সাধারণতঃ সকল পদার্থই গলিয়া তরল হয়। পদার্থের কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিণত হইবার এই পরিবর্তন-

ক্রিয়াকে বলা হয় **গলন** (melting, or fusion)। পদার্থটি বিশুদ্ধ হইলে তাহা সর্বদা একটি সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গলে ; এই তাপমাত্রাকে বলা হয় ঐ কঠিন পদার্থটির **গলনাংক** (melting point)। বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রত্যেকটি কঠিন পদার্থের গলনাংক সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে ; যেমন, লোহার গলনাংক 1530°C ও বরফের 0°C।

আবার, কোন তরল পদার্থকে ঠাণ্ডা করিলে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তাহা কঠিন হইয়া পড়ে। তাপ-হ্রাস, অর্থাৎ শৈত্য-প্রয়োগে তরল পদার্থকে কঠিন করিবার এই অবস্থান্তর-ক্রিয়াকে বলা হয় **হিমায়ন** (freezing), বা **কঠিনীভবন** (solidification)। যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন তরল পদার্থ জমিয়া কঠিন হয়, তাহাকে বলে তরলটির **হিমাংক** (freezing point)। যে-কোন বিশুদ্ধ তরল পদার্থের কোন একটি সুনির্দিষ্ট হিমাংক থাকে ; যেমন, পাতিত বিশুদ্ধ জলের হিমাংক হইল 0°C, অর্থাৎ 0°C তাপমাত্রায় জল জমিয়া কঠিন বরফে পরিণত হয়।

লক্ষ্য করা যায়, **যে-কোন বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাংক ও হিমাংক সর্বদা একই হইয়া থাকে।** নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্যটির সত্যতা সহজেই প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষা: একটি পরীক্ষানলে কিছু বিশুদ্ধ (পাতিত) জল লইয়া তাহার মধ্যে একটি সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারের পারদ-পূর্ণ বাল্বটি নিমজ্জিত অবস্থায় ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। এখন একটি বীকারে রক্ষিত বরফ-কুচি ও লবণের মিশ্রণের মধ্যে থার্মোমিটারসহ পরীক্ষানলটি দণ্ডায়মান রাখা হইল। বরফ ও লবণের মিশ্রণ বিশেষ ঠাণ্ডা হয়, উহার উষ্ণতা হয় প্রায়—20°C ; এইরূপ মিশ্রণকে বলে **হিম-মিশ্রণ** (freezing mixture)। কাজেই ইহার সংস্পর্শে পরীক্ষানলের জল ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া এক সময় জমিয়া বরফে পরিণত হইতে থাকিবে ; এই সময় থার্মোমিটারে তাপমাত্রা দেখা যাইবে 0°C সেন্টিগ্রেড। ইহা হইতে বুঝা যায়, জলের হিমাংক হইল 0°C।



জলের হিমাংক ও বরফের গলনাংক নির্ণয়

পরীক্ষানলের সম্পূর্ণ জল বরফে পরিণত হইলে থার্মোমিটারসহ পরীক্ষানলটি হিম-মিশ্রণ হইতে তুলিয়া বায়ু-মধ্যে রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় বায়ুর স্বাভাবিক উষ্ণতায় পরীক্ষানলের বরফ গলিয়া পুনরায় জলে পরিণত হইতে থাকিবে; কিন্তু থার্মোমিটারে তাপমাত্রা পূর্বের ন্যায় 0°C-ই দেখা যাইবে। অতএব, জলের হিমাংক ও বরফের গলনাংক যে একই, তাহা প্রমাণিত হইল।

স্ফুটন ও ঘনীভবন (Boiling and Condensation):

কোন তরল পদার্থকে উত্তপ্ত করিলে উহার উষ্ণতা ক্রমে বাড়িতে থাকে এবং তরলের উপরিতল হইতে ধীরে ধীরে বাষ্প উত্থিত হয়। ক্রমে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া পরিশেষে তরলটি ফুটিতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং উহার সকল অংশ হইতেই দ্রুত গতিতে বাষ্প উঠিতে থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় তরলের **স্ফুটন** (Boiling)। পক্ষান্তরে, কোন পদার্থের বাষ্পকে উপযুক্তরূপে শীতল করিলে তাহা ঘনীভূত হইয়া তরলে পরিণত হয়; এই প্রক্রিয়াকে বলে **ঘনীভবন** (Condensation)।

কোন তরল পদার্থ যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয়, তাহাকে বলে ঐ তরলের **স্ফুটনাংক** (boiling point)। বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রত্যেক তরলের স্ফুটনাংক সর্বদা সুনির্দিষ্ট থাকে; যেমন, বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাংক 100°C, পারদের 356·7°C, গ্লিসারিনের 290°C ইত্যাদি। আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল, যে উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থ ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয়, বাষ্পটিও সেই একই তাপমাত্রায় ঘনীভূত হইয়া তরলে রূপান্তরিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ, তরল হইতে বাষ্প, অথবা বাষ্প হইতে তরলে রূপান্তর-ক্রিয়া একই তাপমাত্রায় ঘটিয়া থাকে। স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জল 100°C তাপমাত্রায় ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয় এবং জলীয় বাষ্পও ঐ একই তাপমাত্রায় ঘনীভূত হইয়া পুনরায় জলে রূপান্তরিত হয়।

বাষ্পায়ন, বা বাষ্পীভবন (Evaporation):

কোন তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করিবার জন্য উহাকে স্ফুটনাংক তাপমাত্রায় উত্তপ্ত না করিলেও চলে। বস্তুতঃপক্ষে, যে-কোন তরল পদার্থ স্বাভাবিক উষ্ণতায়ই অল্পাধিক মাত্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়; যেমন, কোন উন্মুক্ত পাত্রে কিছু জল রাখিলে দেখা যায়, পাত্রে জলের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিতে থাকে, অর্থাৎ জল ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হইয়া উবিয়া

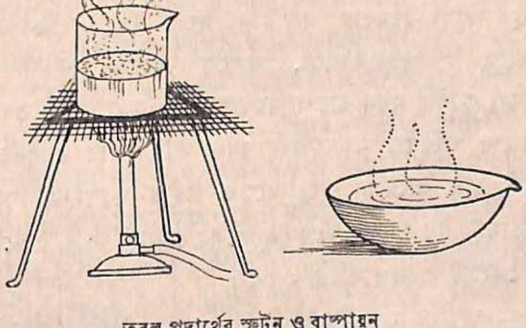
যায়। জলের স্ফুটনাংক তাপমাত্রা হইল 100°C ; কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্ফুটনাংকের অনেক নিম্নে স্বাভাবিক উষ্ণতায়ই জল বাষ্পে পরিণত হইতেছে। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় যে-কোন তরলের এইরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাষ্পে রূপান্তরিত হইবার প্রক্রিয়াকে বলা হয় **বাষ্পায়ন**, বা **বাষ্পীভবন** (evaporation)।

একই উষ্ণতায় সকল তরল পদার্থ সমান মাত্রায় বাষ্পায়িত হয় না ; যেমন, সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে লক্ষ্য করা যায়, অ্যালকোহল, বা ইথার উন্মুক্ত স্থানে রাখিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উবিয়া যায়, কিন্তু জল উবিয়া যাইতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। ইহার কারণ, অ্যালকোহল ও ইথারের স্ফুটনাংক যথাক্রমে 78°C ও 34.2°C ; এই তাপমাত্রা জলের স্ফুটনাংক (100°C) অপেক্ষা অনেক কম বলিয়াই অ্যালকোহল ও ইথার জল অপেক্ষা অনেক দ্রুত বাষ্পায়িত হইয়া যায়। যে তরল পদার্থের স্ফুটনাংক যত কম, স্বাভাবিক উষ্ণতায় তাহার বাষ্পায়নের হার তত বেশী, এবং তাহাকে তত বেশী **উদ্বায়ী** (volatile) পদার্থ বলা হয়।

বাষ্পায়ন ও স্ফুটনের পার্থক্য :

(Difference between Evaporation and Boiling)

বাষ্পায়ন ও স্ফুটন উভয় প্রক্রিয়াতেই তরল পদার্থ বাষ্পে রূপান্তরিত হইলেও উহাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে ; যেমন—



তরল পদার্থের স্ফুটন ও বাষ্পায়ন

(i) স্ফুটন-ক্রিয়া ঘটে কোন সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (স্ফুটনাংক) ; কিন্তু বাষ্পায়নের পক্ষে কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না, উহা যে-কোন উষ্ণতায়ই অল্পাধিক মাত্রায় ঘটিয়া থাকে। কোন তরলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা

হইলে উহার বাষ্পায়নের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে যথেষ্ট উত্তপ্ত হইয়া স্ফুটনাংক তাপমাত্রায় পৌঁছিলে তরলটি ফুটিতে আরম্ভ করে।

(ii) স্ফুটনের তুলনায় বাষ্পায়ন অপেক্ষাকৃত মন্থরগতি প্রক্রিয়া।

(iii) বাষ্পায়নকালে তরলের কেবলমাত্র উপরিতল হইতে বাষ্প নির্গত হয়, কিন্তু স্ফুটন-ক্রিয়ায় তরলের সকল অংশ হইতেই বাষ্প উদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং উপরিতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করিলে তরলের বাষ্পায়নের হার বৃদ্ধি পায়।

লীন তাপ
(Latent Heat)

সাধারণতঃ কোন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে উহার তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু পদার্থের অবস্থান্তর-কালে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। ধরা যাক, বরফ ও জলের একটি মিশ্রণকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হইতেছে। এই মিশ্রণে একটি থার্মোমিটার নিমজ্জিত রাখিলে দেখা যাইবে, মিশ্রণে ক্রমাগত তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও উহার তাপমাত্রা কিন্তু বৃদ্ধি পায় না। বরফ গলিয়া ক্রমে জলে পরিণত হইতেছে, কিন্তু সম্যক বরফ জলে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত থার্মোমিটারে মিশ্রণটির তাপমাত্রা বরফের গলনাংক তাপমাত্রায় (0°C) স্থির অপরিবর্তিত থাকে, দেখা যায়। অবশ্য বরফ সম্পূর্ণভাবে গলিয়া যাইবার পরে জলের তাপমাত্রা আবার স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই পরীক্ষা হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, মিশ্রণে যে-তাপ পূর্বে সরবরাহ করা হইয়াছিল তাহা বরফকে গলাইয়া জলে রূপান্তর-ক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে ব্যয়িত হইয়াছে। অনুরূপভাবে, জলকে উহার স্ফুটনাংক তাপমাত্রায় (100°C) উত্তপ্ত করিয়া যখন বাষ্পে অবস্থান্তরিত করা হয়, তখন দেখা যায়, সম্যক জল বাষ্পে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না, অর্থাৎ তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও উহার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় না, 100°C উষ্ণতায়ই স্থির থাকে। কেবল জলের ক্ষেত্রেই নহে, যে-কোন পদার্থের অবস্থান্তরের ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

স্থির তাপমাত্রায় কোন কঠিন পদার্থ তরলে, অথবা কোন তরল পদার্থ বাষ্পে রূপান্তরিত হইবার সময় যে পরিমাণ তাপ প্রযুক্ত হয়, তাহা ঐ অবস্থান্তরিত পদার্থে সঞ্চিত হইয়া থাকে; এই তাপকে বলা হয় **লীন তাপ** (latent heat)। থার্মোমিটারে এই তাপের কোনরূপ প্রভাব ধরা

পড়ে না ; উহা সম্পূর্ণভাবে পদার্থের ভৌত অবস্থান্তর-ক্রিয়ায় ব্যয়িত হয় এবং অবস্থান্তরিত পদার্থে লুপ্ত, বা **লীন** (latent) হইয়া থাকে। লীন তাপ দুই প্রকার ; যেমন—কঠিন পদার্থের গলনকালে বিগলিত পদার্থে যে পরিমাণ তাপ লীন, বা লুপ্ত হইয়া থাকে তাহাকে বলা হয় **গলনের লীন তাপ (latent heat of fusion),** এবং তরল পদার্থকে বাষ্পে রূপান্তরিত করিবার সময় যে তাপ বাষ্পের মধ্যে সঞ্চিত, বা লীন হইয়া থাকে তাহাকে বলে **বাষ্পীভবনের লীন তাপ** (latent heat of evaporation)। বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে এইরূপ লীন তাপের মান বিভিন্ন হয়।

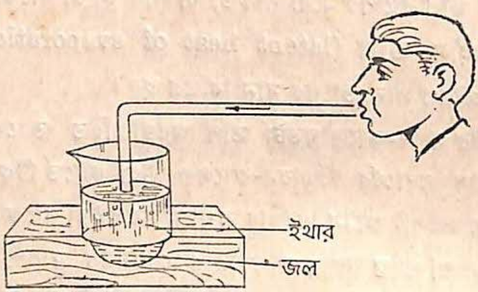
কঠিন পদার্থের গলন-কালে যতটা তাপ অবস্থান্তরিত তরলে লীন হইয়া থাকে, সেই তরল পদার্থের হিমায়ন-কালেও উহা হইতে ঠিক সেই পরিমাণ তাপ হ্রাস করিলে তরলটি কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া থাকে ; অবস্থান্তর-ক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উহার তাপমাত্রার কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। আবার, কোন তরলে যে-পরিমাণ লীন তাপ সরবরাহ করিলে তাহা বাষ্পে পরিণত হয়, বাষ্পটিকে ঘনীভূত করিয়া তরলে রূপান্তরিত করিতে হইলে উহার ঠিক সেই পরিমাণ তাপ হ্রাস করা প্রয়োজন হয় ; অবশ্য এইরূপ তাপ-হ্রাসের ফলে দৃশ্যতঃ তাপমাত্রা কিছু মাত্র হ্রাস পায় না।

বাষ্পীভবনে তাপ-হ্রাস (Cooling by Evaporation) :

স্ফুটন, বা বাষ্পায়ন উভয় ক্ষেত্রেই তরল হইতে বাষ্পে অবস্থান্তর-ক্রিয়ায় অবশ্যই কিছু পরিমাণ তাপ ব্যয়িত হয়। স্ফুটনের ক্ষেত্রে দীপ-শিখা এই তাপ সরবরাহ করে এবং বাষ্পায়ন-কালে তরলটি উহার পারিপার্শ্বিক বস্তু হইতে এই তাপ শোষণ করে, যাহার ফলে অবস্থান্তর-ক্রিয়া সম্ভব হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ধাতু অপেক্ষা মাটির তৈয়ারী কুঁজার জল গ্রীষ্মকালে বেশী ঠাণ্ডা হয়। ইহার কারণ, মাটির কুঁজার গাত্রের অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়া জল চোঁয়াইয়া বাহিরে আসে এবং ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হইতে থাকে। এই অবস্থান্তরের জন্য যে 'লীন তাপ' প্রয়োজন হয়, কুঁজা হইতে জল তাহা শোষণ করে বলিয়াই কুঁজার জল যথেষ্ট ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। ধাতু-নির্মিত পাত্রের গাত্রে এইরূপ সূক্ষ্ম ছিদ্র না থাকায় জল ঐরূপভাবে বাষ্পীভূত হইতে পারে না বলিয়া তাহা বিশেষ ঠাণ্ডা হয় না। লীন তাপের এই তথ্যটি একটি পরীক্ষার সাহায্যে সহজেই বুঝা যাইবে।

পরীক্ষা ঃ একটি কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যস্থলে ছোট একটি অগভীর গর্তে কিছু পরিমাণ জল লইয়া তাহার উপর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইথার-পূর্ণ একটি বীকার রাখা হইল। একটি সরু কাচ-নলের এক প্রান্ত ইথারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অপর প্রান্তে মুখ দিয়া ফুঁ দিলে ইথারের মধ্য দিয়া বুদ্‌বুদ্‌ আকারে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। এইভাবে আলোড়ন সৃষ্টির ফলে ইথার অতি



ইথারের বাষ্পীভবনে 0°C শৈত্য উৎপাদন

দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। তরল হইতে বাষ্পে এইরূপ রূপান্তরের জন্য যে লীন তাপ প্রয়োজন হয় ইথার নিজেই তাহা সরবরাহ করে এবং উহার তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পাইয়া 0°C-এর যথেষ্ট নীচে নামিয়া যায়। ইহার ফলে বীকারের নীচের জলও দ্রুত ঠাণ্ডা হইতে থাকে এবং উহার তাপমাত্রা 0°C-এ পৌঁছাইবা মাত্র জল হিমায়িত হইয়া বরফে পরিণত হয়।

পদার্থের অবস্থান্তর-তাপমাত্রা নির্ধারক বিষয়সমূহ
(Factors effecting change of states of matter)

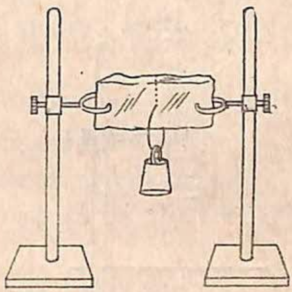
কোন পদার্থ যে তাপমাত্রায় এক ভৌতাবস্থা হইতে অপর কোন অবস্থায় রূপান্তরিত হয় (অর্থাৎ কঠিন পদার্থের গলনাংক ও তরল পদার্থের স্ফুটনাংক), তাহা প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল ; যেমন—

(i) **পদার্থের বিশুদ্ধতা (Purity) ঃ** বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রত্যেক কঠিন পদার্থের কোন একটি সুনির্দিষ্ট গলনাংক থাকে। কোন পদার্থে কিছু অবিশুদ্ধি (impurities) মিশ্রিত থাকিলে উহার গলনাংক হ্রাস পায়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ পদার্থ অপেক্ষা অবিশুদ্ধ পদার্থ সর্বদা কিছু কম উষ্ণতায় বিগলিত হয়। সাধারণতঃ কোন কঠিন পদার্থের গলনাংক নির্ণয় করিয়া মোটামুটিভাবে উহার

বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। আবার, কঠিন পদার্থের গলনাংকের ন্যায় প্রত্যেক বিশুদ্ধ তরলের স্ফুটনাংকও সর্বদা সুনির্দিষ্ট ; কিন্তু কোন তরলে কিছু অবিশুদ্ধি দ্রবীভূত থাকিলে উহার স্ফুটনাংক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কোন তরল পদার্থ বিশুদ্ধ কি-না তাহা মোটামুটিভাবে জানিবার জন্য প্রায়শঃই উহার স্ফুটনাংক নির্ণয় করা হয়।

(ii) চাপ (Pressure) : চাপ বৃদ্ধি করিলে অধিকাংশ কঠিন পদার্থের গলনাংক বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু বরফ ইহার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, অর্থাৎ চাপ-বৃদ্ধির ফলে বরফের গলনাংক হ্রাস পাইয়া থাকে। চাপ প্রয়োগে বরফের গলনাংক হ্রাসের একটি চমকপ্রদ পরীক্ষা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

পরীক্ষা : একখণ্ড বরফের উপর একটি সরু ধাতব তার জড়াইয়া উহার প্রান্ত দুইটি পরস্পর বাঁধিয়া উহা হইতে একটি ভারী ওজন ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। বরফের উপর এইভাবে চাপ প্রয়োগ করিবার ফলে তারটির সংস্পর্শস্থিত বরফের গলনাংক স্থানীয়ভাবে 0°C অপেক্ষা হ্রাস পায়। কিন্তু বরফ-খণ্ডটি যে তাপমাত্রাতে আছে (অর্থাৎ 0°C) তাহা যেহেতু গলনাংকের এই চাপ-জনিত মান অপেক্ষা বেশী, সুতরাং তারের সংলগ্ন বরফ গলিয়া জলে পরিণত হয় এবং তারটি এই জলের মধ্য দিয়া নীচে নামে। 0°C অপেক্ষা কম তাপমাত্রাতে বরফের গলনের ফলে এইভাবে উৎপন্ন জলের তাপমাত্রাও 0°C অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। এখন, তারটি বরফ কাটিয়া নীচে নামিয়া গেলে জলের উপর সেই অতিরিক্ত চাপ আর ক্রিয়া করে না এবং বরফের গলনাংক (অর্থাৎ জলের হিমাংক) পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া 0°C-তে পৌঁছায়; ইহার ফলে জল পুনরায় হিমায়িত হইয়া বরফে পরিণত হয়। তারটি এইভাবে বরফের চাঁইটির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামে, কিন্তু বরফ-খণ্ডটি পূর্বের ন্যায় অবিভক্তই থাকে।

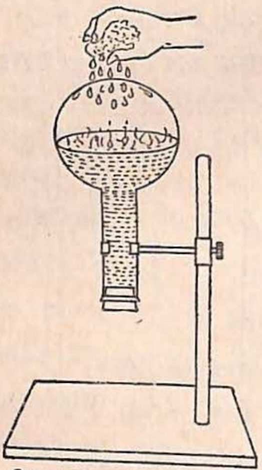


চাপ প্রয়োগে বরফ গলে

কঠিন পদার্থের গলনাংকের ন্যায় যে-কোন তরল পদার্থের স্ফুটনাংকও উহার উপরিস্থিত চাপের উপর নির্ভরশীল। কোন তরলের নিজস্ব বাষ্পীয় চাপ ও সংলগ্ন বায়ুর চাপ পরস্পর সমান হইলেই তরলটি ফোটে। সুতরাং স্থানীয় বায়ুচাপ কম-বেশী হইলে তরলের স্ফুটনাংকও তদনুযায়ী কমে-বাড়ে।

সমতল ভূমিতে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে জল 100°C উষ্ণতায় ফোটে, কিন্তু দার্জিলিঙ, সিমলা প্রভৃতি পার্বত্য উচ্চভূমিতে বায়ুচাপ কম বলিয়া সেখানে 100°C অপেক্ষা কম উষ্ণতায়ই জল ফুটিতে থাকে, অর্থাৎ জলের স্ফুটনাংক হ্রাস পায়। অপর পক্ষে, ভূ-গর্ভে খনির মধ্যে বায়ুচাপ বেশী, কাজেই সেখানে জলের স্ফুটনাংক বেশী হয়, অর্থাৎ জল ফুটিতে অধিক উষ্ণতা লাগে।

জলের উপরিস্থিত বায়ুচাপ, বা বাষ্পীয় চাপ কমিলে যে তাহার স্ফুটনাংক কমে, তাহার একটি চমকপ্রদ পরীক্ষা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।


নিম্ন চাপে কম উষ্ণতায়ও জল ফোটে

পরীক্ষা ঃ একটি কাচের ফ্লাস্কে প্রায় অর্ধাংশ পরিমাণ জল পূর্ণ করিয়া উত্তপ্ত করিলে 100°C উষ্ণতায় যথানিয়মে জল ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হইতে থাকিবে এবং এই বাষ্পের চাপে ফ্লাস্কের ভিতরের বায়ু ক্রমে বাহির হইয়া যাইবে। সম্যক বায়ু বাহির হইয়া ফ্লাস্কটির অভ্যন্তরভাগ যখন শুধু জলীয় বাষ্পে পূর্ণ হয়, তখন ফ্লাস্কটির মুখে ছিপি আঁটিয়া উহাকে উল্টাইয়া একটি বন্ধনীর সাহায্যে নিম্নমুখী করিয়া রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় উষ্ণতা 100°C অপেক্ষা কমিবার ফলে ফ্লাস্কের জল আর ফোটে না; কিন্তু উল্টানো ফ্লাস্কটির উপরাংশ জলীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকে। এখন জলসিক্ত তুলা, বা কাপড় নিংড়াইয়া ঠাণ্ডা জল ফ্লাস্কটির উপর দিলে ভিতরের জল সঙ্গে-সঙ্গে আবার ফুটিতে আরম্ভ করে। সাধারণতঃ উত্তাপে জল ফোটে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে শৈত্য প্রয়োগে জল ফুটানো সম্ভব হইল। ইহার কারণ, ফ্লাস্কটির উপর জল দিয়া উহাকে ঠাণ্ডা করিবার ফলে ভিতরে আবদ্ধ জলীয় বাষ্পের কতকাংশ ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হয়; কাজেই ফ্লাস্কের জলের উপরিস্থিত বাষ্পীয় চাপ হ্রাস পাইবার ফলে জলের স্ফুটনাংক যথেষ্ট কমিয়া যায়, এবং অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত জল পুনরায় ফুটিতে আরম্ভ করে।

কেবল জলই নহে, যে-কোন তরলের স্ফুটনাংক তাহার পারিপার্শ্বিক চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী কমে-বাড়ে। অবশ্য ভূ-পৃষ্ঠের স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে

কোন তরল যে-উষ্ণতায় ফোটে তাহাকেই সাধারণতঃ ঐ তরলের স্ফুটনাংক (boiling point) বলা হয়।

অনুশীলনী

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. পদার্থের অবস্থান্তর বলিতে কি বুঝায়? পদার্থকে এক ভৌতাবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করিবার সাধারণ পদ্ধতি উদাহরণ সহকারে আলোচনা কর।

2. পদার্থের বিভিন্ন ভৌতাবস্থা কি কি? 'অবস্থান্তরের ফলে পদার্থের কোন মৌলিক উপাদানগত পরিবর্তন ঘটে না'—উদাহরণ-সহকারে উক্তিটির সত্যতা ব্যাখ্যা কর।

3. গলনাংক ও হিমাংকের সংজ্ঞা লিখ। জলের হিমাংক ও বরফের গলনাংক যে একই তাপমাত্রা, তাহা পরীক্ষার সাহায্যে কিভাবে প্রমাণ করিবে?

4. তরলের স্ফুটনাংক কোন্ কোন্ বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল? কোন তরলের উপরস্থ চাপ কমিলে তরলটি যে উহার স্বাভাবিক স্ফুটনাংক অপেক্ষা কম উষ্ণতায়ই ফোটে, তাহা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ কর।

5. পদার্থের গলনাংকের উপর বিভিন্ন বাহ্যিক বিষয়ের প্রভাব আলোচনা কর। চাপ বৃদ্ধি করিলে বরফের গলনাংকের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে? এতদ্বিষয়ে একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

6. বাষ্পীভবন বলিতে কি বুঝায়? বাষ্পীভবন ও স্ফুটনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

7. লীন তাপ কাহাকে বলে? যে-কোন তরলের বাষ্পীভবনের জন্য কিছু পরিমাণ লীন তাপ প্রয়োজন হয়, ইহার সমর্থনে একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

8. ধাতুনির্মিত কুঁজার তুলনায় মাটির কুঁজার জল কেন অধিক ঠাণ্ডা হয়, তাহা ব্যাখ্যা কর। হাতে অ্যালকোহল, বা ইথার পড়িলে ঠাণ্ডা লাগে কেন?

9. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:—(ক) স্ফুটন ও ঘনীভবন, (খ) স্ফুটনাংকের উপর চাপের প্রভাব, (গ) লীন তাপ, (ঘ) গলনাংক ও স্ফুটনাংকের উপর অবিশুদ্ধির প্রভাব, (ঙ) প্রেসার-কুকারের কার্যকারিতা, (চ) বাষ্পায়ন ও স্ফুটনের পার্থক্য।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, তাহা টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর:—

(i) যে-কোন পদার্থের উপর চাপ প্রয়োগ করিলে তাহার আয়তন কিছু-না-কিছু হ্রাস পায়।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(ii) যে-কোন কঠিন পদার্থকে যথোচিত উত্তপ্ত করিলে উহা তরলে পরিণত হয়।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(iii) কোন কঠিন পদার্থ যে উষ্ণতায় তরলে পরিণত হয়, তরলটি তাহা অপেক্ষা কম উষ্ণতায় কঠিনে রূপান্তরিত হয়।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(iv) অ্যালকোহল অপেক্ষা জল অধিকতর উদ্বায়ী।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(v) যে তরলের স্ফুটনাংক যত বেশী, তাহা তত দ্রুত বাষ্পীভূত হয়।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(vi) চাপ বৃদ্ধি করিলে বরফের গলনাংক হ্রাস পায়।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(vii) যে-কোন কঠিন পদার্থে কিছু অবিশুদ্ধি মিশ্রিত থাকিলে উহার গলনাংক হ্রাস পায়।—ভুল (...); নির্ভুল (...)।

(viii) তাপ প্রয়োগ করিলে যে-কোন পদার্থের তাপমাত্রা সর্বদাই বৃদ্ধি পায়।—ভুল (...), নির্ভুল (...)।

2. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল তাহা টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :—

(i) বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাংকের তুলনায় চিনির জলীয় দ্রবণের স্ফুটনাংক কিরূপ হইবে?—বেশী (...); সমান (...); কম (...)।

(ii) কলিকাতায় যদি জল 100°C তাপমাত্রায় ফোটে, তাহা হইলে দার্জিলিঙে জল ফুটিতে কিরূপ উষ্ণতা প্রয়োজন হইবে?—100°C অপেক্ষা বেশী (...), 100°C (...); 100°C অপেক্ষা কম (...)।

(iii) কয়লাকে যথোচিত উত্তপ্ত করিলে তাহা পুড়িয়া যায়। ইহা কি ধরনের পরিবর্তন? —ভৌত অবস্থান্তর (...); রাসায়নিক রূপান্তর (...)।

(iv) কোন তরলের বাষ্পায়ন-কালে উহার কোন্ অংশ হইতে বাষ্প উত্থিত হয়?—তরলের উপরিতল হইতে (...); সমগ্র তরল হইতে (...)।

(v) চাপ বৃদ্ধি করিলে বরফের গলনাংকের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে?—গলনাংক বৃদ্ধি পায় (...); গলনাংক হ্রাস পায় (...)।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তিগুলি নির্ভুল কর :—

(i) কঠিন ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রে চাপের প্রভাবে আয়তনের — বিশেষ লক্ষ্যণীয় হয় না। কিন্তু যথোচিত চাপ বৃদ্ধি করিলে — পদার্থের আয়তন যথেষ্ট কমে; এমন কি, উপযুক্ত চাপে গ্যাস অবস্থান্তরিত হইয়া — রূপান্তরিত হইতে পারে।

(ii) বাষ্পায়ন-কালে তরলের কেবলমাত্র — হইতে বাষ্প নির্গত হয়; অতএব — ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি করিলে বাষ্পায়নের হার — পায়।

(iii) কোন কঠিন পদার্থে কিছু — মিশ্রিত থাকিলে উহার গলনাংক — পায়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ পদার্থ অপেক্ষা অবিশুদ্ধ পদার্থ সর্বদা কিছু — উষ্ণতায় বিগলিত হয়।

(iv) গলনাংক তাপমাত্রায় কোন কঠিন পদার্থকে তরলে রূপান্তরিত করিতে যে-পরিমাণ তাপ প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলা হয় গলনের — তাপ।

(v) কোন তরলের নিজস্ব বাষ্পচাপ ও সংলগ্ন — পরস্পর সমান হইলে তবেই তরলটি —। স্থানীয় — কম-বেশী হইলে তরলের — ও তদনুযায়ী কমে-বাড়ে।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঃ পদার্থ-বিদ্যা ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্থিতি ও গতি

(Rest and Motion)

পাঠ্যসূচী : স্থির ও সচল অবস্থা; সরণ, দ্রুতি ও গতিবেগ, ত্বরণ ও মন্দন; নিউটনের গতিসূত্র, বলের সংজ্ঞা।

স্থির ও সচল অবস্থা

(State of Rest and Motion)

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু হয় স্থির, নতুবা চলমান অবস্থায় আছে। কোন বস্তুর স্থিরতা, বা সচলতা তাহার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য স্থির বস্তুর, যেমন মাটি, বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা প্রভৃতির আপেক্ষিকে নির্ণীত হয়। বস্তুতঃ কোন-কিছুর স্থিরাবস্থা ও চলমান অবস্থা উহার পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন স্থির বস্তুর অবস্থানের একটি আপেক্ষিক, বা তুলনামূলক ধারণা মাত্র।

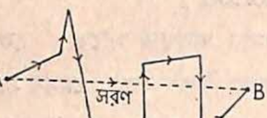
অতএব বলা যায়, পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বস্তুর অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোন নির্দিষ্ট বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে বস্তুটি **সচল অবস্থায় (in motion)** আছে বলা হয়; অপরপক্ষে, বস্তুটি সর্বদা একই স্থানে থাকিলে, অর্থাৎ উহার কোনরূপ স্থানচ্যুতি না ঘটিলে বলা হয় বস্তুটি **স্থিরাবস্থায় (at rest)** রহিয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনায় একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বলা হইয়াছে, পারিপার্শ্বিক স্থির বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে কোন বস্তুর সচলতা বুঝা যায়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পার্থিব কোন বস্তুই স্থির নাই। আমরা জানি, পৃথিবী সর্বদাই নিজ অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তিত হইতেছে। সুতরাং মহাশূন্যের পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যতঃ স্থির, বা সচল সকল পার্থিব বস্তুই নিয়ত স্থান পরিবর্তন করিতেছে; পৃথিবীর বাহির হইতে লক্ষ্য করিতে পারিলে ইহা অবশ্যই বুঝা যাইত। যাহা হউক, সাধারণতঃ আমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন পার্থিব বস্তুর অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কোন নির্দিষ্ট বস্তুর স্থিরতা, বা সচলতা নির্ণয় করিয়া থাকি। বস্তুর স্থিরতা, বা সচলতা নিছক একটি আপেক্ষিক, বা তুলনামূলক ব্যাপার মাত্র; স্থিরতা-সচলতার কোন সঠিক মাপকাঠি নাই।

সরণ (Displacement)

সংজ্ঞা ঃ নির্দিষ্ট দিকে কোন বস্তুর স্থানচ্যুতির পরিমাণকে বলা হয় বস্তুটির সরণ (displacement)।

কোন সচল বস্তু যে সর্বদা একই দিকে চলিবে তাহা না-ও হইতে পারে; উহা আঁকাবাঁকা, বা বৃত্তাকার পথেও চলিতে পারে। বস্তুটির প্রাথমিক ও অন্তিম অবস্থানের মধ্যে যে রৈখিক দূরত্ব (linear distance), তাহাই হইল বস্তুটির সরণের প্রকৃত পরিমাপ। ধরা যাক, কোন বস্তু A বিন্দু হইতে শুরু করিয়া আঁকাবাঁকা যদৃচ্ছ পথে চলিয়া অবশেষে B বিন্দুতে উপনীত হইল। বস্তুটির প্রকৃত গতিপথ যাহাই হউক না কেন, উহার সরণ ঘটিল AB সরলরৈখিক দূরত্ব। সরণের মান কেবলমাত্র প্রাথমিক ও অন্তিম অবস্থানের উপর নির্ভর করে; বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে কোন্ গতিপথ অনুসরণ করিয়া প্রথম অবস্থান হইতে শেষ অবস্থানে পৌঁছিল, তাহা বিবেচ্য নহে।



বস্তুর স্থানচ্যুতির পরিমাপ নির্ণয়

সরণের নির্দিষ্ট মান ও অভিমুখ উভয়ই উল্লেখ করিতে হয়। এইক্ষেত্রে AB হইল সরণের মান এবং উহার অভিমুখ হইল A হইতে B-এর দিকে।

দ্রুতি ও গতিবেগ (Speed and Velocity)

কোন সচল বস্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করিতেছে তাহা উল্লেখ করিলে আমরা সহজেই ধারণা করিতে পারি, বস্তুটি কত দ্রুত, বা কত মন্থর গতিতে চলিতেছে। সচল বস্তুর এইরূপ দ্রুততা, বা মন্থরতা প্রকাশ করা হয় উহার দ্রুতি (speed) দ্বারা।

সংজ্ঞা ঃ কোন চলমান বস্তু প্রতি একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহাকে বলা হয় বস্তুটির দ্রুতি (speed)।

দ্রুতি বলিতে কোন দিক্-নির্দেশের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতির উল্লেখ করিলে তাহাকে বলা হয় গতিবেগ (velocity)।

সংজ্ঞা ঃ কোন নির্দিষ্ট দিকে বস্তুর সরণের হার, অর্থাৎ বস্তুটি প্রতি একক সময়ে নির্দিষ্ট দিকে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহাকে বলা হয় বস্তুটির গতিবেগ (velocity)।

যদি কোন বস্তু t সময়ে কোন নির্দিষ্ট দিকে l দূরত্ব অতিক্রম করে (অর্থাৎ, উহার সরণের মান l হয়), তাহা হইলে ঐ নির্দিষ্ট দিকে বস্তুটির গতিবেগ, v, হইবে :

$$v = \frac{l}{t}; \text{ অর্থাৎ, } \text{গতিবেগ} = \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}}$$

দ্রুতির সহিত গতিবেগের একমাত্র পার্থক্য হইল, গতিবেগের মান ও দিক উভয়ই সুনির্দিষ্ট ; কিন্তু দ্রুতির কোন সুনির্দিষ্ট মান থাকিলেও উহার দিক নির্দিষ্ট নহে। কোন ট্রেনের দ্রুতি ঘণ্টায় 40 মাইল বলিলে বুঝা যায়, ট্রেনটি প্রতি ঘণ্টায় 40 মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিতেছে ; কিন্তু ট্রেনটি কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহার কোনরূপ আভাস পাওয়া যায় না, ট্রেনটি অবশ্যই মাঝে-মাঝে দিক পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু যদি বলা হয় যে, ট্রেনটি উত্তর হইতে দক্ষিণে ঘণ্টায় 40 মাইল গতিবেগে চলিতেছে, তাহা হইলে ট্রেনটির গতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় ; কারণ, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, ট্রেনটি প্রতি ঘণ্টায় 40 মাইল করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে ধাবিত হইতেছে।

গতিবেগের একক : যেহেতু গতিবেগ = সরণ/সময়, অতএব, সরণের (দূরত্ব, বা দৈর্ঘ্যের) এককে সময়ের একক দ্বারা ভাগ করিলে গতিবেগের (বা, দ্রুতির) একক পাওয়া যায়। সুতরাং সি. জি. এস. পদ্ধতিতে গতিবেগের একক হইল সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড, মিটার/সেকেণ্ড, কিলো-মিটার/ঘণ্টা ইত্যাদি, এবং এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে ফুট/সেকেণ্ড, মাইল/ঘণ্টা ইত্যাদি।

ত্বরণ ও মন্দন

(Acceleration and Retardation)

কোন বস্তুর গতিবেগ যে সর্বদা একই থাকিবে তাহা না-ও হইতে পারে, নানা কারণে গতিবেগের পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। ধরা যাক, একটি ট্রেন স্টেশন ছাড়িয়া চলিতে শুরু করিয়াছে ; প্রথমে উহা অতি মন্থর গতিতে চলে, ক্রমে উহার গতি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অবশেষে সম-গতিবেগে চলিতে সুরু করে। এই অবস্থায় পৌছিবার পূর্বে প্রথম দিকে ট্রেনটি একক সময়ে যতটা

দূরত্ব যায়, পরের দিকে উহা একক সময়ে, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে তদপেক্ষা বেশী দূরত্ব অতিক্রম করে, অর্থাৎ ট্রেনটির গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

সংজ্ঞা ঃ কোন বস্তুর গতিবেগ পরিবর্তনের হার (rate)-কে বলা হয় ত্বরণ (acceleration) ঃ

ধরা যাক, কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে কোন একটি বস্তু u গতিবেগে চলমান রহিয়াছে এবং t সময় পরে উহার গতিবেগের মান বৃদ্ধি পাইয়া হইল v ; অতএব বস্তুটির গতিবেগের পরিবর্তন ঘটিতেছে $(v-u)$। সুতরাং, প্রতি একক সময়ে গতিবেগের পরিবর্তন হইতেছে $\frac{v-u}{t}$; ইহাকেই বলা হয় বস্তুটির ত্বরণ, f, অর্থাৎ উহার গতিবেগ পরিবর্তনের হার।

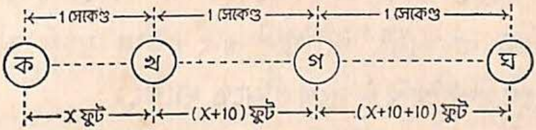
$$\therefore \; f=\frac{v-u}{t} \; ; \text{ অর্থাৎ, ত্বরণ} = \frac{\text{গতিবেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}$$

$$= \frac{\text{অন্তিম গতিবেগ—প্রাথমিক গতিবেগ}}{\text{সময়}}$$

গতিবেগের পরিবর্তন স্বভাবতঃই দুই প্রকার হইতে পারে ; গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পারে, আবার উহা ক্রমে হ্রাস পাইতেও পারে। **সাধারণতঃ কোন বস্তুর গতিবেগ-বৃদ্ধির হারকে বলা হয় ত্বরণ (acceleration) এবং গতিবেগ-হ্রাসের হারকে বলা হয় মন্দন (retardation)।** মন্দনকে 'ঋণাত্মক ত্বরণ' হিসাবেও গণ্য করা যাইতে পারে। গতিবেগের ন্যায় ত্বরণের (বা, মন্দনের) সুনির্দিষ্ট মান ও অভিমুখ উভয়ই থাকে। কোন বস্তুর ত্বরণ (বা, মন্দন)-এর উল্লেখ করিতে হইলে কেবল উহার মান নির্দেশ করাই যথেষ্ট নহে, ত্বরণ (বা, মন্দন) কোন্ দিকে ঘটিতেছে তাহাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ত্বরণের একক ঃ ত্বরণ হইল গতিবেগ পরিবর্তনের হার, অর্থাৎ গতিবেগের পরিবর্তনকে সময় দ্বারা ভাগ করিলে পাওয়া যায় ত্বরণ। যেহেতু সি. জি. এস. পদ্ধতিতে গতিবেগের একক হইল সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড ; অতএব এই পদ্ধতি অনুযায়ী ত্বরণের একক হইবে সেন্টিমিটার / (সেকেণ্ড × সেকেণ্ড) ; অর্থাৎ, সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড^2 ; ইহাকে ভাষায় বলা হয় 'সেন্টিমিটার, প্রতি সেকেণ্ডে, প্রতি সেকেণ্ডে' বা 'সেন্টিমিটার, প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে'। এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক হইল ফুট / সেকেণ্ড^2, অর্থাৎ 'ফুট, প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে'।

ত্বরণের এককে 'প্রতি সেকেণ্ডে' কথাটি দুই বার ব্যবহার করিবার কারণ হইল, এক বার ইহা প্রয়োজন হয় গতিবেগ বুঝাইবার জন্য এবং দ্বিতীয় বার



ত্বরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

প্রয়োজন হয় গতিবেগ পরিবর্তনের **হার** বুঝাইবার জন্য। যদি বলা হয়, কোন বস্তু প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে 10 ফুট ত্বরণ লইয়া চলিতেছে, তাহা হইলে বুঝা যায়, বস্তুটি কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে প্রতি সেকেণ্ডে যত ফুট অগ্রসর হয়, এক সেকেণ্ড পরে উহা প্রতি সেকেণ্ডে তদপেক্ষা 10 ফুট বেশী দূরত্ব অতিক্রম করে। প্রদত্ত চিত্র হইতে বিষয়টি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, মন্দনশীল কোন বস্তু প্রতি সেকেণ্ডে যে দূরত্ব অগ্রসর হয় তাহার মান উপরোক্ত-ভাবে সময়ের সহিত ক্রমে হ্রাস পায়।

নিউটনের গতিসূত্র

(Newton's Laws of Motion)

1687 খ্রীষ্টাব্দে স্বনামধন্য বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন (Sir Isaac Newton) তাঁহার 'প্রিন্সিপিয়া' (Principia) নামক একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থে গতির স্বরূপ, অর্থাৎ গতি কি, গতির উৎপত্তি ঘটে কি ভাবে, গতির বৃদ্ধি, বা হ্রাস ঘটে কিরূপে, বস্তুর গতি সম্বন্ধীয় এইরূপ বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। গতি-সংক্রান্ত যাবতীয় মূল তথ্যাদিকে নিউটন তিনটি সূত্রের আকারে উপস্থাপিত করেন, যাহা গতি-বিদ্যার (Kinetics) মূল ভিত্তি-রূপে পরিগণিত। নিম্নে এই সূত্র তিনটি সম্পর্কে যথোচিত আলোচনা করা হইল।



স্যার আইজ্যাক নিউটন (1642—1727)

নিউটনের প্রথম গতিসূত্র ঃ
(Newton's first law of motion)

বাহির হইতে কোন বল প্রয়োগ না করিলে কোন স্থির বস্তু চিরকাল স্থির অবস্থায়ই থাকিবে এবং কোন সচল বস্তু চিরকাল সম-গতিবেগে সরলরৈখিক পথে চলিতে থাকিবে।

নিউটনের এই প্রথম সূত্রটি হইতে বুঝা যায়, জড় পদার্থের অবস্থান পরিবর্তনের নিজস্ব কোন উদ্যোগ (initiative) নাই, অর্থাৎ উহার নিজস্ব অবস্থা বজায় রাখিবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে। অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য কোনরূপ বাহিক বল প্রযুক্ত না হইলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির অবস্থাতেই থাকে এবং সচল বস্তু যে-গতিবেগে যে-দিকে চলিতেছে সেই গতিবেগে সেই দিকেই চলিতে থাকিবে, উহার থামিবার কোনরূপ লক্ষণ দেখা যাইবে না। জড় বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে অবশ্যই কোনরূপ বাহিক ক্রিয়া প্রয়োজন ; ইহাকেই বলা হয় **বল** (force)।

সংজ্ঞা ঃ কোন স্থির বস্তুকে সচল করিতে, অথবা কোন সচল বস্তুর গতিবেগের পরিবর্তন ঘটাইতে যে বাহিক ক্রিয়া প্রয়োজন, তাহাকে বলা হয় 'বল' (force)।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে, বল প্রয়োগ ব্যতীত কোন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যদি সম্ভব না-ই হয়, তাহা হইলে লৌহ, বা প্রস্তর-নির্মিত একটি গোলক মেঝের উপরে গড়াইয়া দিলে উহার গতিবেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া অবশেষে কিছু দূর গিয়া উহা থামিয়া যায় কেন ? গোলকটিকে যে গতিবেগে গড়াইয়া দেওয়া হইল, প্রথম সূত্র অনুযায়ী উহার তো সেই গতিতেই চিরকাল গড়াইয়া চলা উচিত। ইহার কারণ, গোলকটি যে-দিকে অগ্রসর হয়, দৃশ্যতঃ মসৃণ হইলেও মেঝেটি গোলকটির উপরে উহার গতির বিপরীত-মুখী একটি ঘর্ষণ-জনিত বল প্রয়োগ করে এবং এই ঘর্ষণ-জনিত বাধার জন্যই গোলকটির গতিবেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া অবশেষে কিছু দূর গিয়া উহা স্থির হইয়া যায়। মেঝেটি যত বেশী মসৃণ হইবে, ঘর্ষণ-জনিত বাধা সেই অনুপাতে হ্রাস পাওয়ার ফলে গোলকটি তত অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিবে।

জড় বস্তুর একটি প্রধান ধর্ম হইল, উহা সর্বদাই নিজ অবস্থা বজায় রাখার

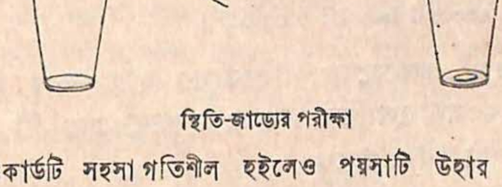
চেষ্টা করে ; কেবল মাত্র বল প্রয়োগ দ্বারাই উহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর। জড় বস্তুর এই ধর্মকে বলা হয় **জাড্য** (inertia)।

সংজ্ঞা : যে-কোন জড় বস্তুর নিজস্ব অবস্থা বজায় রাখিবার স্বাভাবিক প্রবণতাকে বলা হয় জাড্য (inertia)।

জাড্য স্বভাবতঃই দুই প্রকার : **স্থিতি-জাড্য** (inertia of rest) এবং **গতি-জাড্য** (inertia of motion)। কোনরূপ বাহিক সহায়তা ব্যতীত কোন স্থির, বা গতিশীল বস্তুর নিজস্ব স্থির, বা সচল অবস্থার পরিবর্তনের অক্ষমতাকে বলা হয় যথাক্রমে স্থিতি-জাড্য ও গতি-জাড্য।

স্থিতি জাড্যের উদাহরণ : (1) যাত্রীবাহী বাস হঠাৎ চলিতে শুরু করিলে যাত্রীদের দেহ পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়ে। ইহার কারণ, বাসটি থামিয়া থাকা অবস্থায় যাত্রীর দেহ স্থিতি-জাড্যে থাকে ; বাসটি সহসা গতিশীল হইলে আরোহীর দেহের নিম্নাংশে সর্বপ্রথম গতি সঞ্চারিত হয়, কিন্তু দেহের উর্ধ্বাংশের স্থিতি-জাড্য তত দ্রুত লোপ পায় না, অর্থাৎ দেহের উর্ধ্বভাগ স্থিতিশীল অবস্থাই বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। এইজন্যই আরোহীদের দেহ পিছনে হেলিয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

(2) একটি গ্লাসের মুখে একখানা শক্ত পোষ্টকার্ড চাপা দিয়া তাহার উপর একটি পয়সা রাখা হইল। এখন পোষ্টকার্ডটিকে সহসা অতি দ্রুত আঙুলের টোকা দিয়া আঘাত করিলে উহা দূরে ছিটকাইয়া যাইবে, কিন্তু দেখা যাইবে যে, পয়সাটি বাহিরে না পড়িয়া গ্লাসের মধ্যে পতিত হইল। ইহার

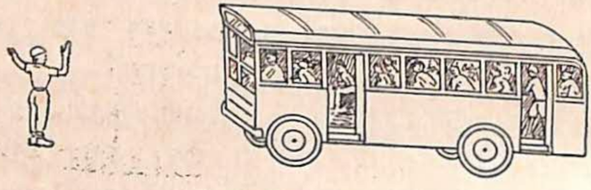


স্থিতি-জাড্যের পরীক্ষা

কারণ, পোষ্টকার্ডটি সহসা গতিশীল হইলেও পয়সাটি উহার স্থিতি-জাড্যের প্রভাবে স্ব-স্থানেই থাকিতে চেষ্টা করে এবং এই জন্যই উহা পোষ্টকার্ডখানার সঙ্গে বাহিরে ছিটকাইয়া না গিয়া গ্লাসের মধ্যে পতিত হয়।

গতি-জাড্যের উদাহরণ : (1) চলন্ত বাস যখন সহসা ব্রেক কষিয়া থামিয়া পড়ে, তখন অসাবধান যাত্রীর দেহ আকস্মিকভাবে সামনের দিকে

ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহার কারণ, চলন্ত বাসের যাত্রীর দেহ গতি-জাড্যে থাকে ; বাসটি সহসা থামিয়া পড়িলে যাত্রীর দেহের নিম্নাংশ প্রথমে স্থির অবস্থানে আসে, কিন্তু তখনও দেহের উর্ধ্বাংশ পূর্ববর্তী গতি-জাড্যের প্রভাবে উহার সম্মুখ-গতি বজায় রাখিতে চেষ্টা করে ; এই কারণেই আরোহীর দেহ সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।



গতি-জাড্যের দৃষ্টান্ত

(2) চলন্ত ট্রেনের কামরায় একটি বলকে উঁচুতে ছুঁড়িয়া দিলে উহা আবার ঠিক যাত্রীর হাতেই ফিরিয়া আসে, যদিও ট্রেনের গতির দরুণ আরোহী ইতিমধ্যে অবশ্যই কিছুদূর আগাইয়া গিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি কিছুটা বিস্ময়কর মনে হইলেও ইহার ব্যাখ্যা অতি সহজ। বল ছুঁড়িবার পর আরোহী ট্রেনের সহিত আগাইয়া যায় সত্য, কিন্তু বলটি গতি-জাড্যের দরুণ উহা হাতের উর্ধ্বে থাকিবার সময় নিজেও আরোহীর সহিত সম-বেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় এবং এই কারণেই উহা আবার ঠিক আরোহীর হাতেই ফিরিয়া আসে।

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র :

(Newton's second law of motion)

কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার উহার উপর প্রযুক্ত বাহ্যিক বলের সমানুপাতিক হয় এবং ভরবেগের পরিবর্তন প্রযুক্ত বলের অভিমুখী হইয়া থাকে।

এই সূত্রটির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ভরবেগ (momentum) কাহাকে বলে তাহা সর্বপ্রথমে বুঝা প্রয়োজন। **যে-কোন চলমান বস্তুর ভর ও গতিবেগের গুণফলকে বলা হয় বস্তুটির ভরবেগ** (momentum)। যদি কোন বস্তুর ভর হয় m এবং গতিবেগ v, তাহা

হইলে উহার ভরবেগ হইবে mv। বস্তুর ভরবেগ সর্বদা কোন নির্দিষ্ট দিকে ক্রিয়া করে ; বস্তুর গতিবেগ যে-দিকে, ভরবেগের অভিমুখও সেই দিকে হইবে। ভরবেগ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাশি এই কারণে যে, উহা বস্তুর গতি-জাড্যের পরিমাপ (measure) প্রকাশ করে। কোন সচল বস্তুর গতিশীল অবস্থাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করিতে হইলে কেবল উহার গতিবেগের উল্লেখ করাই যথেষ্ট নহে, বস্তুটির ভরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোন বস্তুর ভর ও গতিবেগ উভয়েরই মান জানা থাকিলে তবেই উহার গতির পরিমাণ (quantity of motion) সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়।

নিউটনের প্রথম গতিসূত্র হইতে 'বল' কাহাকে বলে তাহা বুঝা যায় এবং দ্বিতীয় সূত্রটি হইতে বলের পরিমাপ পাওয়া যায়।

বলের পরিমাপ ও $P=mf$ সমীকরণ : ধরা যাক, u গতিবেগে চলমান m ভরবিশিষ্ট কোন বস্তুর উপর P বল প্রয়োগ করা হইতেছে। প্রথম সূত্র হইতে আমরা জানি, কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিলে বস্তুর গতীয় অবস্থার (state of motion) পরিবর্তন ঘটে ; সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুটির গতিবেগের পরিবর্তন ঘটিবে, অর্থাৎ ত্বরণ, বা মন্দনের উৎপত্তি হইবে (যদি প্রযুক্ত বল বস্তুটির গতির অভিমুখী হয়, তাহা হইলে ত্বরণ ঘটিবে, এবং প্রযুক্ত বল ও বস্তুর গতির অভিমুখ যদি পরস্পর বিপরীত হয়, তাহা হইলে বস্তুটির গতি মন্দীভূত হইবে)। মনে করা যাক, এই ক্ষেত্রে বস্তুটির ত্বরণ ঘটিতেছে, অর্থাৎ গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন ধরা যাক, t সময় পরে বস্তুটির গতিবেগ হইল v এবং বস্তুটির ত্বরণ হইল f ; অতএব, বস্তুটির

প্রাথমিক ভরবেগ $=mu$ এবং অন্তিম ভরবেগ $=mv$

সুতরাং ভরবেগের পরিবর্তন $=mv-mu$; ভরবেগের এই পরিবর্তন ঘটিতেছে t সময়ে। অতএব, প্রতি একক সময়ে উহার ভরবেগের পরিবর্তন, অর্থাৎ, ভরবেগের পরিবর্তনের হার

$$=\frac{mv-mu}{t}=m\times\frac{v-u}{t}=mf$$

$$\left(\text{যেহেতু, ত্বরণ, } f=\frac{\text{গতিবেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}=\frac{v-u}{t}\right)$$

এখন, দ্বিতীয় গতিসূত্র হইতে আমরা জানি, কোন বস্তুর উপরে প্রযুক্ত বল উহার ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সহিত সমানুপাতিক হয়, অর্থাৎ

$$P\propto mf$$

অর্থাৎ, $P = K.\, mf$ [K একটি ধ্রুবক রাশি (constant)]

এখন, যদি ধরিয়া লওয়া হয়, যে-বল একক ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া একক ত্বরণ সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাহাই হইল বলের একক ; অর্থাৎ যখন $m = 1$ ও $f = 1$, তখন $P = 1$; তাহা হইলে উপরোক্ত সমীকরণ হইতে দেখা যায়, $K = 1$; সুতরাং, এই পদ্ধতিতে আমরা লিখিতে পারি :

$$P = mf$$

অর্থাৎ, **বল = ভর × ত্বরণ**

অতএব, কোন বস্তুর ভরকে উহার ত্বরণ দ্বারা গুণ করিলে বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের পরিমাপ পাওয়া যাইবে। এই সমীকরণটিই দ্বিতীয় গতিসূত্রের গাণিতিক রূপ।

বলের একক (Unit of force) :

(i) **সি. জি. এস. পদ্ধতি :** যে-বল এক গ্র্যাম ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক সে. মি. (1 cm./sec.^{2}) ত্বরণ সৃষ্টি করে, তাহাকে বলা হয় এক **ডাইন** (dyne) ; 1 ডাইন = 1 গ্র্যাম × 1 সে. মি. / সেকেণ্ড^2।

ডাইন অপেক্ষা বৃহত্তর একক প্রয়োজন হইলে 'নিউটন' (Newton) একক ব্যবহার করা হয়। যে-বল এক কিলোগ্র্যাম ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক মিটার (1 metre/sec ^{2}) ত্বরণ সৃষ্টি করে, তাহাকে বলা হয় এক **নিউটন** (Newton) ; 1 নিউটন = 1 কিলোগ্র্যাম × 1 মিটার/সেকেণ্ড^2।

(ii) **এফ. পি. এস. পদ্ধতি :** যে-বল এক পাউণ্ড ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক ফুট (1 ft. / sec.^{2}) ত্বরণ সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাহাকে বলা হয় এক **পাউণ্ডাল** (poundal) ; 1 পাউণ্ডাল = 1 পাউণ্ড × 1 ফুট / সেকেণ্ড^2।

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র :

(Newton's third law of motion)

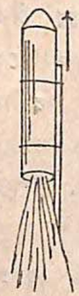
প্রত্যেক ক্রিয়ারই (action) একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া (reaction) থাকে।

ক্রিকেট খেলার সময় লক্ষ্য করা যায়, ব্যাট দ্বারা বলকে আঘাত করিলে কেবল যে বলটিই আঘাতের অভিমুখে সজোরে অগ্রসর হইয়া

যায় তাহাই নহে, ব্যাটখানাও বলটির ধাক্কা খাইয়া কিছুটা পশ্চাদ্দিকে সরিয়া আসে এবং খেলোয়াড় সেই প্রত্যাঘাত অনুভব করে। সাধারণভাবে মনে হইতে পারে, ব্যাট দ্বারা বলটি আঘাত করিবার ফলে কেবল বলটিরই তো আগাইয়া যাওয়া উচিত, ব্যাটখানা পিছাইয়া আসিবে কেন? ইহার প্রকৃত কারণ হইল, খেলোয়াড়ের পেশী-শক্তিতে ব্যাটখানা বলটির উপরে যে 'বল' (force) প্রয়োগ করে, সঙ্গে-সঙ্গে বলটিও ব্যাটের উপরে ঠিক তাহার সমান ও বিপরীতমুখী একটি বল (force) প্রয়োগ করে। প্রথমটিকে যদি বলা হয় **ক্রিয়া** (action), তাহা হইলে সমান ও বিপরীতমুখী দ্বিতীয় বল-কে বলা হইবে **প্রতিক্রিয়া** (reaction)। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যাটখানা পশ্চাদ্দিকে ধাক্কা খায় এবং খেলোয়াড় তাহা অনুভব করে। নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রটির গুরুত্ব এই কারণে যে, বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা সর্বদাই লক্ষ্য করি, যে-কোন ক্রিয়ার ফলেই তাহার সমান ও বিপরীতমুখী একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে। অবশ্য ক্রিয়া না থাকিলে প্রতিক্রিয়ারও কোন অস্তিত্ব থাকে না, অর্থাৎ ক্রিয়ার স্থায়িত্ব যতক্ষণ, প্রতিক্রিয়ার স্থায়িত্বও ততক্ষণ ; ক্রিয়া লোপ পাইলে প্রতিক্রিয়াও লোপ পায়।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি বিষয় বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কোন বস্তু অপর কোন বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করিলে দ্বিতীয় বস্তুটিও প্রথম বস্তুটির উপর উহার সমান ও বিপরীতমুখী একটি বল প্রয়োগ করিবে, অর্থাৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সর্বদাই সমান। কিন্তু ইহা হইতে একটি বিষয় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, **ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একই বস্তুর উপরে প্রযুক্ত হয় না** ; ক্রিয়া-বল (force of action) দ্বিতীয় বস্তুটির উপর এবং প্রতিক্রিয়া-বল (force of reaction) প্রথম বস্তুটির উপর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান হইলেও বস্তু দুইটির ভর যদি অ-সমান হয়, তাহা হইলে উহাদের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার প্রভাব সমান না-ও হইতে পারে। উপরে ব্যাট ও বলের যে-দৃষ্টান্তটি আলোচনা করা হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে। ব্যাট ও বল উভয়েই উভয়ের উপর সমান বল প্রয়োগ করে ; কিন্তু ব্যাট অপেক্ষা বলের ভর অনেক কম বলিয়াই উহার ক্ষেত্রে অনেক বেশী ত্বরণ ঘটে। ইহার ফলে নিক্ষিপ্ত বলটি ব্যাটের আঘাতে বিপরীত দিকে সজোরে ছুটিয়া যায় ; কিন্তু তজ্জনিত প্রতিক্রিয়ায় ব্যাটটি ধাক্কা খাইয়া সামান্য মাত্র পশ্চাদ্দিকে সরিয়া আসে।

তৃতীয় সূত্রের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ (1) বন্দুক হইতে গুলী নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বন্দুকটি ধাক্কা খাইয়া কিছুটা পিছনের দিকে সরিয়া আসে, বন্দুক-চালক তাহা অনুভব করে। ইহার কারণ, বন্দুক হইতে গুলীটি সজোরে সম্মুখ দিকে নিক্ষিপ্ত হয়,—ইহা ক্রিয়া ; ইহার ফলে গুলীটি বন্দুকের উপরে যে সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া-বল প্রয়োগ করে তাহার জন্যই বন্দুকটি পিছনের দিকে ধাক্কা দেয়।



হাউইয়ের উর্ধ্ব গতি

(2) রকেট, বা হাউই-বাজীর অতিদ্রুত উর্ধ্বগতির ক্রিয়া বিশেষ প্রতিক্রিয়া-বলের জন্যই সম্ভব হইয়া থাকে। রকেট, বা হাউইয়ে যে জ্বালানী থাকে তাহার দ্রুত দহনের ফলে উহার খোলের অভ্যন্তরে অতি উচ্চ-চাপবিশিষ্ট গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস একটি সরু নল-মুখ দিয়া সজোরে নীচের দিকে নির্গত হয় এবং এই ক্রিয়ার ফলে রকেট, বা হাউইয়ের উপর যে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া-বল সৃষ্টি হয় তাহার জন্যই উহা সজোরে উপরে উঠিতে থাকে।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্য, শক্তি ও ক্ষমতা
(Work, Energy and Power)

পাঠ্যসূচী : কার্য, ক্ষমতা, শক্তি ; স্থিতিশক্তি, গতিশক্তি ;
সরল যন্ত্র—আনত তল, চক্র ও অক্ষদণ্ড, লিভার।

কার্য (Work)

দৈনন্দিন জীবনে কার্যের বহু বিভিন্ন উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। আমরা যখন হাঁটি-চলি, অথবা কোন ভারী বস্তুকে ঠেলিয়া দূরে সরাই, বাল্‌তি করিয়া জল তুলি, প্রতি ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু-না-কিছু পরিমাণ কার্য সম্পন্ন করা হয়। বল প্রয়োগ এবং তজ্জনিত কিছু শক্তি ব্যয় না করিয়া কোন কার্যই সম্পন্ন করা যায় না ; এই কারণেই সাধারণতঃ যে-কোন কার্য করিবার ফলে আমরা ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করি। যে শারীরিক ক্রিয়ায় লিপ্ত হইবার ফলে আমাদের দৈহিক ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ হয়, সাধারণভাবে তাহাকেই আমরা 'কার্য' বলি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে কার্য কথাটির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্ন অর্থ, বা বৈশিষ্ট্য আছে।

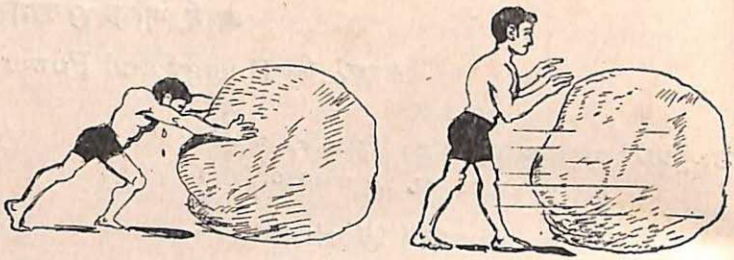


কুয়া থেকে জল তোলা (কার্যের উদাহরণ)

সংজ্ঞা : কোন বস্তুর উপরে বল প্রয়োগের ফলে যদি বস্তুটির স্থানচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে উহার উপর 'কার্য' করা হইল বলা হয়। প্রযুক্ত বল ও বস্তুর স্থানচ্যুতির গুণফল হইল কৃত কার্যের পরিমাপ, অর্থাৎ, কার্য = বল × বস্তুর স্থানচ্যুতি।

উপরোক্ত সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায়, বল প্রয়োগ করিয়া কোন বস্তুর স্থানচ্যুতি ঘটাইতে পারিলে তবেই বলা যাইতে পারে, 'কার্য' সম্পন্ন হইল। কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল যত বেশীই হউক না কেন, বস্তুটির সরণ, বা স্থানচ্যুতি না

ঘটিলে কোন কার্য করা হইল বলা যায় না। ধরা যাক, কোন ব্যক্তি একটি ভারী পাথরকে ঠেলিয়া সরাইবার চেষ্টা করিতেছে। যত বলই প্রয়োগ করা হউক না কেন, যতক্ষণ না পাথরটি স্থানচ্যুত হইতেছে ততক্ষণ কোনরূপ কার্য করা



পাথর ঠেলিয়া সরানো (কার্যের উদাহরণ)

হইল বলা যায় না। যদি সে পাথরটি সরাইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বলা যাইবে, লোকটি 'কার্য' সম্পন্ন করিয়াছে, এবং সেই কৃত কার্যের পরিমাণ হইল, যে-বল প্রয়োগে সে পাথরটিকে সরাইতে সক্ষম হইয়াছে তাহার সহিত পাথরটি যে-দূরত্ব সরিল তাহার গুণফলের সমান।

কার্যের একক (Unit of Work) :

(i) **সি. জি. এস. পদ্ধতি :** কোন বস্তুর উপরে এক ডাইন বল প্রয়োগ করিলে যদি উহা বলের অভিমুখে এক সেন্টিমিটার সরিয়া যায়, তাহা হইলে কৃত কার্যের পরিমাণকে বলা হয় এক **আর্গ** (erg) ; 1 আর্গ = 1 ডাইন × 1 সেন্টিমিটার।

আর্গ এককটি খুব ছোট হওয়ায় অনেক সময় ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর কোন একক ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ **জুল** (Joule) নামক একটি একক ব্যবহার করা হয় ; 1 জুল = 10^7 আর্গ।

(ii) **এফ. পি. এস. পদ্ধতি :** কোন বস্তুর উপরে এক পাউণ্ডাল বল প্রয়োগ করিলে যদি উহা বলের অভিমুখে এক ফুট সরিয়া যায়, তাহা হইলে কৃত কার্যের পরিমাণকে বলা হয় এক **ফুট-পাউণ্ডাল** (foot-poundal) ; 1 ফুট-পাউণ্ডাল = 1 পাউণ্ডাল × 1 ফুট।

(iii) **অভিকর্ষজ পদ্ধতি** (Gravitational System) :

এক গ্র্যাম ভর-বিশিষ্ট কোন বস্তুকে লম্বভাবে এক সেন্টিমিটার উপরে তুলিতে যে পরিমাণ কার্য সম্পন্ন হয়, তাহাকে বলে এক **গ্র্যাম-সেন্টিমিটার**

(gram-centimetre)। অনুরূপভাবে, এক পাউণ্ড ভর-বিশিষ্ট কোন বস্তুকে লম্বভাবে এক ফুট উপরে তুলিতে যে পরিমাণ কার্য সম্পন্ন হয়, তাহাকে বলে এক **ফুট-পাউণ্ড** (foot-pound)।

ফুট-পাউণ্ড ও ফুট-পাউণ্ডালের সম্পর্ক :

আমরা জানি, যে-কোন বস্তুকেই পৃথিবী তাহার কেন্দ্র অভিমুখে আকর্ষণ করে ; বস্তুর উপর পৃথিবীর এই নিম্নমুখী আকর্ষণ-বলকেই বলা হয় বস্তুর ওজন (weight)। কোন বস্তুকে মাটি হইতে উপরে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে বস্তুটির ওজন-জনিত এই নিম্নমুখী বলের জন্যই উহা ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। লক্ষ্য করা যায়, যে-কোন পতনশীল বস্তুর গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; অর্থাৎ বস্তুটির ত্বরণ ঘটে। পতনশীল সকল বস্তুরই এই ত্বরণের মান সমান ; ইহাকে বলা হয় **অভিকর্ষজ ত্বরণ** (acceleration due to gravity)। ইহার চিহ্ন হইল g ; g = 32 ফুট/সেকেণ্ড^2 = 980 সেণ্টিমিটার/সেকেণ্ড^2। এখন, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র হইতে আমরা জানি, বল = ভর × ত্বরণ ; সুতরাং, কোন বস্তুর ভর যদি m হয়, তাহা হইলে উহার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ-বল, অর্থাৎ বস্তুটির ওজন হইবে mg।

কোন বস্তুকে লম্বভাবে উপরে তুলিতে উহার ওজন-জনিত এই নিম্নমুখী বলের বিরুদ্ধে কার্য করিতে হয়। সুতরাং,

1 ফুট-পাউণ্ড = 1 পাউণ্ড ভর-বিশিষ্ট বস্তুর ওজন × 1 ফুট
= 1 পাউণ্ড × 32 ফুট/সেকেণ্ড^2 × 1 ফুট
= 32 পাউণ্ডাল × 1 ফুট = 32 ফুট-পাউণ্ডাল।

ক্ষমতা (Power)

একই কার্য কেহ দ্রুত সম্পন্ন করিতে পারে, আবার কাহারও সময় বেশী লাগে ; আমরা বলি, এক জনের কর্ম-ক্ষমতা অধিক, অপরের কম। ধরা যাক, দুই জন লোক একই দূরত্ব দৌড়াইতেছে। যাহার দৌড়াইবার ক্ষমতা বেশী সে এই পথ কম সময়ে অতিক্রম করিবে এবং যাহার ক্ষমতা কম তাহার ক্ষেত্রে অবশ্যই বেশী সময় লাগিবে। দুই জনেই মোট যে পরিমাণ কার্য করিতেছে তাহার মান সমান ; কিন্তু যাহার ক্ষমতা বেশী সে কম সময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ কার্য (এই ক্ষেত্রে দূরত্ব অতিক্রম) করিতে সক্ষম

হয়। সুতরাং, কোন কার্য সম্পাদন-কালে মোট কি পরিমাণ কার্য করা হইল তাহাই একমাত্র বিচার্য বিষয় নহে, ঐ কার্য করিতে কত সময় লাগিল তাহাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে যত বেশী কার্য করিতে পারে, আমরা বলি তাহার কর্ম-ক্ষমতা তত বেশী। প্রতি একক সময়ে কৃত কার্যের পরিমাণ, অর্থাৎ কার্যের হার (rate of doing work) উল্লেখ করিয়া ক্ষমতার (power) পরিমাপ নির্ণয় করা হয়।

সংজ্ঞা ঃ কার্য করিবার হারকে বলা হয় ক্ষমতা (Power)।

যদি t সময়ে w পরিমাণ কার্য করা হয়, তাহা হইলে প্রতি একক সময়ে কৃত কার্যের মান হইল w / t ; ইহাই কার্য নিষ্পন্ন করিবার হার, অর্থাৎ ক্ষমতা (power)। সুতরাং, ক্ষমতা (P) = কৃত কার্য (w) / সময় (t)।

ক্ষমতার একক (Unit of Power) ঃ

(i) **সি. জি. এস. পদ্ধতি ঃ** প্রতি সেকেণ্ডে এক জুল (Joule) পরিমাণ কার্য করা হইলে ক্ষমতার সেই পরিমাণকে বলা হয় এক **ওয়াট** (Watt); 1 ওয়াট = 1 জুল / সেকেণ্ড = 10^7 আর্গ / সেকেণ্ড।

ওয়াট অপেক্ষা বৃহত্তর একক প্রয়োজন হইলে অনেক সময় **কিলোওয়াট** (Kilowatt) ব্যবহার করা হয় ; 1 কিলোওয়াট = 1000 ওয়াট।

(ii) **এফ. পি. এস. পদ্ধতি ঃ** প্রতি সেকেণ্ডে যদি 550 ফুট-পাউণ্ড পরিমাণ কার্য করা হয়, তাহা হইলে ক্ষমতার সেই পরিমাণকে বলে এক **অশ্ব-ক্ষমতা** (Horse-power) ; 1 অশ্ব-ক্ষমতা = 550 ফুট-পাউণ্ড/সেকেণ্ড।

1 অশ্ব-ক্ষমতা = (প্রায়) 746 ওয়াট।

শক্তি (Energy)

যে-কোন কার্য সম্পন্ন করিতে কিছু-না-কিছু শক্তি প্রয়োজন হয়। কুয়া হইতে বাল্‌তি করিয়া জল তুলিতে, অথবা কোন ভারী বস্তুকে ঠেলিয়া সরাইবার সময় কিছু পরিমাণ শক্তি ব্যয় করিতে হয় বলিয়াই আমরা দৈহিক ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ করি। মানুষই হউক, বা কোন যন্ত্রই হউক, যাহাই কোন কার্য করিতে সক্ষম তাহারই কিছু শক্তি, অর্থাৎ কার্য করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। শক্তি ব্যয় না করিলে কোন কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

সংজ্ঞা : কার্য করিবার সামর্থ্যকে বলা হয় শক্তি (Energy)।

কোন মানুষ, বা কোন যন্ত্র যে পরিমাণ কার্য করিতে সক্ষম তাহাই হইল উহার শক্তির পরিমাপ। যে যত বেশী কার্য করিতে পারে তাহার শক্তি তত বেশী। কার্য ও শক্তি একই এককে প্রকাশ করা হইয়া থাকে, যথা—আর্গ, জুল, ফুট-পাউণ্ডাল, ফুট-পাউণ্ড ইত্যাদি।

শক্তি প্রধানতঃ সাত প্রকার ; যেমন—যান্ত্রিক শক্তি (mechanical energy), তাপ-শক্তি (heat energy), আলোক-শক্তি (light energy), শব্দ-শক্তি (sound energy), তড়িৎ-শক্তি (electrical energy), রাসায়নিক শক্তি (chemical energy) ও চৌম্বক শক্তি (magnetic energy)।

আবার, যান্ত্রিক শক্তি বস্তুতঃ দুই প্রকার, যথা—**গতিশক্তি** (kinetic energy) ও **স্থিতিশক্তি** (potential energy)। পাঠ্যসূচী অনুসারে এই দুই প্রকার যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল।

গতিশক্তি (Kinetic Energy)

সংজ্ঞা : কোন গতিশীল বস্তু উহার গতির দরুণ যে শক্তি অর্জন করে তাহাকে বলা হয় গতিশক্তি (Kinetic Energy)।

চলমান বস্তু মাত্রেরই কিছু কার্য (work) করিবার সামর্থ্য, বা শক্তি (power) থাকে। এই শক্তি বস্তুটি লাভ করে তাহার গতির ফল-স্বরূপ ; এইজন্যই ইহাকে বলা হয় গতিশক্তি। কয়েকটি উদাহরণ আলোচনা করিলে বিষয়টি সহজেই বুঝা যাইবে। চলন্ত রোলারের সামনে কোন জিনিস পড়িলে রোলারটি উহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়, অথবা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, অর্থাৎ রোলারটি কিছু কার্য করিতে পারে। কিন্তু রোলারটির অচল অবস্থায় বস্তুটিকে উহার সংস্পর্শে রাখিলে রোলারটি এইরূপ কোন কার্য করিতে পারে না। সুতরাং গতিশীল অবস্থায় রোলারটি কার্য করিবার এই যে শক্তি লাভ করে তাহার মূল উৎসই হইল উহার গতি। কোন চলমান বস্তুতে গতি-জনিত যে শক্তি অর্জিত হয় সেই শক্তিকে বলা হয় গতিশক্তি।

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে স্বাভাবিক পরিবহনের অসুবিধা-হেতু বড়-বড় গাছের গুঁড়িকে অনেক সময় তীব্র খরস্রোতা পাহাড়ী নদীতে ভাসাইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করা হয়। গাছের গুঁড়িকে এইভাবে স্থানান্তরিত করিতে অবশ্যই কিছু কার্য নিষ্পন্ন করিতে হয়। নদীর জল গতিশীল বলিয়া

উহা যথেষ্ট গতিশক্তি লাভ করে এবং এই গতিশক্তির ফলেই নদীর জল নুড়িগুলির পরিবহনের কার্য করিতে সক্ষম হয়।

গতিশক্তির পরিমাপ : v গতিবেগে চলমান m ভরবিশিষ্ট কোন বস্তুর গতিশক্তির পরিমাপ হইল $\frac{1}{2} \times mv^2$; অর্থাৎ

$$\text{গতিশক্তি} = \frac{1}{2}\ \text{ভর} \times (\text{গতিবেগ})^2$$

স্থিতিশক্তি (Potential Energy)

সংজ্ঞা : কোন বস্তুকে উহার স্বাভাবিক অবস্থা (standard state) হইতে বিচ্যুত করিয়া অন্য কোন অবস্থায় আনিলে বস্তুটির এই অবস্থা-পরিবর্তনের জন্য উহাতে কিছু পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকে ; এই শক্তিকে বলা হয় বস্তুটির স্থিতিশক্তি (Potential energy)।

প্রত্যেক বস্তুরই কোন একটি অবস্থায় থাকার একটি সহজাত ও স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে ; ইহাকেই বলা হয় বস্তুটির স্বাভাবিক অবস্থা। যেমন, নদীর জল উচ্চ-তলে অবস্থিত উৎসমুখ হইতে নির্গত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে আসিয়া মিশিতে চায় ; নিম্ন-তলস্থিত সমুদ্রই জলের স্বাভাবিক অবস্থান। একটি স্প্রিংকে গুটাইয়া সংকুচিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা পুনরায় প্রাথমিক শিথিল অবস্থায় ফিরিয়া আসে ; কারণ, উহাই স্প্রিংটির স্বাভাবিক অবস্থা। যে-কোন বস্তুকে উহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত করিয়া অন্য কোন অবস্থায় আনিলে উহা সুযোগ পাইলেই পুনরায় উহার স্বভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে এবং এইরূপ পরিবর্তনকালে উহা কিছু পরিমাণ বাহ্যিক কার্য নিষ্পন্ন করিতে পারে। বস্তুটি কার্য করিবার এই শক্তি লাভ করে তাহার স্বাভাবিক অবস্থান, বা স্থিতির পরিবর্তনের ফলে। এই শক্তিকে বলা হয় বস্তুর স্থিতিশক্তি।

দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলাম যখন স্থিরভাবে ঝুলিতে থাকে তখন উহা দোলে না। কিন্তু উহাকে যে-কোন দিকে সরাইয়া লইয়া ছাড়িয়া দিলে উহা ক্রমাগত দুলিতে থাকে। দোদুল্যমান অবস্থায় পেণ্ডুলামটি অবশ্যই কিছু পরিমাণ কার্য নিষ্পন্ন করে ; কিন্তু পেণ্ডুলামটি এই কার্য করিবার প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে কিরূপে ? প্রকৃতপক্ষে পেণ্ডুলামটিকে উহার স্বাভাবিক অবস্থান হইতে বিচ্যুত করিবার ফলে উহা কিছু পরিমাণ স্থিতিশক্তি লাভ করে এবং তাহার প্রভাবেই পেণ্ডুলামটি এইরূপ দোলন-কার্য করিতে সক্ষম হয়।

একটি বলকে মসৃণ পাহাড়ের উপর তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া গড়াইয়া নীচে নামে। বলটি এইভাবে গড়াইয়া পড়িয়া অবশ্যই কিছু কার্য সম্পন্ন করে। বলটি এই কার্য করিবার প্রয়োজনীয় শক্তি লাভ করে উহাকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উপরে তুলিবার ফলে; কারণ, ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থানই যে-কোন পার্থিব বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা, এবং এই অবস্থা হইতে বিচ্যুত করিবার ফলে বলটিতে কিছু পরিমাণ স্থিতিশক্তি সঞ্চিত হয়, যাহার প্রভাবে বলটি শক্তি সঞ্চয় করিয়া কার্য করিতে সক্ষম হয়।

স্থিতিশক্তির পরিমাপ ঃ m ভর বিশিষ্ট কোন বস্তু ভূ-পৃষ্ঠ হইতে h উচ্চতায় অবস্থান করিলে উহাতে যে স্থিতিশক্তি সঞ্চিত হয়, তাহার পরিমাপ হইল $m.\ g.\ h.$; অর্থাৎ

স্থিতিশক্তি = ভর × অভিকর্ষজ ত্বরণ × উচ্চতা

বিভিন্ন প্রকার সরল যন্ত্র
(Different types of Simple Machines)

যে-কোন কার্য করিতে অবশ্যই কম-বেশী কিছু-না-কিছু বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং এই জন্যই বল প্রয়োগ না করিলে কোন কার্য করাই সম্ভব হয় না। যে কার্যের বাধা যত বেশী সেই কার্য করিতে তত বেশী বল প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয় এবং কার্যটি তত বেশী কঠিন বলিয়া মনে হয়। কোন কঠিন কার্য নিষ্পন্ন করা আমাদের দৈহিক শক্তিতে সম্ভব না হইলে আমরা বিভিন্নরূপ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করি, যাহার উদ্দেশ্য হইল অল্প পরিশ্রমে কম বল প্রয়োগ করিয়া কোন কঠিন কার্যকে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করা।

সংজ্ঞা ঃ যে-সকল ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্প বল প্রয়োগ করিয়া অধিকতর বাধা অতিক্রম করা যায় এবং অনায়াসে কঠিন কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, তাহাদের বলা হয় যন্ত্র (machines)।

ধরা যাক, কোন যন্ত্রে P বল প্রয়োগ করিয়া W পরিমাণ বাধা অতিক্রম করা হইতেছে। W-র তুলনায় P-এর মান যত কম হইবে, অর্থাৎ যত কম বল প্রয়োগে বাধাটি অতিক্রম করা যাইবে, যন্ত্রটির ব্যবহার অবশ্যই তত বেশী সুবিধাজনক হইবে, অর্থাৎ কার্যটি যন্ত্রের সাহায্যে তত বেশী সহজে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হইবে। সুতরাং, কোন যন্ত্র হইতে কতটা সুবিধা পাওয়া যাইতেছে, W / P অনুপাতটির মান তাহার পরিমাপ নির্দেশ করে। **কোন যন্ত্র হইতে**

যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহাকে বলা হয় **যান্ত্রিক সুবিধা (mechanical advantage)** এবং উহার মান **অতিক্রান্ত বাধা ও প্রযুক্ত বলের অনুপাতের সমান** ; অর্থাৎ—

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{অতিক্রান্ত বাধা}}{\text{প্রযুক্ত বল}} = \frac{W}{P}$$

পাঠ্যসূচী অনুযায়ী নির্দিষ্ট কয়েকটি সরল যন্ত্র সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। ইহা হইতে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও যান্ত্রিক সুবিধা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা যাইবে।

(ক) আনত তল (Inclined Plane) :

কাঠের একটি মসৃণ পাটাতন, বা ঐরূপ কোন সমতল ও প্রশস্ত পাতকে যদি ভূমি-তলের সহিত কোন একটি কোণে (angle) হেলানো অবস্থায় রাখা হয়, তাহা হইলে উহার তলকে বলা হয় **আনত তল (inclined plane)**।

এইরূপ আনত তলের সরল যান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক কঠিন কাজ সহজে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয়। লরী, মালগাড়ি, ষ্টীমার ইত্যাদিতে ভারী মাল উঠা-নামা করানোর জন্য অনেক সময় কাঠের একটি প্রশস্ত পাটাতন হেলানোভাবে

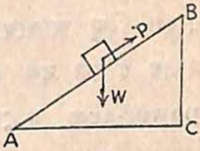


আনত তলের সাহায্যে সহজে মাল তোলা

স্থাপন করিয়া তাহার উপর দিয়া ভারী মালপত্র গড়াইয়া উপরে তোলা, বা নীচে নামানো হয়। এইরূপ আনত তল ব্যবহারের ফলে ভারী মালপত্র উঠা-নামা করাইতে কম পরিশ্রম করিতে হয়। আমাদের দেশের পুরী, ভুবনেশ্বর, বা কোনারকের মন্দির, অথবা মিশরের সুউচ্চ পিরামিডগুলি নির্মাণের সময় যথেষ্ট ভারী প্রস্তরাদি ও মাল-মশলা অত উঁচুতে তোলা সম্ভব হইল কি করিয়া, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয় ; কারণ, তৎকালে ক্রেন (crane), বা কপিকল (pulley) যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। অনেকের ধারণা, আনত তলের

সাহায্যে প্রকাণ্ড ভারী-ভারী পাথরের চাঁই অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক লোকের মোট কম পরিশ্রমে গড়াইয়া উপরে তোলা হইত।

আনত তলের সাহায্যে কার্য করিতে কেন সুবিধা হয় তাহা অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ধরা যাক, AB একটি আনত তল। এই তলের সহিত সমান্তরালভাবে P বল প্রয়োগ করিয়া W ওজনের একটি বস্তুকে গড়াইয়া A বিন্দু হইতে B বিন্দুতে তোলা হইল। যেহেতু কার্য = বল × বস্তুর স্থানচ্যুতি, অতএব এই ক্ষেত্রে



আনত তলের কার্যকারিতা

$$\text{কার্যের পরিমাণ} = P \times AB$$

বস্তুটিকে এইভাবে আনত তলের সাহায্যে না তুলিয়া উহাকে C বিন্দু হইতে সরাসরি লম্বভাবেও B বিন্দুতে তোলা যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে

$$\text{কার্যের পরিমাণ} = W \times BC$$

উভয় ক্ষেত্রেই যেহেতু একই বস্তুকে একই উচ্চতায় তোলা হইতেছে, অতএব দুই ক্ষেত্রেই কার্যের পরিমাণ সমান হইতে হইবে। অতএব,

$$P \times AB = W \times BC$$

$$\therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{AB}{BC}$$

যেহেতু BC অপেক্ষা AB বৃহত্তর, অতএব বুঝা যাইতেছে, যান্ত্রিক সুবিধার মান 1 অপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ প্রযুক্ত বল P বস্তুটির ওজন W অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। ইহার অর্থ, বস্তুটিকে খাড়াভাবে সরাসরি উপরে তুলিতে হইলে উহার নিম্নাভিমুখী ওজন-বলের সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করিতে হইত; কিন্তু আনত তল ব্যবহারের ফলে ইহা অপেক্ষা কম বল প্রয়োগ করিয়াই এই একই উদ্দেশ্য, বা কার্য সাধিত হয়। BC-র তুলনায় AB-র দৈর্ঘ্য যত বেশী হইবে, অর্থাৎ আনত তলটি যত অধিক হেলাইয়া রাখা হইবে, উহা হইতে তত বেশী যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ আনত তলের কৌণিক অবস্থান যত হেলানো হইবে বস্তুকে অপেক্ষাকৃত তত সহজে উপরে তোলা যাইবে।

(খ) লিভার (Lever):

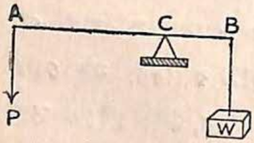
কোন ঋজু, বা বক্র দণ্ডের কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু যদি সর্বদা স্থির থাকে এবং দণ্ডটি যদি ঐ বিন্দুর যে-কোন দিকে অবাধে ঘুরিতে পারে, তাহা হইলে এইরূপ দণ্ডকে বলা হয় লিভার (lever)। ইহাতে

যে বিন্দুটি সর্বদা স্থির থাকে তাহাকে বলা হয় **আলম্ব (fulcrum)**। লিভার-দণ্ডের কোন-একটি বিন্দুতে থাকে কোন ভার (weight), বা রোধ (resistance) এবং অপর কোন বিন্দুতে বল (force) প্রয়োগ করিয়া ভারটিকে সহজে উত্তোলন করা যায়। বল ও ভারের (অর্থাৎ, রোধের) প্রয়োগ-বিন্দু আলম্বের একই দিকে, বা বিপরীত দিকে থাকিতে পারে। আলম্ব হইতে বল ও রোধের প্রয়োগ-বিন্দুর দূরত্বকে যথাক্রমে **বল-বাহু (power-arm)** ও **রোধ-বাহু (resistance-arm)** বলা হয়।

লিভার তিন প্রকার, যথা—(i) প্রথম শ্রেণীর লিভার, (ii) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার ও (iii) তৃতীয় শ্রেণীর লিভার।

(i) **প্রথম শ্রেণীর লিভার :** যে লিভারে আলম্বের এক দিকে থাকে ভার এবং বল প্রয়োগ করা হয় উহার বিপরীত দিকে, তাহাকে বলা হয় প্রথম শ্রেণীর লিভার। এই ধরনের লিভারে বল-বাহু সাধারণতঃ রোধ-বাহু অপেক্ষা দীর্ঘতর হইয়া থাকে।

ধরা যাক, নিম্নে প্রদত্ত চিত্রে AB একটি প্রথম শ্রেণীর লিভার ; C বিন্দুটি উহার আলম্ব। আলম্বের কাছাকাছি বিন্দু B-তে W ভার ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহার বিপরীত দিকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী বিন্দু A-তে P বল প্রয়োগ করিয়া ভারটিকে তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এখানে AC হইল বল-বাহু এবং BC হইল রোধ-বাহু ; AC বাহু BC বাহু অপেক্ষা দীর্ঘতর। এই ক্ষেত্রে গাণিতিক পদ্ধতিতে সহজেই প্রমাণ করা যায়, লিভারটির সাম্য অবস্থায়,



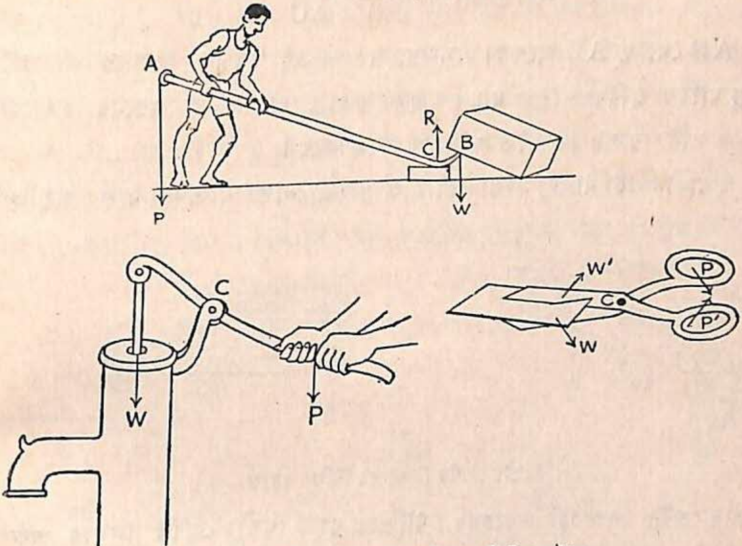
প্রথম শ্রেণীর লিভার-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা

$$P \times AC = W \times BC$$

$$\therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{AC}{BC}$$

যেহেতু BC অপেক্ষা AC বাহু দীর্ঘতর, অতএব যান্ত্রিক সুবিধার মান 1 অপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ বস্তুটির ওজন অপেক্ষা কম বল প্রয়োগ করিয়াই উহাকে তোলা সম্ভব হইতেছে। রোধ-বাহু (BC) অপেক্ষা বল-বাহু (AC) যত অধিক দীর্ঘ হইবে, লিভারটির যান্ত্রিক সুবিধাও তত বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম বল প্রয়োগ করিয়া অনেক বেশী ভার উত্তোলন করা সম্ভব হইয়া থাকে।

টিউবওয়েলের হাতল, ঢেঁকি, শাবল, কয়লা তুলিবার বেল্চা, মাটি কাটিবার

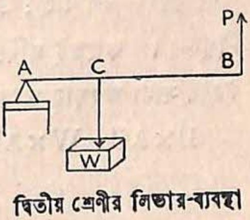


প্রথম শ্রেণীর লিভারের কার্যকারিতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

কোদাল প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ; কাঁচি হইল দুইটি প্রথম শ্রেণীর লিভারের সংযুক্ত রূপ। প্রদত্ত চিত্রগুলি লক্ষ্য করিলে উহাদের যান্ত্রিক সুবিধার বিষয়টি সহজেই বুঝা যাইবে।

(ii) **দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার : যে লিভারে আলম্বের যে দিকে ভার, বা রোধ থাকে, সেই দিকেই আরও দূরবর্তী কোন বিন্দুতে বল প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার বলা হয়।** প্রথম শ্রেণীর লিভারের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও বল-বাহু রোধ-বাহু অপেক্ষা দীর্ঘতর হইয়া থাকে।

প্রদত্ত চিত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের একটি চিত্ররূপ প্রদর্শিত হইল। AB লিভারটির C বিন্দুতে W ভার ঝুলানো হইয়াছে এবং B বিন্দুতে P বল প্রয়োগ করা হইতেছে; C ও B উভয় বিন্দুই আলম্ব A বিন্দুর একই দিকে আছে, কিন্তু B বিন্দু টি C বিন্দু অপেক্ষা আরও দূরে অবস্থিত। এই ক্ষেত্রে AB হইল বল-বাহু এবং AC হইল রোধ-বাহু। এখন, গণিতের সূত্র অনুসারে লিভারটির সাম্য অবস্থায়,



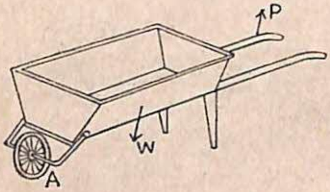
দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার-ব্যবস্থা

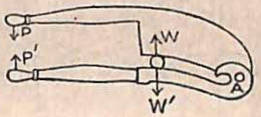
$$P \times AB = W \times AC$$

$$\therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{AB}{AC}$$

AB যেহেতু AC অপেক্ষা দীর্ঘতর, অতএব এই শ্রেণীর লিভারে অবশ্যই কিছু যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এই ধরনের লিভারে বল ও ভার পরস্পর বিপরীত অভিমুখে কাজ করে।

সুপারী-কাটা যাঁতি, ময়লাবাহী হাত-গাড়ী, নৌকা বাহিবার দাঁড় প্রভৃতি



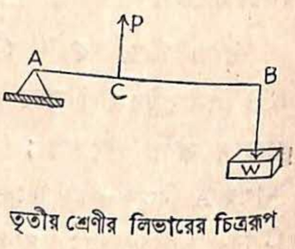


দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ। যাঁতিতে দুইটি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার এক সঙ্গে কাজ করে। চিত্রগুলি লক্ষ্য করিলে উহাদের যান্ত্রিক সুবিধা বুঝা যাইবে।

(iii) **তৃতীয় শ্রেণীর লিভার ঃ যে লিভারে বল ও ভার আলম্বের একই দিকে থাকে, কিন্তু বল প্রয়োগ করা হয় আলম্বের নিকটতর কোন বিন্দুতে, তাহাকে বলা হয় তৃতীয় শ্রেণীর লিভার।** দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের সহিত ইহার পার্থক্য হইল, এই ক্ষেত্রে রোধ-বাহু সর্বদাই বল-বাহু অপেক্ষা দীর্ঘতর হইয়া থাকে।

ধরা যাক, প্রদত্ত চিত্রানুযায়ী AB একটি লিভার ; A বিন্দুটি উহার আলম্ব, B বিন্দুতে W ভার ঝুলানো আছে এবং C বিন্দুতে ঊর্ধ্বমুখী P বল প্রয়োগ করিয়া ভারটিকে তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই ক্ষেত্রে AB হইল রোধ-বাহু এবং AC বল-বাহু ; AC অপেক্ষা AB দীর্ঘতর। কাজেই গণিতের সূত্র অনুসারে ইহার সাম্য অবস্থায় আমরা পাই ঃ



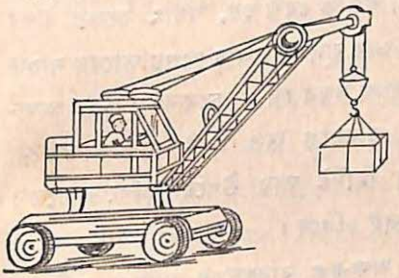
তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের চিত্ররূপ

$$P \times AC = W \times AB ;$$

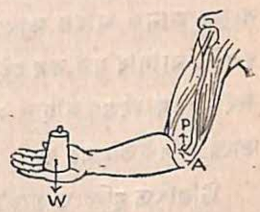
$$\therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{AC}{AB}$$

যেহেতু AB অপেক্ষা AC সর্বদাই ক্ষুদ্রতর, সুতরাং যান্ত্রিক সুবিধার মান

1 অপেক্ষা অবশ্যই কম হইবে। ইহার অর্থ, যান্ত্রিক সুবিধার পরিবর্তে এই ধরনের লিভারে যান্ত্রিক অসুবিধা ঘটে, অর্থাৎ কম ভার তুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশী বল প্রয়োগ করিতে হয়। এই অসুবিধা সত্ত্বেও এই ধরনের লিভারের প্রধান সুবিধা হইল এই যে, অন্যান্য লিভারের তুলনায় ইহাতে ভারকে স্থানচ্যুত করা যায় অনেক বেশী, এবং এই কারণেই ইহার ব্যবহার অতি ব্যাপক। যথেষ্ট ভারী-ভারী মাল উঠা-নামা করানোর জন্য, বা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে ক্রেন (crane)-যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহা তৃতীয় শ্রেণীর



ক্রেন-যন্ত্রে ভারী মাল উত্তোলন

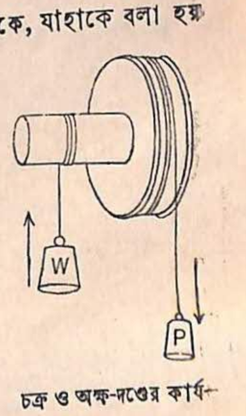


দৈহিক শক্তিতে হাতে ভার উত্তোলন

লিভারের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। সেলাইয়ের কল, চিমটা ইত্যাদিও তৃতীয় শ্রেণীর লিভার। আমরা যখন হাতের তালুতে কোন ভারী জিনিস লইয়া তুলিতে চেষ্টা করি, তখন হাতটি তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের ন্যায় কাজ করে।

(গ) চক্র ও অক্ষ-দণ্ড (Wheel and Axle) :

চক্র, বা চাকা মূলতঃ কাঠ, বা ধাতুর তৈয়ারী একটি গোলাকার সুদৃঢ় বেষ্টনী মাত্র। চক্রের কেন্দ্রে একটি ঋজু দণ্ড দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে, যাহাকে বলা হয় অক্ষ-দণ্ড (axle)। চক্র ও অক্ষ-দণ্ডের সমন্বয় মূলতঃ একটি প্রথম শ্রেণীর লিভারের ন্যায় কার্য করে। ধরা যাক, একটি চক্র ও উহার সহিত সংযুক্ত অক্ষ-দণ্ডের উপর দুইটি তার, বা দড়ি পরস্পর বিপরীতমুখিভাবে জড়ানো হইয়াছে এবং উহাদের নিম্ন-প্রান্তদ্বয় হইতে যথাক্রমে P ও W দুইটি ভার ঝুলানো আছে। P ভারের দরুণ চক্রটি আবর্তিত হইয়া এই ভারটি নীচে নামিবে এবং চক্রের আবর্তনের ফলে অক্ষ-দণ্ডটিও আবর্তিত হইবে, আর সেই সঙ্গে W ভারটি উপরে



চক্র ও অক্ষ-দণ্ডের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা

উঠিবে। যদি অক্ষ-দণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের (cross-section) ব্যাসার্ধ হয় a, এবং চক্রের ব্যাসার্ধ হয় b, তাহা হইলে এইক্ষেত্রে রোধ-বাহু হইবে a এবং বল-বাহু হইবে b। সুতরাং লিভারের নীতি অনুযায়ী :

$$P \times b = W \times a$$

$$\therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{b}{a}$$

চক্রের ব্যাসার্ধ b যেহেতু অক্ষ-দণ্ডের ব্যাসার্ধ a অপেক্ষা বহুগুণ বৃহত্তর ; অতএব, যান্ত্রিক সুবিধার মান 1 অপেক্ষা অনেক বেশী হয়, অর্থাৎ চক্রের উপর জড়ানো তারের সহিত অপেক্ষাকৃত কম ভার ঝুলাইয়া অক্ষ-দণ্ডের তারের সহিত সংযুক্ত অনেক অধিক ভারকে উপরে তোলা সম্ভব হয়। চক্রের তুলনায় অক্ষ-দণ্ডটির ব্যাসার্ধ যত কম হইবে, যান্ত্রিক সুবিধাও তত বেশী পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ অক্ষ-দণ্ডের সহিত সংযুক্ত কোন নির্দিষ্ট ভার উপরে তুলিতে চক্রের তারে অধিকতর স্বল্প ভার প্রয়োগ করিলেই চলিবে।

উল্লিখিত যুক্তিতে গাড়ীতে চক্র ও অক্ষ-দণ্ড ব্যবহারের যান্ত্রিক সুবিধার তাৎপর্য সহজেই বুঝা যায়। যে-কোন প্রকার গাড়ীতে কমপক্ষে সাধারণতঃ একটি অক্ষ-দণ্ডের দুই প্রান্তে দুইটি চক্র (wheel) সংবদ্ধ থাকে। সরু অক্ষ-দণ্ডটির এক বার ঘূর্ণনে বৃহত্তর ব্যাসের চক্রদ্বয়ও এক বার ঘূর্ণিত হয় সত্য, কিন্তু উহার বৃহত্তর পরিধির জন্য অধিকতর দূরত্ব অতিক্রম করে এবং গাড়ীর চলনে অধিকতর যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। ইহার বিশদ অলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাপ (Heat)

পাঠ্যসূচী: তাপের প্রকৃতি; তাপ ও তাপমাত্রা; তাপের পরিমাণ যে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল; শক্তির অন্যতম রূপ হিসাবে তাপ; তাপের সঙ্গে কার্যের সম্পর্ক।

তাপ বলিতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে আমাদের সকলেরই একটা মোটামুটি ধারণা আছে। কোন উত্তপ্ত বস্তু স্পর্শ করিলে, বা জলন্ত উনানের কাছে গেলে আমরা গরম বোধ করি; আবার একখণ্ড বরফ হাতে ধরিলে যথেষ্ট ঠাণ্ডা বোধ হয়। দিনের বেলা রৌদ্রে দাঁড়াইলে গরম লাগে; পক্ষান্তরে, ঘরের ভিতরে, অথবা রাত্রিকালে, অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বোধ হয়। এই সকল বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে সাধারণভাবে বলা যায়, আমাদের দেহে গরম, বা ঠাণ্ডা বোধ করিবার এই যে অনুভূতি, তাহার মূল কারণকে বলা হয় **তাপ** (heat)। কিন্তু আমাদের দেহে তাপের এই অনুভূতি নিতান্তই একটি আপেক্ষিক ব্যাপার; আমাদের গাত্র-ত্বকের স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেহ অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত কোন বস্তুর সংস্পর্শে আমরা গরম বোধ করি; আর তদপেক্ষা কম উত্তপ্ত বস্তুকে আমরা ঠাণ্ডা বলি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠাণ্ডা, বা গরম সকল বস্তুতেই কম-বেশী কিছু-না-কিছু পরিমাণ তাপ থাকিবেই। সুতরাং কেবল অনুভূতির সাহায্যে তাপের আপেক্ষিক অস্তিত্ব মাত্র মোটামুটি বুঝা যায়; কিন্তু তাপের প্রকৃতি, বা স্বরূপ ইহা হইতে কিছুমাত্র স্পষ্ট হয় না।

তাপের প্রকৃতি
(Nature of Heat)

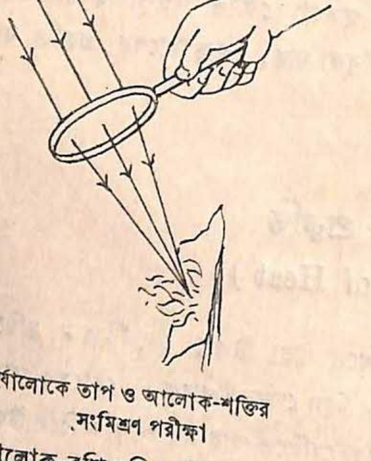
রৌদ্রে একখণ্ড লোহা ফেলিয়া রাখিলে উহা উত্তপ্ত হয়, কিন্তু না ধরিলে তাহা বুঝা যায় না; বস্তুটি দৃশ্যতঃ যেমন ছিল তেমনই থাকে। রৌদ্রের তাপে লোহা গরম হয়, কিন্তু সেই তাপ আমরা দেখিতে পাই না, স্পর্শ করিলে উহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি মাত্র। তাপে বস্তুর ওজন বাড়ে না, তাপ দেখাও যায়

না। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাপের কোন বস্তু-সত্তা নাই, উহার অদৃশ্য প্রভাবে বস্তু উত্তপ্ত হয়, যাহা কেবল আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিয়া তাপের অনুভূতি জাগায়। সুতরাং, তাপ অনুভূতি-সাপেক্ষ, বস্তু-সত্তাহীন কোন-কিছু, যাহাকে বিজ্ঞানে বলা হয় **শক্তি** (energy)। জড় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া শক্তির বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। শক্তির কর্ম-ক্ষমতা থাকে, কিন্তু দৃশ্য অস্তিত্ব থাকে না। অতএব, **তাপ হইল এক প্রকার শক্তি।**

তাপের ন্যায় আলোকও এক প্রকার অদৃশ্য শক্তি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত), যাহা কেবল বিভিন্নভাবে আমাদের অনুভূতি-সাপেক্ষ। তাপ-শক্তি আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিয়া উত্তাপের অনুভূতি জাগায় ; অনুরূপ-ভাবে, আলোক-শক্তির প্রভাবে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইয়া আলোকিত বস্তুসমূহ দর্শনের অনুভূতি জন্মে। তাপ ও আলোক উভয়েই অদৃশ্য **তরঙ্গ-ধর্মী**, অর্থাৎ কোন আলোক-উৎস হইতে নির্গত আলোক-শক্তি এবং কোন উত্তপ্ত বস্তু হইতে বিকিরিত তাপ-শক্তি উভয়ই তরঙ্গ-আকারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। আলোক-তরঙ্গ অপেক্ষা তাপ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর, উভয়ের মধ্যে এই মাত্র পার্থক্য।

তাপের উৎস (Source of heat) ঃ

তাপ-শক্তির মূল ও প্রধান উৎস হইল সূর্য। সূর্য প্রচণ্ড উত্তপ্ত বিরাটাকার একটি জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড বিশেষ ; ইহা হইতে বিপুল পরিমাণ তাপ-শক্তি অহরহঃ চারিদিকে বিকিরিত হইতেছে, যাহার কিয়দংশ মাত্র পৃথিবীতে আসে। সূর্য হইতে তাপ ও আলোক-শক্তি বিভিন্ন রূপ তরঙ্গের আকারে, অথচ পরস্পর একই সঙ্গে মিলিতভাবে মহাশূন্যের মধ্য দিয়া আসিয়া ভূ-পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সূর্যালোকের সঙ্গে সৌর তাপও যে মিশিয়া থাকে, তাহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায় ঃ একখানা আতস কাঁচ (burning-glass) সূর্যালোকের অভিমুখে ধরিলে আলোক-রশ্মিগুলি সেই আতসকাঁচটির পশ্চাতে যে বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হইয়া



সূর্যালোকে তাপ ও আলোক-শক্তির সংমিশ্রণ পরীক্ষা

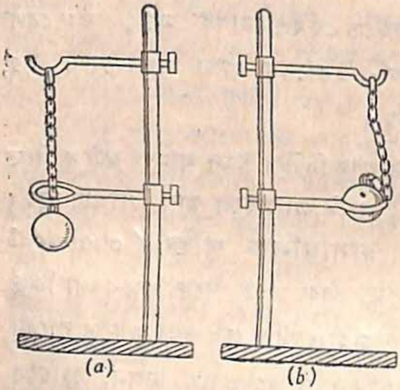
উজ্জ্বল দেখায়, সেখানে যথেষ্ট উত্তাপেরও সৃষ্টি হয় এবং কাগজ, বা অপর কোন সহজ-দাহ্য বস্তু সেই উত্তাপে সহজেই জ্বলিয়া উঠে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, সূর্য হইতে আলোক-রশ্মির সঙ্গে-সঙ্গে তাপ-রশ্মিও পরস্পর মিলিতভাবে আসে। প্রকৃতপক্ষে, কোন উত্তপ্ত বস্তু হইতে কেবল তাপই নহে, কম-বেশী আলোকও সর্বদাই বিকিরিত হইয়া থাকে; উত্তাপের মাত্রা যত বেশী হয়, বিকিরিত আলোক-শক্তিও তত বৃদ্ধি পায়।

কেবল সূর্যই নহে, কৃত্রিম উপায়েও তাপের বিভিন্ন উৎস আমরা সৃষ্টি করিতে পারি। (i) কাঠ, কয়লা, কেরোসিন ইত্যাদি জ্বালাইলে তাপ পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে জ্বালানী-পদার্থসমূহের দহনের **রাসায়নিক শক্তি** (chemical energy) তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, এবং এই সঙ্গে কম-বেশী কিছু আলোকও পাওয়া যায়। (ii) তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারাও তাপ সৃষ্ট করা যাইতে পারে। বৈদ্যুতিক বাল্‌বের সরু তার-কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে তড়িৎ-শক্তির (electrical energy) প্রভাবে তার-কুণ্ডলীটি প্রদীপ্ত ভাস্বর হইয়া উজ্জ্বল আলোক ছড়ায়, লক্ষ্যণীয় কোন তাপ বিকিরিত হয় না; কিন্তু তার-কুণ্ডলীটি যে অত্যুত্তপ্ত হইয়া উঠে তাহা বৈদ্যুতিক বাল্‌বটি স্পর্শ করিলে বুঝা যায়। বৈদ্যুতিক হিটার, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ইত্যাদিতে সরু তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনার ফলে যথেষ্ট তাপ পাওয়া যায়। এই সকল ক্ষেত্রে **তড়িৎ-শক্তি** প্রধানতঃ তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। (iii) দুই হাতের তালু, বা দুই খণ্ড কাঠ, বা পাথর পরস্পর ঘষিলে তাপের উদ্ভব ঘটে। এই সকল ক্ষেত্রে ঘর্ষণ-জনিত বাধা অতিক্রম করিবার জন্য যে **যান্ত্রিক শক্তি** (mechanical energy) ব্যয়িত হয়, তাহাই তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

তাপের প্রভাব (Effects of heat):

একখণ্ড লোহা সূর্যালোক, অর্থাৎ রৌদ্রে রাখিলে উহা উত্তপ্ত হয়; কিন্তু কেন হয়, উহার কি পরিবর্তন ঘটে? প্রকৃতপক্ষে, তাপ-শক্তির প্রভাবে যে-কোন পদার্থের সংগঠক অণুসমূহের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায় এবং উহাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ (intermolecular attraction) হ্রাস পাইয়া অণুগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুত স্পন্দিত হইতে থাকে; বস্তুর অণুসমূহের এইরূপ দ্রুত স্পন্দন ও চঞ্চলতাই উহার উত্তপ্ত হইবার **মূল কারণ**। তাপের প্রভাবে পদার্থের অণুসমূহের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইয়া পারস্পরিক আকর্ষণ হ্রাস পায় এবং তাহার ফলে উহারা পরস্পর পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করে বলিয়াই উত্তপ্ত

বস্তুমাত্রই **আয়তনে বাড়ে।** ধাতব বস্তুর উপরে তাপের এইরূপ প্রভাব সহজেই প্রমাণ করা যায়। একটি লৌহ-গোলক (a) ঠাণ্ডা অবস্থায় একটি রিং (ring)-এর ভিতর দিয়া সহজেই উঠা-নামা করিতে পারে; কিন্তু গোলকটিকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করিলে উহা (b) আয়তনে বাড়িবার ফলে আর ঐ রিং-এর ভিতর দিয়া গলে না। লোহা, বা অপর যে-কোন অদাহ্য পদার্থের আয়তন-বৃদ্ধি, বা সম্প্রসারণ তাপ-শক্তির প্রকৃতিগত ধর্ম। ক্রমাগত অধিকতর তাপ প্রয়োগ করিলে ঐ একই কারণে কঠিন লোহাও তরল হইয়া পড়ে; এমন কি, অত্যধিক উত্তপ্ত করিলে উহাকে বাষ্পীভূত করাও সম্ভব হইতে পারে। পদার্থের এইরূপ **অবস্থান্তর**ও তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফল। অবশ্য সকল পদার্থের অবস্থান্তরে প্রয়োজনীয় তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির হার সমান নহে। সাধারণ তাপেই বরফ গলিয়া জল হয়; তাপ কিছু বৃদ্ধি (মাত্র 100°C) করিলেই সেই জল বাষ্পে পরিণত হয়; কিন্তু অবস্থান্তরের মূল কারণ ঐ একই,—পদার্থের আণবিক আকর্ষণ ও আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি।



উত্তাপে ধাতুর আয়তন-বৃদ্ধির পরীক্ষা

তাপের পরিবহন (Conduction of heat):

কোন উত্তপ্ত বস্তুকে উন্মুক্ত স্থানে রাখিলে উহার তাপ সন্নিহিত বায়ুতে বিকিরিত হইয়া গিয়া বস্তুটি ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। একটি লৌহ-শলাকা ও এক টুক্‌রা লম্বা কাঠ দুই হাতে ধরিয়া উহাদের অগ্রভাগ জ্বলন্ত উনানে ধরিলে কাষ্ঠখণ্ড জ্বলে, লৌহ-শলাকাটির অগ্রভাগ উত্তপ্ত হয়, কিন্তু জ্বলে না। কাষ্ঠখণ্ডটি শেষ পর্যন্ত হাতে ধরিয়া রাখা যায়, উহার অগ্রভাগের তাপ তেমন পরিবাহিত হইয়া অপর প্রান্তে আসে না; কিন্তু লৌহ-শলাকাটির এক প্রান্তের তাপ দ্রুত সঞ্চালিত হইয়া অপর প্রান্তে আসে, হাতে তাপ অনুভূত হয়। আবার, এক খণ্ড উত্তপ্ত লৌহের সংস্পর্শে অপর একখণ্ড সাধারণ লৌহ রাখিলে দেখা যায়, ঠাণ্ডা লৌহ-খণ্ডটি ক্রমে উত্তপ্ত হইতেছে, আর উত্তপ্ত লৌহ-খণ্ডটি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইতেছে। ইহার কারণ, উত্তপ্ত পদার্থ হইতে সন্নিহিত ঠাণ্ডা

পদার্থে তাপ সঞ্চালিত, বা প্রবাহিত হইতে থাকে, যতক্ষণ না উভয়ে সমান উত্তপ্ত অবস্থায় পৌঁছায়। তাপের এইরূপ সঞ্চলনশীলতা, বা **পরিবাহিতা** তাপ-শক্তির একটি প্রকৃতিগত ধর্ম ; কিন্তু তাপের পরিবাহিতার হার সকল পদার্থে সমান নহে।

তাপ ও তাপমাত্রা

(Heat and Temperature)

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, তাপ হইল এক প্রকার শক্তি, যাহা আমরা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করিতে পারি এবং বস্তুর আয়তন-বৃদ্ধি, অবস্থান্তর প্রভৃতি তাপ-জনিত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া বস্তুতে তাপের উপস্থিতির ধারণা করিতে পারি। কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করিলে উহার উষ্ণতা ক্রমে বৃদ্ধি পায় ; আর উহা হইতে তাপ নিষ্কাশিত করিলে বস্তুটি ধীরে-ধীরে শীতল হয়। আপাতদৃষ্টিতে ইহা হইতে মনে হইতে পারে, কোন বস্তুর উষ্ণতা, বা শীতলতা উহাতে নিহিত তাপ-শক্তির পরিমাণের উপরে সরাসরি নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নিতান্তই একটি ভ্রান্ত ধারণা ; একটি অতি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এক গ্লাস ফুটন্ত জলে এক গ্লাস সাধারণ জল মিশাইলে এই মিশ্রিত জলকে ফুটন্ত জলের ন্যায় অত উষ্ণ বলিয়া বোধ হয় না ; অথচ ফুটন্ত ও সাধারণ উভয় জলে বিভিন্ন পরিমাণ তাপ সঞ্চিত ছিল, কাজেই মিশ্রিত জলের মোট তাপ অবশ্যই ফুটন্ত জলের মোট তাপ অপেক্ষা অধিক হইবে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কোন বস্তুতে সঞ্চিত মোট তাপ-শক্তির পরিমাণ এবং বস্তুটির উষ্ণতা, বা শীতলতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। কোন বস্তুর উষ্ণতা, বা শীতলতা উহার তাপীয় অবস্থা (thermal state) নির্দেশ করে ; অতএব বলা যায়, **বস্তুর তাপীয় অবস্থা, অর্থাৎ উহার উষ্ণতা, বা শীতলতার অবস্থাগত পরিমাপকে বলা হয় বস্তুর তাপমাত্রা** (temperature)।

তাপ-শক্তির একটি সাধারণ ধর্ম হইল, অসমান তাপীয় অবস্থার দুইটি বস্তুকে পরস্পরের সংস্পর্শে রাখিলে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর বস্তুটি (অর্থাৎ, যাহার তাপমাত্রা বেশী) হইতে অপেক্ষাকৃত শীতলতর বস্তুটিতে (অর্থাৎ, যাহার তাপমাত্রা কম) স্বতঃই তাপ প্রবাহিত হইতে থাকে, যতক্ষণ না উভয় বস্তুই একই তাপীয় অবস্থায় পৌঁছায়, অর্থাৎ উভয় বস্তুর তাপমাত্রা সমান হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় কোন্ বস্তুতে মোট কি পরিমাণ তাপ ছিল, তাহার উপর এইরূপ তাপ-প্রবাহের দিক কিছুমাত্র নির্ভর করে না ; তাপ-প্রবাহ সর্বদাই উচ্চতর হইতে নিম্নতর তাপীয় অবস্থা-অভিমুখী হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বলা যায়, কোন বস্তুর তাপমাত্রা হইল উহার তাপীয় অবস্থা-নির্দেশক এমন একটি ভৌত বৈশিষ্ট্য, যাহা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে, অথবা বিপরীত অভিমুখে তাপ প্রবাহের দিক্ নির্দেশ করে।

তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য

(Distinction between Heat and Temperature)

তাপ ও তাপমাত্রা এক নহে, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় ; উহাদের প্রধান-প্রধান পার্থক্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(i) তাপ প্রয়োগের ফলে যে-কোন বস্তুর উষ্ণতা বাড়ে, অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ; আবার কোন বস্তু তাপ বর্জন করিলে উহার উষ্ণতা কমে, অর্থাৎ তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সুতরাং তাপকে বলা যাইতে পারে **কারণ** (cause) এবং তাপমাত্রা হইল তাপের **ফল** (effect)।

(ii) তাপ হইল এক প্রকার শক্তি ; কোন বস্তুতে যে-পরিমাণ তাপ-শক্তি নিহিত আছে তাহাই হইল বস্তুটির মোট তাপের পরিমাণ। পক্ষান্তরে, কোন বস্তুর তাপমাত্রা উহার **তাপীয় অবস্থা** (thermal state) নির্দেশ করে, অর্থাৎ তাপ এই বস্তুটি হইতে অন্য বস্তুতে, অথবা অন্য বস্তু হইতে এই বস্তুটিতে প্রবাহিত হইবে, তাহা বস্তুটির তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য একটি সহজ তুলনার সাহায্যে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতে পারে। কোন পাত্রে যত বেশী জল ঢালা যায়, পাত্রে জলের তল তত উপরে উঠে ; অনুরূপভাবে, কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে যত বেশী পরিমাণ তাপ-শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহার তাপমাত্রাও তত বেশী বৃদ্ধি পায়। তাপকে পাত্রস্থ জলের মোট পরিমাণের সহিত এবং তাপমাত্রাকে জলের তলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিলেও, জলের পরিমাণ ও উহার তল যেমন এক নহে, তাপ ও তাপমাত্রাও তেমনই একার্থ-জ্ঞাপক নহে।

আবার, দুইটি জলপূর্ণ পাত্রকে নলপথে পরস্পর সংযুক্ত করিলে, যে-পাত্রে জলের তল অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চতায় অবস্থিত সেই পাত্র হইতে নিম্নতর

জলতল-বিশিষ্ট পাত্রটিতে জল প্রবাহিত হয়; কোন পাত্রে মোট কি পরিমাণ জল আছে তাহার উপর এই জল-প্রবাহের দিক কিছুমাত্র নির্ভর করে না। অনুরূপভাবে, তাপ সর্বদা উষ্ণতর বস্তু হইতে শীতলতর বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ না একটির তাপমাত্রা বাড়িয়া ও অপরটির কমিয়া অবশেষে উভয়ের তাপমাত্রাই সমান হয়। বস্তু দুইটিতে সঞ্চিত তাপের মোট পরিমাণের উপরে তাপ-প্রবাহের দিক নির্ভর করে না ; পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, উচ্চতর তাপমাত্রার বস্তু হইতে নিম্নতর তাপমাত্রার বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, এক বাল্‌তি সাধারণ জলে একটি অত্যুত্তপ্ত লোহার স্ঁচ ফেলিলে জলের তুলনায় স্ঁচটির তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশী বলিয়া উত্তপ্ত স্ঁচটি হইতে জলে তাপ প্রবাহিত হয় এবং অবশেষে উভয়ে সমান তাপমাত্রায় উপনীত হইবার পর তাপ-প্রবাহ আর ঘটে না।

কোন বস্তুর তাপমাত্রা নির্ধারণ করিবার জন্য বিভিন্ন ধরনের থার্মোমিটার, বা তাপমান-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, যাহা পূর্ববর্তী শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে আলোচিত ও পঠিত হইয়াছে।

তাপের পরিমাণ-নির্ধারক বিষয়সমূহ

(Factors determining the quantities of Heat)

তাপের পরিমাণ ক্যালোরি (calorie) এককে মাপা হয় ; 1 গ্র্যাম (অর্থাৎ 1 সি. সি.) বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধি করিতে যে-পরিমাণ তাপ-শক্তি প্রয়োজন হয় তাহাকে বলা হয় এক **ক্যালোরি**। কোন বস্তুতে নিহিত মোট তাপের পরিমাণ উহার তিনটি ভৌত ধর্মের উপরে নির্ভরশীল ; যেমন— (i) উহার মোট বস্তু-পরিমাণ, বা **ভর** (mass), (ii) বস্তুটির তাপগ্রাহিতা, বা **আপেক্ষিক তাপ** (specific heat) ও (iii) উহার উষ্ণতা, বা **তাপমাত্রা** (temperature)। কোন জড় বস্তুতে সঞ্চিত মোট তাপের পরিমাণ সর্বদা উহার উক্ত তিনটি রাশির গুণফলের সমান হইয়া থাকে। এই তথ্যটি H = m.s.t. সমীকরণের সাহায্যে সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয় ; ইহাতে H হইল কোন বস্তুতে নিহিত মোট তাপ-শক্তি, m হইল উহার ভর, s হইল বস্তুটির তাপগ্রাহিতা, বা আপেক্ষিক তাপ এবং t তাপমাত্রা।

কোন বস্তুতে নিহিত মোট তাপ-শক্তির পরিমাপক উল্লিখিত তিনটি ধর্মের তাপ-সম্পর্কিত তাৎপর্য নিম্নে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল :

(i) **বস্তুর ভর (mass) :** একই পদার্থে তৈয়ারী অসমান ভর-বিশিষ্ট ছোট-বড় দুইটি বস্তুর তাপমাত্রা সমান হইলেও বস্তু দুইটিতে নিহিত তাপশক্তির মোট পরিমাণের বিভিন্নতা থাকে ; যে-বস্তুর ভর অধিক, তাহাতে অধিক পরিমাণ তাপ-শক্তি সঞ্চিত হয়, অর্থাৎ বস্তুতে সঞ্চিত তাপ-শক্তির পরিমাণ উহার ভরের সমানুপাতিক। যেমন, ছোট-বড় দুইটি লোহার বলকে বুনসেন-দীপ-শিখায় একই তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিয়া সমপরিমাণ জল-পূর্ণ দুইটি বাল্‌তিতে পৃথক-পৃথকভাবে নিমজ্জিত করিলে দেখা যায়, বৃহত্তর বলটির ক্ষেত্রে বাল্‌তির জল অপর বাল্‌তির জল অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত হয়। ইহার কারণ, বৃহত্তর বলটির ভর, অর্থাৎ বস্তু-পরিমাণ বেশী বলিয়া উহাতে বেশী পরিমাণ তাপ সঞ্চিত ছিল ; কাজেই ক্ষুদ্রতর বলটির তুলনায় বৃহত্তর বলটি হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ তাপ বাল্‌তির জলে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তপ্ত করিয়া তোলে।

(ii) **বস্তুর আপেক্ষিক তাপ (Specific heat) :** গ্রীষ্মকালে একখণ্ড কাঠ ও একখণ্ড লোহাকে উন্মুক্ত স্থানে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে দেখা যায়, লৌহখণ্ডটি কাষ্ঠখণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তপ্ত হইয়া উঠে ; উভয়েই সমান সৌর-তাপ পাওয়া সত্ত্বেও কাঠ অপেক্ষা লোহার তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পদার্থিক উপাদানের বিভিন্নতার জন্য দুইটি বিভিন্ন বস্তুতে সম-পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করিলেও উহাদের তাপমাত্রার বৃদ্ধি সাধারণতঃ সমান হয় না ; অথবা বিপরীতভাবে বলা যায়, সমান তাপ-মাত্রাস্থিত সমান ভর-বিশিষ্ট বিভিন্ন উপাদানে গঠিত দুইটি বস্তুর মোট তাপের পরিমাণের মধ্যে বিভিন্নতা থাকে। মোট কথা, কোন বস্তুতে সঞ্চিত তাপের পরিমাণ বস্তুটির পদার্থিক উপাদানের তাপগ্রহণ-ক্ষমতা, বা তাপগ্রাহিতার উপর নির্ভরশীল। লোহা কাঠ অপেক্ষা অধিকতর তাপ শোষণ, বা গ্রহণ করিতে পারে, অর্থাৎ লোহার তাপ-গ্রহণের ক্ষমতা, বা আপেক্ষিক তাপ (specific heat) কাঠ অপেক্ষা অধিক।

কোন-কোন বস্তু, যেমন বিভিন্ন ধাতুসমূহ অপেক্ষাকৃত কম তাপেই বেশী উত্তপ্ত হইয়া উঠে ; আবার সিমেন্ট, ইট, কাঠ, পাথর, জল ইত্যাদিকে উত্তপ্ত করিতে অপেক্ষাকৃত বেশী তাপ প্রয়োজন হয়। একই তাপমাত্রায় রক্ষিত

এক পাউণ্ড লোহা অপেক্ষা এক পাউণ্ড জলে অধিকতর পরিমাণ তাপ সঞ্চিত থাকে, কারণ লোহার তুলনায় জলকে এই তাপমাত্রায় আনিতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ তাপ সরবরাহ করিতে হয়।

(iii) **তাপমাত্রা (temperature) :** কোন নির্দিষ্ট বস্তুর তাপমাত্রা যত অধিক হইবে, উহাতে তত অধিক পরিমাণ তাপ নিহিত আছে বুঝিতে হইবে ; কারণ, তাপমাত্রা হইল তাপের ফল। ছায়ায় রক্ষিত একটি লোহখণ্ড অপেক্ষা রৌদ্রে রক্ষিত সম-আয়তনের লোহখণ্ডের উষ্ণতা, বা তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে ; যেহেতু উহাতে অধিকতর পরিমাণ তাপ সঞ্চিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহা অধিকতর পরিমাণ সৌর-তাপ শোষণ করিবার ফলেই উহার তাপমাত্রার অধিকতর বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, মোট তাপের পরিমাণও বাড়িয়াছে।

শক্তির অন্যতম রূপ হিসাবে তাপ

(Heat as a form of Energy)

আমরা জানি, শক্তি বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, তাপ-শক্তি (heat energy) ইহার অন্যতম। তাপ-শক্তি ব্যতীত যান্ত্রিক শক্তি, তড়িৎ-শক্তি, চৌম্বক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, শব্দ-শক্তি, আলোক-শক্তি, ইত্যাদি শক্তির বিভিন্ন প্রকার-ভেদ আছে। বস্তুতঃ শক্তির সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই ; এক প্রকার শক্তিকে অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় মাত্র। সুতরাং তাপ-শক্তি সৃষ্টি করিতে হইলে অবশ্যই অন্য কোন প্রকার শক্তি ব্যয় করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রকার শক্তির তাপ-শক্তিতে রূপান্তরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(a) **যান্ত্রিক শক্তির তাপ-শক্তিতে রূপান্তর :** দিয়াশলাই আবিষ্কারের পূর্বে আদিম কালের মানুষ কাঠে-কাঠে ঘষিয়া, বা চকমকি পাথর পরস্পর ঠুকিয়া আগুন জালাইত। ছুরি-কাঁচিতে শান দিবার সময় উহাদের একটি অমসৃণ ঘূর্ণায়মান প্রস্তরখণ্ডের সংস্পর্শে রাখা হয় ; ঘর্ষণ-জনিত বাধা অতিক্রম করিতে যে যান্ত্রিক শক্তি ব্যয়িত হয় তাহার বিনিময়ে এত বেশী উত্তাপ সৃষ্টি হয় যে, উহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে দেখা যায়। আবার, দ্রুতগতিতে ট্রেন চলিবার সময় চাকা ও লোহপাটির পারস্পরিক ঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন হইবার ফলে উভয়েই যথেষ্ট উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

(b) **তড়িৎ-শক্তির তাপ শক্তিতে রূপান্তর ঃ** বৈদ্যুতিক বাতি, হিটার, ইস্ত্রি প্রভৃতি হইতে যে আলোক ও তাপ পাওয়া যায় তাহা তড়িৎ-শক্তির তাপ-শক্তিতে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত। বৈদ্যুতিক বাতিতে ধাতব তার-কুণ্ডলীর মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে কেবল যে আলোক পাওয়া যায়, তাহাই নহে ; তড়িৎ-শক্তি আংশিকভাবে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া তার-কুণ্ডলীটিকে যথেষ্ট উত্তপ্তও করে। বৈদ্যুতিক হিটার, ইস্ত্রি ইত্যাদিতেও তড়িৎ-শক্তিকে একইভাবে প্রধানতঃ তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

(c) **রাসায়নিক শক্তির তাপ-শক্তিতে রূপান্তর ঃ** যে-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কিছু-না-কিছু তাপীয় পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কোন-কোন বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয় (endothermic, তাপ-শোষক বিক্রিয়া), আবার কোন-কোন বিক্রিয়ায় তাপ উদ্ভূত হইয়া থাকে (exothermic, তাপ-উদ্গারী বিক্রিয়া) ; যেমন, জলে একখণ্ড সোডিয়াম ধাতু ফেলিলে পারস্পরিক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উদ্ভূত হয় এবং এই রাসায়নিক শক্তির বিনিময়ে এত অধিক পরিমাণ তাপ-শক্তি উদ্ভূত হয় যে, বায়ুর অক্সিজেনের সহিত উদ্ভূত ঐ হাইড্রোজেনের দহন-ক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন-গ্যাস স্বতঃই জ্বলিয়া উঠে।

বিভিন্ন প্রকার শক্তির তাপ-শক্তিতে রূপান্তরের এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মোট কথা, তাপ হইল এক প্রকার অদৃশ্য শক্তি, এবং তাপ সৃষ্টি করিতে হইলে অবশ্যই অপর কোন প্রকার শক্তি ব্যয় করিতে হয়।

তাপ ও কার্যের পারস্পরিক সম্পর্ক
(Relation between Heat and Work)

শক্তির অবিনাশিতা (Conservation of energy) সূত্র অনুসারে, যখনই কোন এক প্রকার শক্তি অন্তর্হিত হয় তখনই ঠিক সম-পরিমাণ অপর কোন প্রকার শক্তি উৎপন্ন হয় এবং শক্তির মোট পরিমাণ সর্বদাই অপরিবর্তিত থাকে ; কারণ, শক্তি সৃষ্টিও করা যায় না, উহার বিনাশও নাই,—শক্তি অবিনশ্বর। তাপ-শক্তি ও যান্ত্রিক শক্তির (বা কার্যের) পারস্পরিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে শক্তির অবিনাশিতা সূত্রটি সমভাবে প্রযোজ্য। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তি, বা কার্যকে তাপে রূপান্তরিত করিলে সর্বদা সম-পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়।

1867 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী জেমস্ প্রেসকট জুল (James Prescott Joule) বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে এই তথ্যটির সত্যতা প্রতিপন্ন করেন। যদি W পরিমাণ কার্য করিলে H পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে W/H অনুপাতটির মান সর্বদা কোন একটি সুনির্দিষ্ট ধ্রুবক রাশি হইবে; অর্থাৎ W/H = ধ্রুবক। এই ধ্রুবকটিকে বলা হয় **তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক** (Mechanical Equivalent of Heat); ইহার প্রতীক হইল J; অর্থাৎ,

$$\frac{W}{H} = J, \text{ অথবা } W = J.H$$

এই সমীকরণে H = 1 বসাইলে আমরা পাই, W = J; অর্থাৎ, **একক পরিমাণ তাপ পাইতে হইলে যে পরিমাণ কার্য করিতে হয়, তাহাকে বলা হয় তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক, J।**

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, সি.জি.এস. পদ্ধতির এককে J-এর মান 4·2 জুল/ক্যালোরি, বা $4{\cdot}2 \times 10^7$ আর্গ / ক্যালোরি; অর্থাৎ, 4·2 জুল, বা $4{\cdot}2 \times 10^7$ আর্গ পরিমাণ কার্যকে সম্পূর্ণরূপে তাপে রূপান্তরিত করিলে 1 ক্যালোরি পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়। **ক্যালোরি** (calorie), হইল তাপের একক (1 গ্র্যাম জলের তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধি করিতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন, তাহাকে বলা হয় 1 ক্যালোরি)। অপর পক্ষে বলা যাইতে পারে, 1 ক্যালোরি পরিমাণ তাপ ব্যয় করিলে 4·2 জুল, বা $4{\cdot}2 \times 10^7$ আর্গ পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আলোক
(Light)

পাঠ্যসূচী : আলোকের উৎস ; আলোক-রশ্মি ; আলোকের স্বরূপ ও গতিবেগ ; আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ; প্রতিফলন ও প্রতিসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা ; উত্তল লেন্সের অভিসারীয় ক্রিয়া ও ফোকাস-দূরত্ব ; আতস-কাঁচ হিসাবে উত্তল লেন্সের ব্যবহার ; আলোকের বিচ্ছুরণ ও বর্ণালী (পরীক্ষা ও প্রদর্শন)।

আলোক না থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। অন্ধকার ঘরে কোন জিনিসই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না ; কিন্তু বাতি জ্বালিলে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠে, আমরা সব-কিছু দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে, বাতির আলোক বস্তুর গায়ে প্রতিহত হইয়া আসিয়া আমাদের চোখে পড়িলে চোখের স্নায়ুগুলী উত্তেজিত হয় এবং তাহার ফলে বস্তুটি সম্বন্ধে আমাদের দর্শনের অনুভূতি জন্মে। অতএব বলা যায়, আমাদের দর্শন-অনুভূতির বাহিক মূল কারণকে বলা হয় **আলোক** (light)।

বস্তুতঃ আমরা আলোক দেখিতে পাই না, আলোকিত বস্তু দেখি। অন্ধকার ঘরের বন্ধ জানালার কোন সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সূর্যালোক ভিতরে প্রবেশ করিলে আলোক দেখা গেল বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ আলোকের গতিপথে যে-সকল ধূলিকণা বাতাসে ভাসমান থাকে সেইগুলিই আলোকিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই ক্ষেত্রে আমরা আলোক দেখি না, যাহা দেখি তাহা আলোকিত ধূলিকণার মাধ্যমে আলোকের গতি-পথ মাত্র। বস্তুতঃ আলোকের কোন দৃশ্য বস্তু-সত্তা নাই ; ইহা এক প্রকার **শক্তি** (energy) মাত্র, যাহা উৎস হইতে সর্বদা তরঙ্গাকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

আলোকের উৎস
(Source of Light)

সূর্য আলোকের মূল ও প্রধান উৎস। সূর্য একটি বিশালাকার জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড বিশেষ, যাহা অবিরত বিপুল পরিমাণ আলোক-শক্তি চারিদিকে বিকিরণ

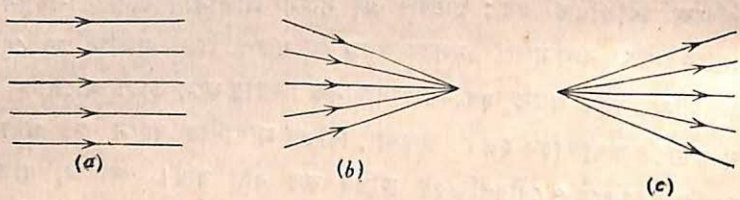
করিতেছে, এবং তাহারই কিয়দংশ আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে। সূর্য ব্যতীত কোন-কোন সমুজ্জ্বল তারকা হইতেও আমরা কিছু আলোক পাই, কিন্তু তাহা সূর্যালোকের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার, রাত্রিকালে আমরা যে চন্দ্রালোক পাই তাহারও মূল উৎস কিন্তু সূর্য, চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলোক নাই। সূর্যালোক চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে; কাজেই চন্দ্রকে আলোকের স্বাভাবিক উৎস বলা যায় না।

সূর্যালোক ব্যতীত বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ, জান্তব ও খনিজ তেল, চর্বি, মোম প্রভৃতি জ্বালাইয়া আমরা কৃত্রিম উপায়ে আলোক উৎপাদন করি। এই সকল জ্বালানীর সুসংহত দহনে যে প্রদীপ্ত শিখা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আলোক চারিদিকে বিকিরিত হয়; সুতরাং এই সকল জ্বালানীর জ্বলন্ত শিখাকেও আলোকের উৎস বলা যায়। মূলতঃ অবশ্য এই সকল জৈব জ্বালানীতে সৌর শক্তিই সঞ্চিত হইয়া থাকে, দহনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তাহা আলোক ও তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং, বিভিন্ন জ্বালানীর দহনে সৃষ্ট প্রদীপ্ত শিখার আলোককেও সৌরশক্তিরই কৃত্রিম রূপ বলা যায়। আবার, ধাতব তার-কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাইলে উহা অত্যুত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া আলোক বিকিরণ করে। এই আলোকের মূল উৎস যে তড়িৎ শক্তি (electricity) তাহা সাধারণতঃ কয়লার দহনে উৎপন্ন তাপ-শক্তির সাহায্যে উৎপাদিত হয়। খনিজ কয়লা ভূ-প্রোথিত উদ্ভিদেরই পরিবর্তিত রূপ, উহাতে সৌরশক্তি সঞ্চিত থাকে। সুতরাং বলা যায়, কোন জ্বালানীর দহনে উদ্ভূত প্রদীপ্ত শিখাই হউক, বৈদ্যুতিক প্রবাহে প্রদীপ্ত তার-কুণ্ডলীই হউক, আলোকের যে কোন উৎসই মূলতঃ সূর্য, বা **সৌরশক্তি** (Solar energy)।

মোট কথা, অত্যুত্তপ্ত প্রদীপ্ত বস্তুমাত্রই আলোকের উৎস। যে-কোন দাহ্য বস্তুকে জ্বালাইলে, এমন কি, একখণ্ড লোহাকে অত্যুত্তপ্ত করিলেও তাহা হইতে অবশ্যই কিছু আলোক বিকিরিত হয়; কিন্তু তাহা তেমন লক্ষ্যণীয় হয় না। কোন বস্তুর তাপমাত্রা অত্যধিক হইলে তাহা হইতে যথেষ্ট আলোক বিকিরিত হইয়া থাকে; যেমন—সূর্য, জ্বালানী তেল, বা মোমের প্রদীপ্ত শিখা, বৈদ্যুতিক বাল্‌ব (bulb) প্রভৃতি। ইহাদেরই সাধারণতঃ আলোকের উৎস বলা হয়; কিন্তু পার্থিব উৎস যাহাই হউক-না-কেন, আলোক ও তাপের মূল উৎস হইল সূর্য।

আলোক-রশ্মি (Ray of Light)

যে-কোন একক মাধ্যমের (যেমন, বায়ু, জল, কাঁচ ইত্যাদি) ভিতর দিয়া আলোক সর্বদা সরলরৈখিক পথে অগ্রসর হয়। আলোকের এক-একটি অতি-সূক্ষ্ম তরঙ্গ-ধারাকে বলা হয় **আলোক-রশ্মি** (ray of light)। ইহাকে একটি সরলরেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং আলোক কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা একটি তীর-চিহ্ন দ্বারা বুঝানো হয়। একক-ভাবে অবশ্য কোন আলোক-রশ্মিই আমাদের পক্ষে লক্ষ্য করা সম্ভব নহে, আমরা যাহা দেখি তাহা অনেকগুলি রশ্মির সমষ্টি ; ইহাকে বলা হয় **আলোক-রশ্মিগুচ্ছ** (beam of light)।



বিভিন্ন প্রকার আলোক-রশ্মিগুচ্ছ

গতির পথ অনুসারে আলোকের রশ্মিগুচ্ছ তিন প্রকার, যেমন—

(i) **সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ** (Parallel beam)— আলোকের যে রশ্মিগুচ্ছের প্রতিটি রশ্মি পরস্পর সমান্তরালভাবে চলে, তাহাকে বলা হয় সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ, চিত্র (a)।

(ii) **অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ** (Convergent beam)— যে আলোক-রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলি ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়া অবশেষে কোন একটি বিন্দুতে মিলিত হয়, তাহাকে বলে অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ, চিত্র (b)।

(iii) **অপসারী রশ্মিগুচ্ছ** (Divergent beam)— যে রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলি আলোকের কোন উৎস-বিন্দু হইতে ক্রমশঃ পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া ছড়াইয়া যায়, তাহাকে বলা হয় অপসারী রশ্মিগুচ্ছ, চিত্র (c)।

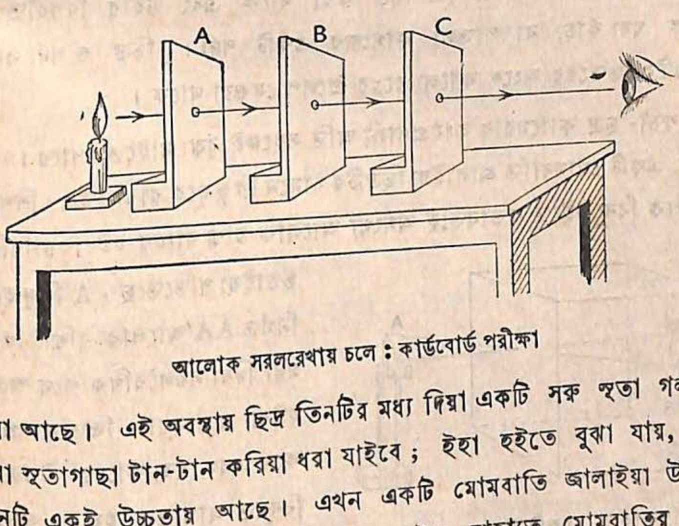
আলোক সর্বদা সরলরেখায় চলে :
(Light always moves in a straight line)

অন্ধকারে টর্চ জ্বালিলে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, উহার মুখ হইতে নির্গত আলোকগুচ্ছ সরলরৈখিক পথে অগ্রসর হয়। ট্রেন, বা মোটরগাড়ীর হেড্-লাইট

হইতে যে আলোক বাহির হয় তাহাও দেখা যায় ঋজু পথে চলে। অন্ধকার ঘরে জানালার ফাঁক দিয়া একফালি সূর্যালোক প্রবেশ করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, প্রবিষ্ট আলোক-রশ্মিগুচ্ছের প্রবাহ-পথ সরলরৈখিক ধরনের। বস্তুতঃ, আলোক যতক্ষণ কোন একটি সুনির্দিষ্ট একক মাধ্যমের মধ্য দিয়া চলে, ততক্ষণ তাহা সর্বদাই ঋজু রেখায় সরল পথে অগ্রসর হয়। আলোক কখনই বাঁকা পথে চলে না। এই তথ্যটি নানাভাবে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

আলোকের সরলরৈখিক গতিপথ অতি সহজেই বাস্তব পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। ইহার একটি পরীক্ষা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

পরীক্ষা ঃ সমান মাপের তিনখানা চতুষ্কোণ কার্ডবোর্ডকে ধারকের সাহায্যে টেবিলের উপরে কিছু দূর পর-পর সমান্তরালভাবে দণ্ডায়মান রাখা হইল। উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যস্থলে সমান উচ্চতায় একটি করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্র



আলোক সরলরেখায় চলে ঃ কার্ডবোর্ড পরীক্ষা

করা আছে। এই অবস্থায় ছিদ্র তিনটির মধ্য দিয়া একটি সরু সুতা গলাইয়া দিয়া সুতাগাছা টান-টান করিয়া ধরা যাইবে; ইহা হইতে বুঝা যায়, ছিদ্র তিনটি একই উচ্চতায় আছে। এখন একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া উহাকে কার্ডবোর্ডগুলির এক পার্শ্বে এমনভাবে রাখা হইল, যাহাতে মোমবাতির শিখা ছিদ্র তিনটির সহিত একই উচ্চতায় থাকে। এই অবস্থায় বিপরীত দিকের শেষ কার্ডবোর্ডটির ছিদ্র দিয়া তাকাইলে শিখাটির আলোক দেখা যাইবে। কিন্তু যে-কোন একটি কার্ডবোর্ডকে এদিক-ওদিক ডাইনে-বাঁয়ে সামান্য একটু সরাইয়া দিলেই শিখাটির আলোক আর দেখা যাইবে না।

ইহাতে বুঝা যায়, মোমবাতির শিখা কার্ডবোর্ড তিনটির ছিদ্রগুলির সহিত এক সরলরেখায় থাকিলেই কেবল শিখার আলোক দৃষ্টিগোচর হয়, অন্যথায়

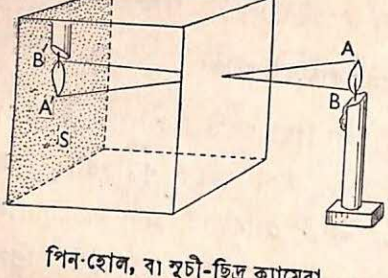
দেখা যায় না। আলোক যদি সর্বদা সরল পথে না চলিয়া আঁকা-বাঁকা পথে চলিতে পারিত, তাহা হইলে ছিদ্র তিনটি এদিক-ওদিক কিছু সরাইলেও আলোক-রশ্মি বাঁকা পথে আসিয়া অবশ্যই শিখার আলোক দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইত; কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ হয় না। অতএব এই পরীক্ষা হইতে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, আলোক সর্বদা সরলরেখায় চলে।

পিন-হোল, বা সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা (Pinhole Camera) :

আলোক সর্বদা সরলরেখায় চলে—এই নীতির ভিত্তিতে অতি সরল ধরনের এক প্রকার ক্যামেরা তৈয়ারী করা যায়, যাহাকে বলে সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা।

সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা মূলতঃ কার্ডবোর্ড, বা কোন ধাতব পাতে তৈয়ারী একটি আয়তাকার (rectangular) ছোট প্রকোষ্ঠ বিশেষ। উহার সম্মুখ-তলের মধ্যস্থলে গোলাকার একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করা থাকে এবং উহার বিপরীত পৃষ্ঠে থাকে ঘষা-কাঁচ, বা পাতলা কাগজের একটি পর্দা। ছিদ্র ও পর্দা ব্যতীত বাক্সটির ভিতরের অংশে কালো রঙের প্রলেপ দেওয়া থাকে।

সূচী-ছিদ্র ক্যামেরার কার্যপ্রণালী অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ধরা যাক, একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া ছিদ্রটির সামনে কিছু দূরে রাখা হইল। শিখাটির প্রত্যেক বিন্দু হইতে স্বভাবতঃই অসংখ্য আলোক-রশ্মি বাহির হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। A বিন্দু হইতে নির্গত AA′ আলোক-রশ্মিটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া সরলরৈখিক পথে অগ্রসর হইয়া ক্যামেরার ভিতরে প্রবেশ করে এবং ঘষা-কাঁচের উপর A′ বিন্দুতে আপতিত হয়। অনুরূপভাবে, শিখার সর্বনিম্ন B বিন্দু



পিন-হোল, বা সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা

হইতে যে BB′ আলোক-রশ্মিটি বাহির হয় তাহাও সরলরৈখিক পথে চলিয়া ঘষা কাঁচের উপর B′ বিন্দুতে পড়ে। শিখার A ও B বিন্দু দুইটির মধ্যবর্তী প্রত্যেকটি বিন্দু হইতে নির্গত আলোক-রশ্মি এইভাবে A′ ও B′ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশে আপতিত হইবেই। ইহার ফলে ঘষা-কাঁচের উপর AB শিখাটির একটি উল্টা প্রতিবিম্ব (inverted image) B′A′ গঠিত হয়, যাহা ক্যামেরাটির পশ্চাদ্বর্তী ঘষা-কাঁচ, বা কাগজের পর্দার উপরে স্পষ্ট দেখা যায়।

আলোক সর্বদা সরলরেখায় চলে বলিয়াই AB শিখাটির বিভিন্ন বিন্দু হইতে আগত যে আলোক-রশ্মিগুলি ক্যামেরার ভিতরে প্রবেশ করে তাহারা অবশ্যই ছিদ্রের ভিতর দিয়া পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করে এবং সেইজন্যই শিখাটির উল্টা প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। এইভাবে সূচী-ছিদ্র ক্যামেরায় গঠিত উল্টা প্রতিবিম্ব হইতে আলোকের সরলরৈখিক গতিপথ প্রমাণিত হয়।

সূচী-ছিদ্র ক্যামেরার ছিদ্রটি যত বড় করা হইবে, প্রতিবিম্বটি তত অস্পষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কারণ, বড় ছিদ্রকে আসলে অসংখ্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ছিদ্রের সমষ্টি হিসাবে গণ্য করা যায়; প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের জন্য এক-একটি প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেইগুলি পরস্পরের উপরে প্রতিস্থাপিত (superimposed) হইবার ফলে মোট প্রতিবিম্বটি অস্পষ্ট দেখায়।

আলোকের স্বরূপ ও গতিবেগ

(Nature and Velocity of Light)

আলোকের স্বরূপ ঃ আলোক মূলতঃ এক প্রকার শক্তি-তরঙ্গ মাত্র। উৎস হইতে নির্গত আলোক তরঙ্গের আকারে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এখন যে-কোন তরঙ্গের পরিবহনের জন্য অবশ্যই কোন পদার্থিক মাধ্যম প্রয়োজন, যাহার মধ্য দিয়া তরঙ্গ অগ্রসর হইবে। কিন্তু সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে যে বিশাল মহাশূন্য বিরাজমান, সেখানে বায়ু, বা অন্য কোন জড় পদার্থের অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, কোনরূপ পদার্থিক মাধ্যম ব্যতিরেকে মহাশূন্যের মধ্য দিয়া সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোক-তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছায় কি ভাবে? এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা কল্পনা করেন যে, এই বিশ্ব-চরাচরের সর্বত্র, এমন কি, মহাশূন্যের মধ্যেও **লুমিনিফেরাস ইথার** (luminiferous ether) নামক কোন একটি ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের অস্তিত্ব রহিয়াছে; এই ইথার বস্তুসত্তা ও ভারহীন, সর্বব্যাপী এবং ইন্দ্রিয়-অগোচর। বিজ্ঞানীদের মতে, আলোক এই কাল্পনিক ইথারের মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গের আকারে সূর্য হইতে পৃথিবীতে আসে।

আলোকের তরঙ্গ-প্রকৃতির অর্থ ইহা নহে যে, আলোক পর্যায়ক্রমিক আঁকা-বাঁকা ঢেউ-খেলানো পথে অগ্রসর হয়। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়,

আলোক সর্বদা সরলরেখায় চলে, অর্থাৎ আলোক-শক্তি এক বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে সরলরৈখিক পথে পরিবাহিত হয়। কিন্তু আলোকের এই গতিপথে অবস্থিত মাধ্যমের কণাগুলি উপরে-নীচে পর্যায়ক্রমে আন্দোলিত হইয়া ধারণাতীত সূক্ষ্ম তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আলোক-শক্তির পরিবহন ঘটায় এবং ইহার ফলেই তরঙ্গের উৎপত্তি ঘটে।

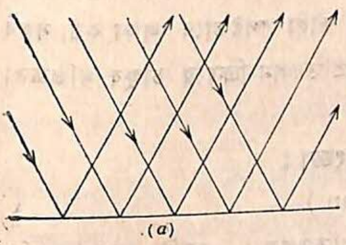
আলোকের গতিবেগ ঃ যে-কোন তরঙ্গের ন্যায় আলোক-তরঙ্গও কোন একটি সুনির্দিষ্ট গতিবেগে অগ্রসর হয়। আধুনিক বিভিন্ন সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নির্ধারিত হইয়াছে যে, আলোকের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1,86,000 মাইল, অর্থাৎ আলোক প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। সূর্য পৃথিবী হইতে প্রায় নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত ; সুতরাং সূর্যালোক পৃথিবীতে আসিয়া পৌছাইতে সময় লাগে 9,30,00,000/1,86,000 সেকেণ্ড = 8 মিনিট 20 সেকেণ্ড মাত্র। আলোকের গতিবেগ যে কি প্রচণ্ড, তাহার ধারণা করা যাইতে পারে যদি আমরা চিন্তা করি যে, একটি রকেট ঘণ্টায় 300 মাইল বেগে চলিলে সূর্যে পৌছাইতে উহার সময় লাগিবে প্রায় 35 বৎসর, অথচ সূর্য হইতে আলোক পৃথিবীতে পৌছায় মাত্র 8 মিনিট 20 সেকেণ্ডে। আলোকের গতিবেগই কোন-কিছুর গতিবেগের সর্বোচ্চ সীমা।

আলোকের প্রতিফলন
(Reflection of Light)

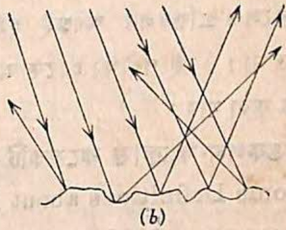
সংজ্ঞা ঃ আলোক কোন একটি মাধ্যমে চলিতে চলিতে অপর কোন মাধ্যমের উপর আসিয়া পড়িলে উহা মাধ্যম দুইটির সংযোগ-তল হইতে আংশিকভাবে, বা সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হইয়া পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে ; এই ঘটনাকে বলা হয় আলোকের প্রতিফলন (reflection of light)।

দুইটি বিভিন্ন মাধ্যমের যে সংযোগ-তলে আলোকের প্রতিফলন ঘটে, তাহাকে বলা হয় **প্রতিফলক** (reflector, or reflecting surface)। প্রতি-ফলকটি দর্পণের ন্যায় মসৃণ হইলে আলোক-রশ্মি উহাতে প্রতিহত হইয়া কোন সুনির্দিষ্ট পথে ফিরিয়া আসে ; ইহাকে বলা হয় **নিয়মিত প্রতিফলন** (regular

reflection)। কিন্তু কোন অমসৃণ তলে, যেমন ঘরের মেঝে, বা দেয়ালে



আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন

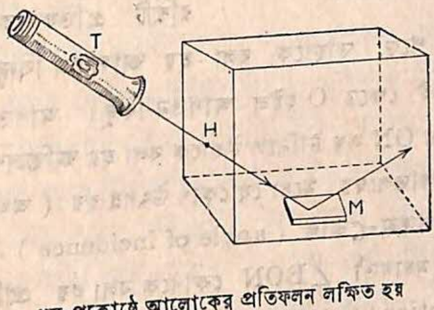


আলোকের বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

প্রতিহত হইলে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মিগুলি এলোমেলো যদৃচ্ছভাবে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে ; ইহাকে বলা হয় **অনিয়মিত**, বা **বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন** (irregular reflection)।

প্রতিফলনের পরীক্ষা (An Experiment of Reflection) :

উপরে কাঁচের ঢাক্‌না-যুক্ত কাষ্ঠনির্মিত একটি আয়তাকার বাক্সের এক পার্শ্বে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র (H) করা হইল। ঢাক্‌নাটি খুলিয়া বাক্সটির নিম্নতলে একটি



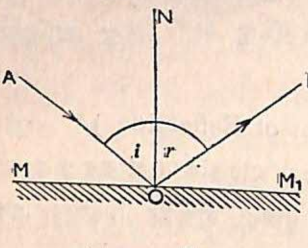
ধুম্র-প্রকোষ্ঠে আলোকের প্রতিফলন লক্ষিত হয়

সমতল দর্পণ (M) রাখা হইল এবং বাক্সটতে ধোঁয়া পূর্ণ করিয়া উহার ঢাক্‌নাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এখন এই বাক্সটিকে একটি অন্ধকার ঘরে রাখিয়া ছিদ্রটির পার্শ্বে একটি টর্চ জ্বালিয়া এমনভাবে ধরা হইল যাহাতে টর্চের আলোক ছিদ্রপথে ভিতরে প্রবেশ করিয়া আনতভাবে দর্পণের উপরে পড়ে। বাক্সটির উপরস্থ কাঁচের ঢাক্‌নার মধ্য দিয়া ভিতরে তাকাইলে স্পষ্ট দেখা যাইবে, আলোক-রশ্মিগুচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া বাক্সের বিপরীত দিকের গাত্রে পড়িতেছে। ইহা আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন, কারণ এই ক্ষেত্রে আলোক দর্পণটিতে প্রতিফলিত হইয়া কোন সুনির্দিষ্ট দিকে চালিত হইতেছে,

চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে না। বাক্সটিতে ধোঁয়া ভর্তি থাকায় আলোকের এই প্রতিফলন স্পষ্ট দেখা সম্ভব হয়; ভিতরে ধোঁয়া না থাকিলেও প্রতিফলন অবশ্যই হইত, কিন্তু তাহা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব হইত না। এই পরীক্ষা হইতে আলোকের প্রতিফলন-ক্রিয়ার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

প্রতিফলন-সংক্রান্ত কয়েকটি রাশির সংজ্ঞা :
(Some Definitions about Reflection)

ধরা যাক, MM_1 একটি সমতল প্রতিফলক। একটি আলোক-রশ্মি AO প্রতিফলকটির O বিন্দুতে আসিয়া পড়িতেছে এবং উহা প্রতিফলিত হইয়া OB পথে ফিরিয়া যাইতেছে। AO রশ্মিটিকে বলা হয় **আপতিত রশ্মি** (incident ray) এবং OB রশ্মিটিকে বলে **প্রতিফলিত রশ্মি** (reflected ray)। আপতিত রশ্মিটি প্রতিফলকের উপরে যে বিন্দুতে আসিয়া পড়ে, তাহাকে বলা হয় **আপতন-বিন্দু** (point of incidence); এই ক্ষেত্রে O হইল আপতন-বিন্দু। আপতন-বিন্দু O-তে প্রতিফলকের উপরে ON লম্ব টানিলে উহাকে বলা হয় **অভিলম্ব** (normal)। আপতিত রশ্মি ও অভিলম্বের মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ ∠AON) তাহাকে বলে **আপতন-কোণ** (angle of incidence) এবং প্রতিফলিত রশ্মি ও অভিলম্বের মধ্যবর্তী ∠BON কোণকে বলা হয় **প্রতিফলন-কোণ** (angle of reflection)। সাধারণতঃ প্রচলিত রীতি অনুসারে আপতন-কোণ ও প্রতিফলন-কোণকে যথাক্রমে i ও r চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



আলোকের প্রতিফলন

প্রতিফলনের সূত্র (Laws of Reflection) :

আলোকের প্রতিফলন-ক্রিয়া সর্বদাই নিম্নলিখিত দুইটি সূত্র, বা নিয়ম অনুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে, যেমন—

প্রথম সূত্র : আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপাতন-বিন্দুতে প্রতিফলকের উপরে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।

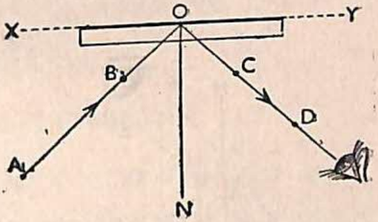
দ্বিতীয় সূত্র ঃ আপতন-কোণ ও প্রতিফলন-কোণ সর্বদাই পরস্পর সমান হয়।

কোন আলোক-রশ্মি যদি প্রতিফলকের উপরে লম্বভাবে পড়ে, অর্থাৎ অভিলম্বের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে আপতন-কোণ ও প্রতিফলন-কোণ উভয়ের মানই শূন্য হয়, অর্থাৎ প্রতিফলিত রশ্মিটি লম্ব পথেই ফিরিয়া যায়।

প্রতিফলনের সূত্র দুইটির পরীক্ষামূলক প্রমাণ ঃ

(Experimental Verification of the Laws of Reflection)

একটি মসৃণ ড্রয়িং-বোর্ডের উপরে একটি সাদা কাগজ পিন দ্বারা আঁটিয়া উহাতে যে-কোন একটি সরলরেখা XY আঁকা হইল। এই সরল-রেখাটির মধ্যবিন্দু O হইতে উহার উপর ON লম্ব টানা হইল এবং অন্য যে-কোন একটি তির্যক সরলরেখা OA আঁকা হইল। এখন একটি সমতল দর্পণকে কাগজখানার উপর XY রেখা বরাবর লম্বভাবে স্থাপন করা হইল



প্রতিফলনের সূত্রের পরীক্ষা

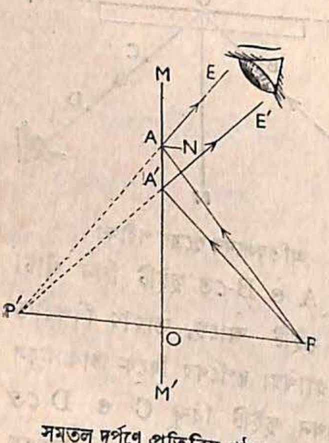
এবং OA রেখার উপরে যে-কোন দুইটি বিন্দু A ও B-তে দুইটি পিন আঁটা হইল। ON রেখার যে পার্শ্বে A ও B পিন দুইটি আছে, তাহার বিপরীত পার্শ্ব হইতে কাগজের তলের ঠিক উপরে চোখ রাখিয়া দর্পণের দিকে তাকাইলে পিন দুইটির প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। এখন দুইটি বিন্দু C ও D-তে দুইটি পিন এমনভাবে আঁটা হইল যাহাতে A ও B পিন দুইটির প্রতিবিম্বদ্বয় CD রেখার উপরে পড়ে, অর্থাৎ DC রেখা বরাবর দর্পণের দিকে তাকাইলে A ও B বিন্দু দুইটিকে যেন এই রেখার উপর অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। এখন দর্পণটিকে সরাইয়া লইয়া C ও D বিন্দুদ্বয়কে যুক্ত করিয়া এই রেখাকে বাড়াইয়া দিলে দেখা যাইবে যে, উহা O বিন্দুর মধ্য দিয়া যায়। এই ক্ষেত্রে আলোক ABO পথে আসিয়া দর্পণের উপরে O বিন্দুতে আপতিত হইতেছে এবং প্রতিফলিত হইয়া OCD পথে ফিরিয়া যাইতেছে। সুতরাং AO হইল আপতিত রশ্মি, OD প্রতিফলিত রশ্মি এবং ON অভিলম্ব ; AON ও DON কোণ দুইটি যথাক্রমে আপতন-কোণ ও প্রতিফলন-কোণ।

আপতিত রশ্মি (AO), প্রতিফলিত রশ্মি (OD) ও অভিলম্ব (ON) কাগজের সমতলে অবস্থিত। ইহা হইতে প্রতিফলনের প্রথম সূত্রটি প্রমাণিত হয়।

জ্যামিতিক কোণ-পরিমাপক যন্ত্র চাঁদা (protractor) দ্বারা মাপিলে দেখা যায়, আপতন-কোণ (AON) প্রতিফলন-কোণ (DON)-এর সমান। ইহা হইতে প্রতিফলনের দ্বিতীয় সূত্রটি প্রমাণিত হয়।

সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন ঃ
(Formation of Image in Plane Mirror)

ধরা যাক, MM′ একটি সমতল দর্পণ এবং P উহার সম্মুখে অবস্থিত একটি বিন্দু-উৎস (point-source)। একজন দর্শক দর্পণটির দিকে তাকাইয়া বিন্দু-উৎসটিকে লক্ষ্য করিতেছে। P বিন্দুটি হইতে নির্গত অসংখ্য আলোক-রশ্মির মধ্যে একটি রশ্মি PA দর্পণের উপরে A বিন্দুতে আপতিত হইতেছে এবং প্রতিফলিত হইয়া AE পথে ফিরিয়া যাইতেছে। অনুরূপভাবে, অপর একটি রশ্মি PA′ দর্পণের A′ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইয়া A′E′ পথে চলিয়া যাইতেছে। প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয় AE ও A′E′ অপসারী প্রকৃতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ উহারা ক্রমশঃ পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। এই রশ্মি দুইটিকে দর্পণের পশ্চাদ্দিকে বাড়াইয়া দিলে উহারা দর্পণের পিছনে কোন একটি বিন্দু P′-য়ে পরস্পরকে ছেদ করে। সুতরাং P বিন্দু-উৎস হইতে নির্গত PA ও PA′ রশ্মিদ্বয় দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া AE ও A′E′ পথে দর্শকের চোখে আসিয়া পৌছায়; কিন্তু দর্শকের কাছে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই রশ্মিদ্বয় যেন দর্পণের পশ্চাদ্বর্তী ঐ P′ বিন্দু হইতে আসিতেছে। সুতরাং দর্শক P′ বিন্দুতে P বিন্দুটির একটি **প্রতিবিম্ব** (image) দেখিতে পায়। দর্শকের চোখ যদি অন্য কোন স্থানে থাকিত, তাহা হইলেও প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, P বিন্দুটি হইতে নির্গত অন্য কোন আলোক-রশ্মিগুচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া



সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন

অপর কোন ভিন্ন পথে চোখে আসিয়া পৌঁছাইত, কিন্তু দর্শক ঐ একই P' বিন্দুতে P বিন্দুটির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইত।

বিন্দু উৎস নিতান্তই একটি কাল্পনিক ব্যাপার, ইহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। কিন্তু যে-কোন বস্তুকেই অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টি হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে এবং বস্তুর প্রত্যেক বিন্দুই বিন্দু-উৎসের অনুরূপভাবে দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া বস্তুটির সামগ্রিক প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে।

প্রতিবিম্বের অবস্থান (Position of Image):

জ্যামিতিক পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যায়, কোন বিন্দু-উৎস ও তাহার প্রতিবিম্বের সংযোগকারী সরলরেখা দর্পণের উপরে লম্বভাবে থাকে এবং বিন্দু-উৎসটি দর্পণের সম্মুখে যত দূরে অবস্থান করে, দর্পণের পশ্চাদ্দিকে ঠিক তত দূরে উহার প্রতিবিম্বটি গঠিত হয়।

প্রতিবিম্বের প্রকৃতি (Nature of Image):

প্রকৃতপক্ষে কোন আলোক-রশ্মিই দর্পণ ভেদ করিয়া উহার পশ্চাতে গিয়া পৌঁছায় না। বস্তু হইতে নির্গত আলোক-রশ্মি সমতল দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া যে-পথে দর্শকের চোখে আসিয়া পড়ে, দর্শকের কাছে মনে হয়, আলোক যেন সেই পথ বরাবর দর্পণের পিছনদিকের কোন বিন্দু হইতে আসিতেছে। এইজন্যই সমতল দর্পণের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে দর্পণের পশ্চাতে প্রতিবিম্ব লক্ষিত হয়। এইরূপ প্রতিবিম্বকে বলা হয় **অসদ্ প্রতিবিম্ব** (virtual image)। এই ধরনের প্রতিবিম্বের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই ; ইহা চোখে দেখা যায় মাত্র, কিন্তু ইহাকে পর্দায় ফেলা যায় না।

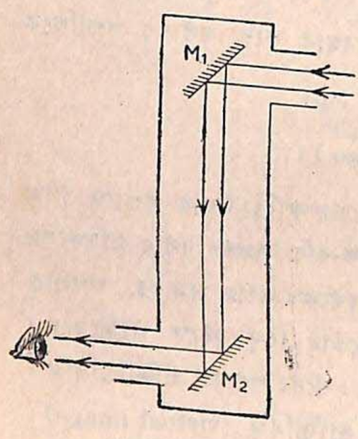
কোন আলোক-উৎস হইতে নির্গত আলোক-রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলকে প্রতিফলিত হইবার পরে যদি প্রকৃতই কোন বিন্দুতে মিলিত হইয়া সেখানে উহার প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সেই প্রতিবিম্বকে বলা হয় **সদ্ প্রতিবিম্ব** (real image)। এই ধরনের প্রতিবিম্বের বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং উহাকে চোখেও দেখা যায়, পর্দায়ও ফেলা যায়। ক্যামেরায় যে ছবি তোলা হয় তাহা এইরূপ সদ্ প্রতিবিম্ব।

সমতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের আকৃতি বস্তুর আকৃতির ঠিক উল্টা ধরনের হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রতিবিম্বের **পার্শ্ব-পরিবর্তন** (lateral inversion) ঘটে।

বস্তুটির যে বিন্দু দর্পণের যত কাছে অবস্থিত, তাহার প্রতিবিম্ব দর্পণের পিছনদিকে ঠিক তত কাছেই গঠিত হয় এবং এইজন্যই বস্তুটির উল্টা ধরনের প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। দর্পণে ডান হাতকে বাম হাতের ন্যায় এবং বাম হাতকে ডান হাতের ন্যায় দেখাইবার ইহাই মূল কারণ।

পেরিস্কোপ (Periscope) :

সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠনের ব্যবহারিক প্রয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হইল সরল পেরিস্কোপ (periscope) নামক একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা। ইহা প্রকৃতপক্ষে কাঠ, বা ধাতুনির্মিত দীর্ঘায়ত একটি বাক্স, যাহার উপরে-নীচে দুই বিপরীত পার্শ্বে দুইটি ছিদ্র করা থাকে। এই ছিদ্র দুইটির সম্মুখে বাক্সটির দৈর্ঘ্যের সহিত 45° কোণ করিয়া দুইটি সমতল দর্পণ পরস্পর মুখোমুখীভাবে সংলগ্ন থাকে। বাক্সটিকে খাড়াভাবে ধরিয়া উহার নীচের ছিদ্রপথ দিয়া দেখিলে উপরের ছিদ্রের সম্মুখস্থ বিভিন্ন বস্তু হইতে নির্গত আলোক-রশ্মিগুচ্ছ বাক্সে প্রবেশ করিয়া পর্যায়ক্রমে M_1 ও M_2 দর্পণে প্রতিফলিত হয় এবং সেই প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ নীচের ছিদ্রপথে দর্শকের চোখে আসিয়া পড়ে ; সুতরাং দর্শকের চোখের সম্মুখে কোন প্রতিবন্ধক থাকিলেও এইরূপ কৌশলে পেরিস্কোপের নিম্নবর্তী ছিদ্রপথে চোখ রাখিয়া দূরবর্তী বস্তু দেখা সম্ভব হয়।



পেরিস্কোপ যন্ত্রের গঠন

খেলার মাঠে ভিড়ের পশ্চাতে থাকিয়া খেলা দেখিবার জন্য এই ধরনের পেরিস্কোপ যন্ত্র প্রায়শঃই ব্যবহৃত হয়। জলের নীচে ডুবোজাহাজে অবস্থান-কালে উহার ভিতর হইতে জলের উপরের দৃশ্য দেখিবার জন্য সাধারণতঃ পেরিস্কোপ ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধের সময় সৈন্যরা পরিখার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া পেরিস্কোপের সাহায্যে শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়।

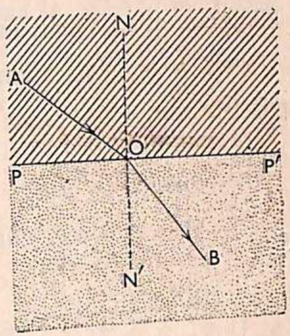
আলোকের প্রাতসরণ

(Refraction of Light)

সংজ্ঞা ঃ আলোক-রশ্মি যখন কোন একটি মাধ্যম হইতে অপর কোন মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন উহার অভিমুখ পরিবর্তিত হয়; এই ঘটনাকে বলা হয় আলোকের প্রতিসরণ (refraction of light)।

যে-কোন একক মাধ্যমে আলোক সর্বদাই সরল পথে চলে। কিন্তু কোন একটি মাধ্যমে সরলরৈখিক পথে চলিতে চলিতে আলোক-রশ্মি যখন দ্বিতীয় কোন মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন মাধ্যম দুইটির সংযোগ-তলে আলোক-রশ্মিটির গতিপথ কিছুটা বাঁকিয়া যায়; অবশ্য দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করিবার পর আলোক পুনরায় যথারীতি ভিন্ন কোন সরল পথে অগ্রসর হয়। এই ঘটনাকেই বলা হয় আলোকের প্রতিসরণ।

ধরা যাক, দুইটি বিভিন্ন মাধ্যমের সংযোগ-তল হইল PP′। একটি আলোক-রশ্মি AO প্রথম মাধ্যমের মধ্য দিয়া সরল পথে আসিয়া সংযোগ-তলের উপর O বিন্দুতে আপতিত হইতেছে। প্রতিসরণের ফলে AO রশ্মিটির অভিমুখের পরিবর্তন ঘটিবে, অর্থাৎ উহা বাঁকিয়া অন্য কোন ভিন্ন পথে OB সরলরেখায় দ্বিতায় মাধ্যমের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবে। প্রথম মাধ্যমের AO রশ্মিটিকে বলা হয় **আপতিত রশ্মি** (incident ray), O **আপতন-বিন্দু** (point of incidence) এবং দ্বিতীয় মাধ্যমের OB রশ্মিটিকে বলা হয় **প্রতিসৃত রশ্মি** (refracted ray)। আপতন-বিন্দু O-তে PP′ বিভেদ-তলের উপর NN′ লম্ব টানিলে উহাকে বলা হয় **অভিলম্ব** (normal)। অভিলম্ব এবং আপতিত ও প্রতিসৃত রশ্মি দুইটির মধ্যবর্তী AON ও BON′ কোণ দুইটিকে বলা হয় যথাক্রমে **আপতন-কোণ** (angle of incidence) ও **প্রতিসরণ-কোণ** (angle of refraction)।



আলোকের প্রতিসরণ

প্রতিসরণের সূত্র (Laws of Refraction) ঃ

আলোকের প্রতিসরণ-ক্রিয়া সর্বদাই নিম্নলিখিত দুইটি সূত্র, বা নিয়ম মানিয়া চলে, যথা—

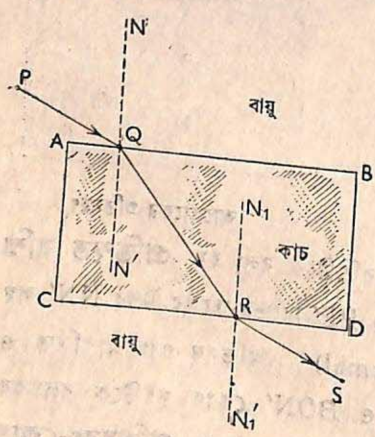
প্রথম সূত্র ঃ আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি এবং আপতন-বিন্দুতে বিভেদ-তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ আলোক লঘু হইতে ঘন মাধ্যমে, অথবা ঘন হইতে লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করিলে প্রতিসরণ-কোণ আপতন-কোণ অপেক্ষা যথাক্রমে ক্ষুদ্রতর, বা বৃহত্তর হয়।

দ্বিতীয় সূত্রটি হইতে বুঝা যায়, লঘু হইতে ঘন মাধ্যমে (যেমন, বায়ু হইতে কাঁচে) প্রতিসরণ-কালে প্রতিসৃত রশ্মিটি অভিলম্বের অপেক্ষাকৃত নিকটে সরিয়া আসে, অর্থাৎ আপতন-কোণ অপেক্ষা প্রতিসরণ-কোণ ক্ষুদ্রতর হয়। পক্ষান্তরে, ঘন হইতে লঘু মাধ্যমে (যেমন, কাঁচ হইতে বায়ুতে) আলোক প্রবেশকালে প্রতিসৃত রশ্মিটি অভিলম্ব হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে সরিয়া যায়, অর্থাৎ আপতন-কোণ অপেক্ষা প্রতিসরণ-কোণটি বৃহত্তর হয়।

প্রতিসরণের সূত্র দুইটির পরীক্ষামূলক প্রমাণ ঃ
(Experimental Verification of the Laws of Refraction)

একটি মসৃণ ড্রয়িং-বোর্ডের উপরে একখণ্ড সাদা কাগজকে চার কোণে চারটি পিন দ্বারা আঁটিয়া দেওয়া হইল। একটি আয়তাকার কাঁচ-ফলককে ঐ কাগজখানার মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া উহার পরিসীমা বরাবর AB, BD, CD ও CA রেখা অঙ্কিত করা হইল। ফলকটির AB পৃষ্ঠতল ঘেঁষিয়া একটি পিন Q এবং উহা হইতে কিছু দূরে অপর একটি পিন P এমনভাবে আঁটা হইল যাহাতে PQ রেখাটি AB রেখার সহিত তির্যকভাবে মিলিত হয়। এখন ফলকটির অপর দিকে কাগজের তলের



প্রতিসরণের সূত্রের পরীক্ষা

ঠিক উপরে চোখ রাখিয়া CD পৃষ্ঠতলের অতি সন্নিকটে একটি পিন R এবং

উহা হইতে কিছু দূরে অপর একটি পিন S এমনভাবে আঁটিয়া দেওয়া হইল যাহাতে P, Q, R ও S এই চারিটি পিনই এক সরলরেখায় আছে বলিয়া মনে হয়। এইবার কাঁচফলক ও পিনগুলি কাগজের উপর হইতে সরাইয়া লইয়া PQ, QR ও RS সরলরেখা অঙ্কিত করা হইল। Q ও R বিন্দুতে যথাক্রমে AB ও CD রেখার উপরে NN′ ও N_1N_1' দুইটি লম্ব আঁকা হইল।

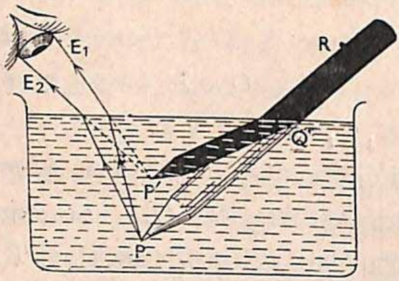
এইক্ষেত্রে আলোক বায়ু-মাধ্যমে PQ পথে আসিয়া Q বিন্দুতে প্রতিসৃত হইয়া কাঁচে প্রবেশ করিতেছে এবং কাঁচের মধ্য দিয়া উহা QR পথে চলিতে চলিতে R বিন্দুতে পুনরায় প্রতিসৃত হইয়া বায়ু-মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করিয়া RS পথে অগ্রসর হইতেছে। Q বিন্দুতে প্রতিসরণের ক্ষেত্রে NN′ হইল অভিলম্ব, PQN আপতন-কোণ ও N′QR প্রতিসরণ-কোণ। এখানে, আলোক যেহেতু লঘু মাধ্যম বায়ু হইতে ঘন মাধ্যম কাঁচে প্রবেশ করিতেছে, অতএব প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী প্রতিসরণ-কোণ N′QR আপতন-কোণ PQN অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হওয়ার কথা, এবং চাঁদা (protractor) দ্বারা মাপিলে প্রকৃতই এইরূপ লক্ষিত হইবে। আবার, R বিন্দুতে প্রতিসরণের ক্ষেত্রে N_1N_1' হইল অভিলম্ব, QRN_1 আপতন-কোণ ও SRN_1' প্রতিসরণ-কোণ। পরিমাপ করিলে দেখা যাইবে, প্রতিসরণ-কোণ SRN_1' আপতন-কোণ QRN_1 অপেক্ষা বৃহত্তর, এবং এই ক্ষেত্রে আলোক যেহেতু ঘন মাধ্যম কাঁচ হইতে লঘু মাধ্যম বায়ুতে প্রবেশ করিতেছে, অতএব প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী এইরূপই হওয়া উচিত। সুতরাং, এই পরীক্ষা হইতে প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্রটি সম্যক প্রমাণিত হইতেছে।

Q ও R উভয় বিন্দুতে প্রতিসরণের ক্ষেত্রেই আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি ও আপতন-বিন্দুতে বিভেদ-তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব কাগজের সমতলে অবস্থিত। ইহা হইতে প্রতিসরণের প্রথম সূত্রটি প্রমাণিত হয়।

প্রতিসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত
(Some Examples of Refraction) :

(1) **বস্তুর আকারের বিকৃতি :** একটি পেন্সিল, বা লাঠিকে জলে আংশিকভাবে নিমজ্জিত করিলে জল ও বায়ুর সংযোগ-তল হইতে উহার নিমজ্জিত অংশটি কিছুটা বাঁকিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রদত্ত চিত্র হইতে ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। পেন্সিলটির নিম্নতম বিন্দু P হইতে

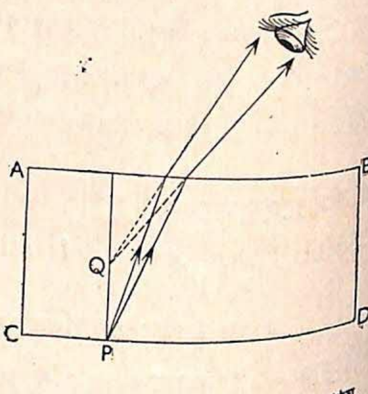
নির্গত আলোক-রশ্মিগুচ্ছ জল হইতে বায়ুতে প্রবেশকালে প্রতিসৃত হয় এবং



প্রতিসরণের ফলে সোজা জিনিস বাঁকা দেখায়

জলের তুলনায় বায়ু যেহেতু লঘুতর মাধ্যম, অতএব প্রতিসরণের পর সেই আলোক-রশ্মিগুচ্ছ অভিলম্ব হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে সরিয়া যায়। এই প্রতিসৃত রশ্মিগুচ্ছ অপসারী প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়ার ফলে উহা যখন দর্শকের চোখে আসিয়া পৌছায়, তখন আপাতদৃষ্টিতে তাহার মনে হয় যে, P বিন্দুটি যেন কিছুটা উপরে P' বিন্দুতে অবস্থিত। পেন্সিলের যে-অংশ জলে নিমজ্জিত আছে তাহার প্রত্যেকটি বিন্দুই এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা উপরে লক্ষিত হইবার ফলে নিমজ্জিত অংশটি উপরের দিকে কিছুটা বাঁকিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইয়া থাকে এবং ঐ অংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বলিয়াও বোধ হয়।

(2) **গভীরতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি :** বইয়ের পাতার উপরে একটি মোটা কাঁচফলক রাখিয়া উপর হইতে দেখিলে পাতার হরফগুলি কিছুটা উপরে উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নিম্নের চিত্রটি লক্ষ্য করিলে ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ABCD কাঁচফলকটির নীচে অবস্থিত P বিন্দু হইতে নির্গত আলোক-রশ্মিগুচ্ছ AB তলে প্রতিসৃত হইয়া যে-পথে দর্শকের চোখে আসিয়া পৌছায়, দর্শকের কাছে আপাতদৃষ্টিতে P বিন্দুটি সরাসরি সেই পথেই অন্য কোন বিন্দু Q-তে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই P বিন্দুটি কাঁচফলকটির উপরিতল হইতে প্রকৃতপক্ষে যত নীচে আছে, উপর হইতে দেখিলে উহাকে ঠিক তত নীচে বলিয়া মনে হয় না,



প্রতিসরণের ফলে বস্তুর গভীরতা কম দেখায়

অর্থাৎ কাঁচফলকটির গভীরতা আপাতদৃষ্টিতে কিছু কমিয়া যায়। এই একই

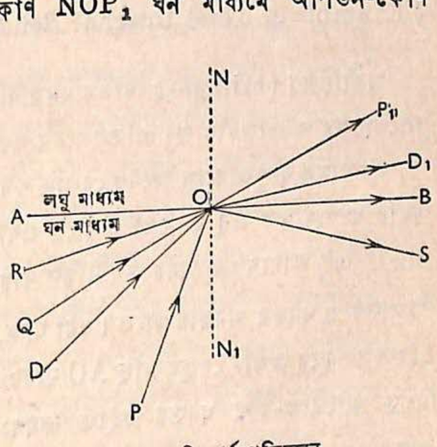
কারণে কোন জল-পূর্ণ চৌবাচ্চার উপর হইতে দেখিলে চৌবাচ্চাটি প্রকৃতপক্ষে যত গভীর উহাকে তদপেক্ষা কম গভীর বলিয়া বোধ হয়।

আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন

(Total Internal Reflection)

আলোক যখন এক মাধ্যম হইতে আসিয়া অন্য মাধ্যমের উপর আপতিত হয়, তখন উহার কিয়দংশ মাধ্যম দুইটির সংযোগ-তলে প্রতিফলিত হইয়া প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে এবং অপর অংশ প্রতিসৃত হইয়া দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে। কিন্তু কোন-কোন বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আপতিত আলোক মাধ্যম দুইটির বিভেদ-তলে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়া প্রথম মাধ্যমেই ফিরিয়া আসে ; আলোকের প্রতিসরণ কিছুমাত্রও ঘটে না। এই ঘটনাকে বলা হয় আলোকের **আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন**।

প্রদত্ত চিত্রে AB তলের উপরের মাধ্যমটি হইল লঘু মাধ্যম এবং নীচেরটি ঘন মাধ্যম। একটি আলোক রশ্মি PO ঘন মাধ্যমের মধ্য দিয়া সরল পথে আসিয়া বিভেদ-তলের O বিন্দুতে আপতিত হইতেছে এবং প্রতিসরণের পরে উহা দ্বিতীয় মাধ্যমের মধ্য দিয়া OP_1 পথে অগ্রসর হইতেছে। NON_1 রেখাটি আপতন-বিন্দু O-তে বিভেদ-তলের উপর অভিলম্ব। প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী লঘু মাধ্যমে প্রতিসরণ-কোণ NOP_1 ঘন মাধ্যমে আপতন-কোণ N_1OP অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে, অর্থাৎ আপতিত রশ্মি PO অপেক্ষা প্রতিসৃত রশ্মি OP_1 অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। এখন, ঘন মাধ্যমস্থিত আপতিত রশ্মিটিকে যদি অভিলম্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে সরানো হয় (যেমন, DO), অর্থাৎ আপতন-কোণের মান যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে প্রতিসরণ-কোণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ প্রতিসৃত রশ্মিটি অভিলম্ব হইতে ক্রমশঃ আরও



আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন

দূরে সরিয়া যায় (যেমন, OD_1)। আপতিত রশ্মিটিকে এইভাবে অভিলম্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে সরাইয়া অবশেষে এমন কোন অবস্থানে আনা যাইতে পারে (যেমন, QO), যখন প্রতিস্থত রশ্মিটি বিভেদ-তল ঘেঁষিয়া OB পথে অগ্রসর হইবে ; এই অবস্থায় QON_1 হইল আপতন-কোণ ও NOB প্রতিসরণ-কোণ। আপতন-কোণের এইরূপ যে-মানের ক্ষেত্রে প্রতিস্থত রশ্মিটি বিভেদ-তল ঘেঁষিয়া অগ্রসর হয়, অর্থাৎ প্রতিসরণ-কোণের মান দাঁড়ায় 90°, তাহাকে বলা হয় **সংকট-কোণ** (critical angle)। এইক্ষেত্রে QON_1 হইল সংকট-কোণ। আপতন-কোণের মান যদি সংকট-কোণ অপেক্ষা আরও বৃদ্ধি করা হয় (যেমন RON_1), তাহা হইলে প্রতিসরণ ঘটিবার আর কোন অবকাশ থাকে না এবং আপতিত রশ্মি RO বিভেদ-তলে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়া OS পথে পুনরায় ঘন মাধ্যমেই ফিরিয়া আসে। এই ঘটনাকেই বলা হয় আলোকের আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন (total internal reflection)।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিবার দুইটি **আবশ্যিক শর্ত** আছে ; যথা—

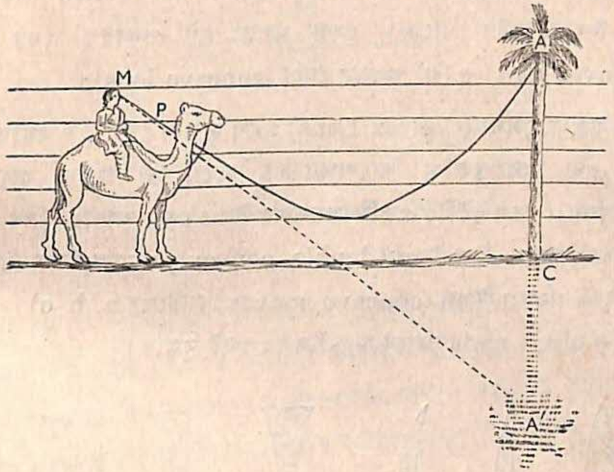
(i) আলোক-রশ্মি ঘন মাধ্যম হইতে আসিয়া লঘু মাধ্যমে প্রতিস্থত হইতে হইবে। (ii) ঘন মাধ্যমে আপতন-কোণের মান মাধ্যম দুইটির সংকট-কোণ অপেক্ষা অধিক হইতে হইবে।

আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত :
(Example of Total Internal Reflection)

মরীচিকা (Mirage) : বিভিন্ন ঘনত্ববিশিষ্ট দুইটি বায়ু-স্তরের সংযোগ-তলে আলোকের আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ফলে মরীচিকার উৎপত্তি ঘটে।

মরুভূমির বালুকারাশি দিনের বেলায় সূর্যালোকে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় এবং উহার সংস্পর্শস্থিত বায়ু-স্তর সেই উত্তাপে প্রসারিত হয়, অর্থাৎ উহার ঘনত্ব হ্রাস পায়। এই কারণে মরুভূমির উপরিস্থিত বায়ু-স্তরগুলি উপরের দিকে ক্রমশঃ শীতলতর ও ঘনতর অবস্থায় থাকে। ধরা যাক, মরুভূমিতে ভ্রাম্যমাণ কোন যাত্রী হইতে বহু দূরে একটি খেজুর গাছ AC রহিয়াছে। গাছটির শীর্ষবিন্দু A হইতে নির্গত আলোক-রশ্মি ঘনতর হইতে ক্রমশঃ লঘুতর বায়ু-স্তরের মধ্য দিয়া প্রতিসরণের নিয়মানুযায়ী ক্রমশ: তির্যকভাবে নীচের দিকে বাঁকিয়া অগ্রসর হইবে। ঘন হইতে লঘু মাধ্যমে প্রতিসরণ-কালে প্রতিস্থত রশ্মি যেহেতু অভিলম্বের

দিকে সরিয়া যায়, অতএব আলোক-রশ্মিটি যতই নীচে নামে ততই উহা অভিলম্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিতে থাকে, এবং পরিশেষে কোন নির্দিষ্ট



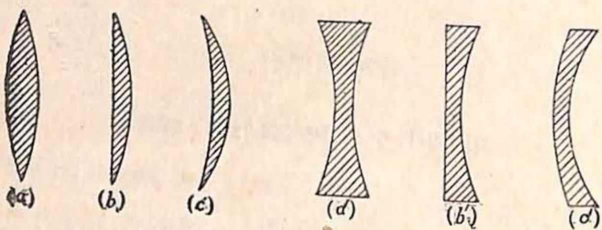
আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত : মরীচিকা

বায়ুস্তরে পৌছিয়া আপতন-কোণের মান যখন সংকট-কোণ অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে, তখন আলোক-রশ্মিটি সেই স্তরেই আভ্যন্তরীণভাবে পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় উপরের দিকে উঠিতে থাকে। এই ঊর্ধ্বগামী রশ্মিটি তখন আবার পর্যায়ক্রমে লঘুতর হইতে ঘনতর মাধ্যম অতিক্রম করিবার ফলে উহা ক্রমশঃ অভিলম্বের দিকে বাঁকিতে থাকে। রশ্মিটি পরিশেষে যে-পথে যাত্রীর চোখে আসিয়া পৌছায়, সেই পথ বরাবর সোজা সম্মুখ দিকে A′ স্থানে A-বিন্দুটির প্রতিবিম্ব যাত্রীটির চোখে পড়ে। খেজুর গাছটির প্রতিটি বিন্দু হইতে আলোক-রশ্মি অনুরূপভাবে প্রতিফলিত হইয়া আসিবার ফলে যাত্রীটির চোখে গাছটির একটি উল্টা প্রতিবিম্ব CA′ লক্ষিত হয়। দূর হইতে দেখিলে ইহাকে জলাশয়ে কোন বস্তুর কম্পনশীল প্রতিবিম্বের মত দেখায় এবং অদূরে কোন জলাশয় আছে মনে করিয়া তৃষ্ণার্ত যাত্রী এই অপস্রিয়মান প্রতিবিম্ব, বা মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হয়।

লেন্স (Lens)

দুই দিকে দুইটি সুনির্দিষ্ট তল দ্বারা সীমাবদ্ধ কোন স্বচ্ছ মাধ্যমকে বলা হয় লেন্স (lens)। লেন্সের দুইটি তলই গোলীয় (spherical) ধরনের, অথবা একটি তল গোলীয় ও অপরটি সমতল হইতে পারে। লেন্স সাধারণতঃ স্বচ্ছ কাঁচ-নির্মিত হইয়া থাকে। লেন্স মূলতঃ দুই প্রকার : (ক) উত্তল লেন্স (convex lens) ও (খ) অবতল লেন্স (concave lens)।

(ক) উত্তল লেন্স (Convex Lens) : যে সকল লেন্সের মধ্যভাগটি মোটা এবং প্রান্তভাগ অপেক্ষাকৃত সরু, তাহাদের বলা হয় উত্তল লেন্স। তল দুইটির প্রকৃতি অনুসারে উত্তল লেন্স আবার তিন প্রকার হইতে পারে ; যথা—উভ-উত্তল (double convex), সমতল-উত্তল (plano-convex) ও অবতল-উত্তল (concavo-convex) (চিত্রের a, b, c)। অবশ্য উত্তল লেন্স বলিতে সাধারণভাবে উভ-উত্তল লেন্সই বুঝায়।



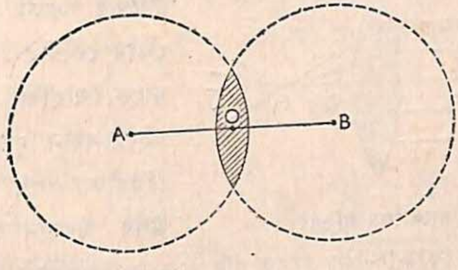
বিভিন্ন ধরনের উত্তল লেন্স   বিভিন্ন ধরনের অবতল লেন্স

(খ) অবতল লেন্স (Concave Lens) : যে সকল লেন্সের মধ্যভাগটি সরু এবং প্রান্তদ্বয় অপেক্ষাকৃত মোটা, তাহাদের বলা হয় অবতল লেন্স। উত্তল লেন্সের ন্যায় অবতল লেন্সও তিন প্রকার হইতে পারে ; যথা — উভ-অবতল (double concave), সমতল-অবতল (plano-concave) ও উত্তল-অবতল (convexo-concave) (চিত্রের a′, b′, c′)। অবতল লেন্স বলিতে সাধারণভাবে উভ-অবতল লেন্স বুঝায়।

লেন্স-সংক্রান্ত কয়েকটি রাশির সংজ্ঞা :

উত্তল, বা অবতল যে-কোন লেন্সেরই উভয় বক্রতল সাধারণতঃ পরস্পর প্রতিসম (symmetrical) হইয়া থাকে। লেন্সের প্রত্যেকটি গোলীয় তলকে

কোন একটি পূর্ণ গোলকের অংশবিশেষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এবং উহার কেন্দ্রকে বলা হয় ঐ তলটির **বক্রতা-কেন্দ্র** (centre of curvature)। কোন লেন্সের উভয় গোলীয় তলের বক্রতা-কেন্দ্র দুইটিকে যুক্ত করিলে যে



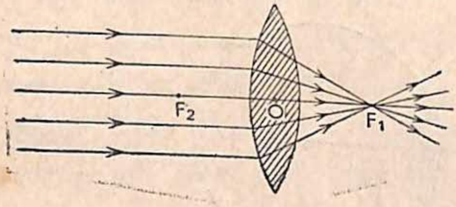
উত্তল লেন্সের গঠন-সম্পর্কিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা

সরলরেখা পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় লেন্সটির **প্রধান অক্ষ** (principal axis)। প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত যে-বিন্দুটি লেন্সের পৃষ্ঠ-তলদ্বয় হইতে সম-দূরবর্তী, তাহাকে বলা হয় লেন্সটির **আলোক-কেন্দ্র** (optical centre)। প্রদত্ত চিত্রে একটি উত্তল লেন্সের বক্রতা-কেন্দ্র, প্রধান অক্ষ ও আলোক-কেন্দ্র প্রদর্শিত হইয়াছে ; লেন্সটির তল দুইটির বক্রতা-কেন্দ্র হইল A ও B, লেন্সের প্রধান অক্ষ AB ও আলোক-কেন্দ্র O।

উত্তল লেন্সের ফোকাসীয় ক্রিয়া ও ফোকাস-দূরত্ব : (Focussing action of Convex Lens and Focal Length)

যে-কোন আলোক-রশ্মি বায়ু-মাধ্যমে আসিয়া কোন উত্তল লেন্সে প্রতিসরণের ফলে সর্বদাই লেন্সের প্রধান অক্ষের দিকে বাঁকিয়া যায়। ধরা যাক, একটি উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোক-রশ্মি লেন্সটির উপরে আপতিত হইয়াছে। যে রশ্মি প্রধান অক্ষ হইতে যত দূরে, তাহা প্রতিসরণের ফলে প্রধান অক্ষের দিকে তত বেশী বাঁকিয়া যায়। ইহার ফলে লেন্স হইতে যে রশ্মিগুচ্ছ নির্গত হয় তাহারা অভিসারী ধরনের হইয়া থাকে এবং প্রধান অক্ষের উপরে কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু F_1-এ পরস্পর মিলিত হয়। এই বিন্দুটিকে বলা হয় লেন্সটির **ফোকাস** (focus) এবং আলোক-কেন্দ্র O হইতে ফোকাসের দূরত্ব OF_1-কে বলা হয় **ফোকাস-দূরত্ব** (focal length)। আবার, লেন্সের যে দিকে F_1 বিন্দুটি আছে, যদি সেই দিক হইতে

একগুচ্ছ আলোক-রশ্মি প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে লেন্সের উপরে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে উহারা লেন্সটির অপর দিকে প্রধান অক্ষের উপর কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু F_2-তে আসিয়া মিলিত হইবে; এই বিন্দুটিও লেন্সের অন্যতম ফোকাস। যে-কোন লেন্সের দুইটি ফোকাস থাকে, যাহারা আলোক-কেন্দ্র হইতে সমান দূরে লেন্সের দুই বিপরীত পার্শ্বে প্রধান অক্ষের উপর অবস্থান করে। উত্তল লেন্সের যে-কোন ফোকাস-বিন্দু হইতে যদি একগুচ্ছ অপসারী (divergent) আলোক-রশ্মি নির্গত হইয়া লেন্সের উপর আপতিত হয়, তাহা হইলে উহারা প্রতিসৃত হইয়া লেন্সের অপর পার্শ্বে প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে বাহির হইয়া থাকে।



উত্তল লেন্সে আলোকের প্রতিসরণ

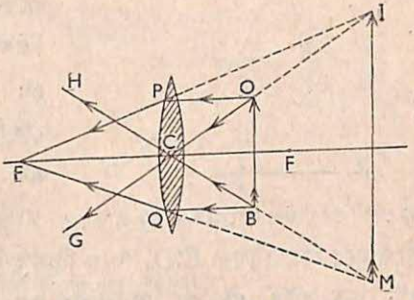
উত্তল লেন্সে আপতিত যে-কোন রশ্মিগুচ্ছ লেন্সের ভিতর দিয়া প্রতিসরণের ফলে অভিসারী হইয়া বহির্গত হয় বলিয়া এই ধরনের লেন্সকে অনেক সময় **অভিসারী লেন্স (Converging Lens)** বলা হয়।

বিবর্ধক কাঁচ (Magnifying Glass)

ছোট-ছোট অক্ষরে লেখা কোন কিছু পড়িবার জন্য ক্ষীণ-দৃষ্টি লোকেরা বিশেষ এক প্রকার কাঁচ ব্যবহার করেন যাহাকে বলা হয় **বিবর্ধক কাঁচ** (magnifying glass)। এইরূপ কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিলে যে-কোন বস্তুকেই অপেক্ষাকৃত অনেক বড় দেখায়।

বিবর্ধক কাঁচ প্রকৃতপক্ষে সাধারণ একখানা উত্তল লেন্স মাত্র। ইহার কার্য-প্রণালী প্রদত্ত চিত্র হইতে সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ধরা যাক, একটি উত্তল লেন্সের সম্মুখে ফোকাস-দূরত্বের মধ্যে একটি বস্তু OB রাখা হইয়াছে। বস্তুটির শীর্ষবিন্দু O এবং নিম্নবিন্দু B হইতে প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে যে দুইটি রশ্মি OP ও BQ নির্গত হইতেছে, তাহারা লেন্সের অপর পার্শ্বে ফোকাস-বিন্দু F-এ মিলিত হয়। অনুরূপভাবে, O ও B হইতে নির্গত যথাক্রমে OC ও BC রশ্মিদ্বয় আলোক-কেন্দ্র C-এর মধ্য দিয়া যাইবার ফলে উহারা নিজ-নিজ

গতিপথ হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত না হইয়া সোজা একই পথে লেন্স হইতে বহির্গত হইয়া যায়। এই চারটি রশ্মিকে পশ্চাদ্দিকে বর্ধিত করিলে উহারা I ও M বিন্দুতে পরস্পর মিলিত হয়। লেন্সের যে-দিকে বস্তুটি আছে তাহার বিপরীত দিক হইতে দেখিলে মনে হইবে, PF ও CG রশ্মি-দ্বয় যেন I বিন্দু হইতে, এবং QF ও CH রশ্মিদ্বয় যেন M বিন্দু হইতে নির্গত হইতেছে; অর্থাৎ দর্শকের চোখে লেন্সের অপর দিকে বস্তুটির একটি বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব IM গঠিত হইবে। এইরূপ প্রতিবিম্ব অসদ্ (virtual), সম-পার্শ্বীয় এবং বস্তুটি অপেক্ষা বড় আকারের হইয়া থাকে। এইজন্যই উত্তল লেন্সকে **বিবর্ধক কাঁচ** হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। উল্লিখিত কারণে ইহাকে অনেক সময় **সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র** (simple microscope) বলে।



বিবর্ধক কাঁচের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা

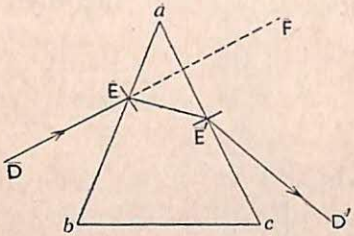
আলোকের বিচ্ছুরণ (Dispersion of Light)

প্রিজ্‌মের মাধ্যমে আলোকের প্রতিসরণ ঃ
(Refraction of Light through a Prism)

পরস্পরছেদী তিনটি আয়তাকার সমতলীয় পৃষ্ঠ-তল দ্বারা সীমাবদ্ধ কাঁচ, বা অন্য কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের ত্রিকোণাকৃতি ফলককে বলা হয় **প্রিজ্‌ম** (prism); সাধারণভাবে ইহাকে অনেক সময় ত্রি-শিরা কাঁচ-ফলক বলে। ইহার যে আয়তাকার পৃষ্ঠ-তলটি ভূমির সংস্পর্শে থাকে, তাহাকে বলা হয় **প্রিজ্‌মের ভূমি** (base); অপর দুইটি আয়তাকার পৃষ্ঠ-তলের মধ্যবর্তী কোণটিকে বলা হয় **প্রিজ্‌মের কোণ** (angle of prism)। কোন উলম্ব সমতল দ্বারা প্রিজ্‌মকে ছেদ করিলে যে ত্রিভুজাকার প্রস্থচ্ছেদ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে প্রিজ্‌মের **প্রধান ছেদ** (principal section)।

প্রদত্ত চিত্রে একটি প্রিজ্‌মের প্রধান ছেদকে abc ত্রিভুজ আকারে দেখানো

হইয়াছে। একটি আলোক-রশ্মি DE বায়ু-মাধ্যমে আসিয়া প্রিজ্‌মের ab তলের উপরে E বিন্দুতে আপতিত হইতেছে এবং বায়ুর তুলনায় কাঁচ ঘনতর মাধ্যম বলিয়া প্রতিসৃত রশ্মিটি অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া EE′ পথে প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। ac তলের E′ বিন্দুতে পৌঁছিয়া রশ্মিটির পুনরায় প্রতিসরণ ঘটিতেছে এবং এই ক্ষেত্রে ঘন হইতে লঘু



প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া আলোক-রশ্মির প্রতিসরণ

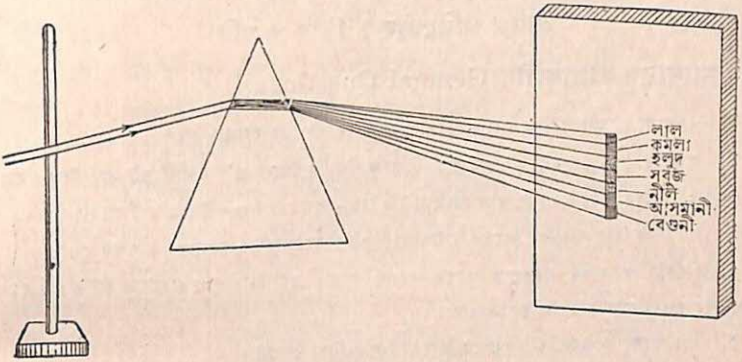
মাধ্যমে প্রবেশের দরুণ রশ্মিটি অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া গিয়া E′D′ পথে প্রিজ্‌ম হইতে বাহির হইতেছে। সুতরাং মোট ফল হইল এই যে, আপতিত আলোক-রশ্মিটি DEF পথে যাইবার পরিবর্তে প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া প্রতিসৃত হইয়া DEE′D′ পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, **যে-কোন আলোক-রশ্মি প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া প্রতিসরণের ফলে সর্বদা উহার ভূমির দিকে বাঁকিয়া যায়।**

আলোকের বিচ্ছুরণ ও বর্ণালী
(Dispersion of Light : Spectrum)

সাধারণ আলোককে আমরা দৃশ্যতঃ সাদা, বা বর্ণহীন বলিয়া মনে করি; কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের একত্র সমাবেশ, বা সংমিশ্রণে গঠিত; যেমন— লাল (red), কমলা (orange), হলুদ (yellow), সবুজ (green), নীল (blue), আসমানী (indigo) ও বেগুনী (violet)। এই তথ্যটি মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁহার ‘সপ্তবর্ণ-চক্র’ পরীক্ষার সাহায্যে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন; অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা সাদা আলোক সম্পর্কিত এই তথ্যটি বহু পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, সূর্য, বা অপর কোন উৎস হইতে বিকিরিত সাদা আলোক-রশ্মিগুচ্ছকে কোন সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ফেলিয়া একটি প্রিজ্‌ম (prism), বা ত্রি-শিরা কাঁচ ফলকের মধ্য দিয়া প্রতিসৃত করিলে দেখা যায়, সাদা আলোক তাহার সংগঠক সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকগুচ্ছে বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রিজ্‌মটির পশ্চাদ্দিকে রক্ষিত পর্দার উপরে পড়ে। ইহার কারণ, বিভিন্ন বর্ণের আলোক-রশ্মির

প্রতিসরণের কৌণিক মাত্রা বিভিন্ন, অর্থাৎ প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া প্রতিসরণের ফলে বিভিন্ন বর্ণের আলোক-রশ্মি প্রিজ্‌মের ভূমির দিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে



বর্ণালী গঠনের সহজ পরীক্ষা

বিভিন্ন কোণে বাঁকিয়া যায়। বস্তুতঃ এই কারণেই সাদা আলোক উহার সংগঠক সাতটি বিভিন্ন বর্ণে বিভাজিত হইয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পর্দার উপর এই-ভাবে যে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকপাত হয়, তাহার এক প্রান্তে থাকে বেগুনী (violet) বর্ণের স্তর ও অপর প্রান্তে থাকে লাল (red) বর্ণের স্তর। প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়া প্রতিসরণের ফলে সাদা আলোকের সংগঠক সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকে বিশ্লিষ্ট হইবার এইরূপ ঘটনাকে বলা হয় **আলোকের বিচ্ছুরণ** (dispersion of light), এবং ইহার ফলে প্রিজমের পশ্চাতে রক্ষিত সাদা পর্দার উপরে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের যে আলোক-স্তর গঠিত হয়, তাহাকে বলা হয় **বর্ণালী** (spectrum)।

উপরের চিত্রে প্রদর্শিত বর্ণালীতে বিভিন্ন বর্ণের স্তরগুলি পরস্পরের সহিত কিছুটা মিশিয়া যাইবার ফলে উহাদের সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব হয় না; বর্ণালীর সপ্তবর্ণ অবশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ অস্পষ্ট বর্ণালীকে বলা হয় **অবিশুদ্ধ বর্ণালী** (impure spectrum)। বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রিজ্‌মের দুই দিকে দুইটি লেন্স সুকৌশলে স্থাপন করিয়া সুস্পষ্ট, বা **শুদ্ধ বর্ণালী** (pure spectrum) গঠন করা যায়; কিন্তু তাহার জটিল পদ্ধতি পাঠক্রমের এই পর্যায়ে আলোচনা না করাই ভাল। আলোকের বিচ্ছুরণ ও অবিশুদ্ধ বর্ণালী গঠনের পরীক্ষা মোটামুটিভাবে উপরের চিত্রানুযায়ী সহজেই করা যাইতে পারে। প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে প্রকৃত, বা শুদ্ধ বর্ণালী গঠনের পরীক্ষা হাতে-কলমে করা কষ্টসাধ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ স্থিতি ও গতি

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. গতিবেগের সংজ্ঞা লিখ এবং গতিবেগ ও দ্রুতির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

2. ত্বরণ বলিতে কি বুঝায়? ত্বরণের এককে 'প্রতি সেকেণ্ডে' কথাটি দুই বার উল্লেখ করা হয় কেন? কোন বস্তুর মন্দনের মান 50 সেন্টিমিটার; বর্গ সেকেণ্ড—ইহার অর্থ ব্যাখ্যা কর।

3. জাড্য কাহাকে বলে? কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে জাড্যের বাস্তব তাৎপর্য বুঝাও।

4. নিউটনের প্রথম গতিসূত্র হইতে বলের সংজ্ঞা এবং দ্বিতীয় সূত্র হইতে বলের পরিমাপ কিভাবে পাওয়া যায় তাহা আলোচনা কর।

5. বল কাহাকে বলে, বিশদভাবে আলোচনা করিয়া বুঝাও।

'P=mf' সমীকরণটি প্রমাণ কর এবং ইহার ভিত্তিতে সি. জি. এস. ও এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে বলের এককগুলি ব্যাখ্যা কর।

6. নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রটি লিখ। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলিতে কি বুঝায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। উহারা কি একই বস্তুর উপরে প্রযুক্ত হয়?

7. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :- (ক) ত্বরণ ও মন্দন, (খ) জাড্য, (গ) 'নিউটন', (ঘ) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, (ঙ) ডাইন ও পাউণ্ডাল।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, তাহা টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :—

(i) প্রকৃত বিচারে কোন পার্থিব বস্তুই স্থির নহে।—ভুল (···) ; নির্ভুল (···)।

(ii) কোন বস্তুর উপরে বল প্রয়োগ করিলে বস্তুটির অবশ্যই ত্বরণ ঘটিবে।—ভুল (···) ; নির্ভুল (···)।

(iii) বাস হঠাৎ চলিতে শুরু করিলে যাত্রীরা স্থিতি-জাড্যের দরুণ পিছন দিকে হেলিয়া পড়ে।—ভুল (···) ; নির্ভুল (···)।

(iv) স্থির গতিবেগে চলমান বস্তুর উপরে কোন বাহ্যিক বল ক্রিয়া করে না।—ভুল (···) ; নির্ভুল (...)।

(v) গতিবেগের মান ও অভিমুখ উভয়ই সুনির্দিষ্ট।—ভুল (···), নির্ভুল (···)।

2. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :—

(i) পতনশীল বস্তুর গতিবেগের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে?—গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় (···) ; গতিবেগ ক্রমশঃ হ্রাস পায় (···) ; সম-গতিবেগে নীচে পড়িতে থাকে (...)।

(ii) দুই গ্রাম ভরবিশিষ্ট কোন বস্তুর প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে দুই সেণ্টিমিটার ত্বরণ সৃষ্টি করিতে কত বল প্রয়োজন ?—2 ডাইন (...) ; 4 ডাইন (...)।

(iii) ভরবেগ বলিতে কি বুঝায় ?—ভর ও গতিবেগের গুণফল (...) ; ভর ও গতিবেগের যোগফল (...)।

(iv) কোন গতিশীল বস্তুর উপরে ঘর্ষণ-জনিত বল কোন্ দিকে ক্রিয়া করে ?—বস্তুর গতির অভিমুখে (...) ; বস্তুর গতির বিপরীত দিকে (...)।

(v) সম-গতিবেগে চলমান বস্তুর উপরে কোন বল ক্রিয়া করে কি ?—হ্যাঁ (...) ; না (...)।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত উক্তিগুলি নির্ভুল কর :—

(i) কোন সচল বস্তুর — ও — অবস্থানের মধ্যে — দূরত্বকে বলা হয় বস্তুটির — পরিমাপ।

(ii) কোন বস্তুর গতিবেগ-বৃদ্ধির হারকে বলা হয় —।

(iii) যে-কোন বস্তুর নিজস্ব অবস্থা বজায় রাখিবার স্বাভাবিক প্রবণতাকে বলা হয় —।

(iv) কোন বস্তুর — পরিবর্তনের হার উহার উপর প্রযুক্ত বাহ্যিক বলের —।

(v) একটি বস্তু অপর কোন বস্তুর উপরে যে বল প্রয়োগ করে, দ্বিতীয় বস্তুটিও প্রথম বস্তুর উপরে তাহার — ও — বল প্রয়োগ করে।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কার্য, শক্তি ও ক্ষমতা

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. কার্য বলিতে কি বুঝায় ? উহার পরিমাপ কিভাবে নিরূপণ করা হয় ? কার্যের বিভিন্ন এককসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

2. ক্ষমতা কাহাকে বলে ? ওয়াট ও অশ্ব-ক্ষমতার সংজ্ঞা লিখ এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ কর।

3. কার্য ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক কি ? শক্তি বেশী থাকিলেই ক্ষমতা বেশী-না-ও হইতে পারে—ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

4. গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির সংজ্ঞা লিখ এবং প্রত্যেকের দুইটি করিয়া উদাহরণ দিয়া উহাদের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দাও।

5. যন্ত্র কাহাকে বলে ? যান্ত্রিক সুবিধা বলিতে কি বুঝায় গাণিতিক সূত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

6. বিভিন্ন শ্রেণীর লিভারের কার্যপ্রণালী উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। প্রত্যেক শ্রেণীর লিভারের ব্যবহারিক প্রয়োগের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

7. নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলির কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর লিভারের ন্যায় কার্য করে ?—(i) টিউবওয়েলের হাতল, (ii) যাঁতি, (iii) নৌকা বাহিবার দাঁড়, (iv) কাঁচি, (v) মানুষের হাত।

8. আনত তলের সাহায্যে কার্য করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয় কেন, তাহা চিত্রের সাহায্যে গাণিতিক সূত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

9. চক্র ও অক্ষ-দণ্ডকে যন্ত্র হিসাবে গণ্য করা হয় কেন? ইহা দ্বারা কি প্রকার যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় তাহা ব্যাখ্যা কর।

10. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(i) গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি, (ii) অশ্ব-ক্ষমতা, (iii) তৃতীয় শ্রেণীর লিভার, (iv) আনত তল, (v) গাড়ীতে চক্র ও অক্ষ-দণ্ডের ব্যবহার।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)।

1. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল, তাহা টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :—

(i) 1 পাউণ্ড ভরের একটি বস্তুকে অনুভূমিকভাবে ঠেলিয়া 1 ফুট দূরে সরাইতে, অথবা উহাকে খাড়া ভাবে 1 ফুট উপরে তুলিতে উভয় ক্ষেত্রেই কি সমান পরিমাণ কার্য করিতে হয়?—হ্যাঁ (...) ; না (...)।

(ii) দুইটি আনত তলের একটি অপেক্ষাকৃত বেশী খাড়া, অপরটি বেশী ঢালু—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি হইতে বেশী যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাইবে?—প্রথমটি হইতে (...) ; দ্বিতীয়টি হইতে (...)।

(iii) মাটিতে অবস্থিত দুইটি অসমান ভরের বস্তুর মধ্যে কোন্‌টির স্থিতিশক্তি বেশী? —অপেক্ষাকৃত ভারী বস্তুটির (...) ; অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা বস্তুটির (...) ; উভয়ের স্থিতিশক্তিই সমান (...)।

(iv) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে বল ও ভার আলম্বের আপেক্ষিকে কোন্ দিকে অবস্থান করে? —একই দিকে (...) ; পরস্পর বিপরীত দিকে (...)।

(v) চক্র ও অক্ষ-দণ্ডের সমন্বয় কোন্ ধরনের লিভারের ন্যায় কাজ করে?—প্রথম শ্রেণীর লিভার (...) ; তৃতীয় শ্রেণীর লিভার (...)।

2. নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, তাহা টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :—

(i) কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিলেই কিছু-না-কিছু কার্য নিষ্পন্ন করা হয়।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(ii) যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা এই যে, ইহাতে কম কার্য করিতে হয়।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(iii) তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধার পরিবর্তে যান্ত্রিক অসুবিধা ঘটে।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(iv) কোন চক্রের সহিত সংযুক্ত অক্ষ-দণ্ডটি যত মোটা হইবে, এইরূপ সমন্বয়ের যান্ত্রিক সুবিধা তত বৃদ্ধি পাইবে।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(v) নৌকা বাহিবার দাঁড় দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের ন্যায় কাজ করে—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত উক্তিগুলি নির্ভুল কর ঃ

(i) কোন বস্তুর উপর — প্রয়োগের ফলে যদি বস্তুটির — ঘটে, তাহা হইলে উহার উপর — করা হইল বলা হয়।

(ii) — বলের বিরুদ্ধে — পাউণ্ড ভরবিশিষ্ট কোন বস্তুকে খাড়াভাবে — ফুট উপরে তুলিতে যে কার্য করিতে হয়, তাহাকে বলে —।

(iii) কোন লিভারের যে বিন্দুটি সর্বদা — থাকে, তাহাকে বলা হয় উহার —।

(iv) যে লিভারে বল ও ভার আলম্বের — দিকে থাকে, কিন্তু — প্রয়োগ করা হয় আলম্বের অপেক্ষাকৃত — বিন্দুতে, তাহাকে বলা হয় — শ্রেণীর লিভার।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তাপ

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. তাপ কাহাকে বলে ? তাপ যে এক প্রকার শক্তি, তৎসম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তি আলোচনা কর।

2. তাপের প্রধান প্রধান উৎসসমূহ এবং উহাদের প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ উল্লেখ কর। 'সূর্যই হইল তাপের মূল উৎস'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

3. তাপমাত্রা বলিতে কি বুঝায় ? তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য সবিস্তারে আলোচনা কর।

4. কোন বস্তুর তাপের মোট পরিমাণ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

5. শক্তির বিভিন্ন রূপগুলি উল্লেখ কর এবং বিভিন্ন প্রকার শক্তির তাপ-শক্তিতে রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

6. শক্তির অবিনাশিতা সূত্রটি লিখ। তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক বলিতে কি বুঝায় ? তাপ-শক্তি ও যান্ত্রিক শক্তির পারস্পরিক রূপান্তরের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আলোচনা কর।

7. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(i) তাপ ও তাপমাত্রা, (ii) বস্তুর উপরে তাপের বিভিন্ন প্রভাব, (iii) তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক, (iv) শক্তির অন্যতম রূপ হিসাবে তাপ।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল, তাহা টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :—

(i) বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ কি ?—যান্ত্রিক ক্রিয়া (...) ; তড়িৎ-প্রবাহ (...) ; আলোক-শক্তি (...)।

(ii) দুইটি বস্তুকে পরস্পরের সংস্পর্শে রাখিলে তাপ সর্বদা কোন্ দিকে প্রবাহিত হয় ?—বৃহৎ বস্তু হইতে ক্ষুদ্র বস্তুতে (...) ; উষ্ণতর বস্তু হইতে শীতলতর বস্তুতে (...)।

(iii) 2 গ্রাম জলের তাপমাত্রা 2°C বৃদ্ধি করিতে কি পরিমাণ তাপ প্রয়োজন হইবে ?—2 ক্যালোরি (...) ; 4 ক্যালোরি (...)।

(iv) সমান ওজনের জল ও লোহা একই উনানের পার্শ্বে একই সময় রাখিয়া দিলে কোন্‌টির তাপমাত্রা বেশী বৃদ্ধি পাইবে?—লোহা (…) ; জল (…)।

(v) দুইটি বস্তুর মধ্যে তাপ-প্রবাহের মূল কারণ কি ?—তাপের পার্থক্য (…) ; তাপমাত্রার পার্থক্য (…)।

2. উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, তাহা টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :—

(i) তাপ প্রয়োগ করিলে যে-কোন বস্তুই আয়তনে প্রসারিত হয়। -ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(ii) পৃথিবীতে তাপের মূল উৎস হইল সূর্য।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(iii) একই তাপমাত্রায় সম-পরিমাণ সকল বস্তুর মোট তাপের পরিমাণ সমান।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(iv) একই পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তির বিনিময়ে সর্বদাই একই পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(v) একটি উষ্ণতর ও একটি শীতলতর বস্তুকে পরস্পরের সংস্পর্শে রাখিলে উষ্ণতর বস্তুটি হইতে শীতলতর বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ না উভয়ের মোট তাপ পরস্পর সমান হয়।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত উক্তিগুলি নির্ভুল কর :—

(i) তাপের — অস্তিত্ব নাই, ইহার কার্য করিবার — আছে ; অতএব তাপ মূলতঃ এক প্রকার —।

(ii) কোন বস্তুর তাপমাত্রা উহার — অবস্থা নির্দেশ করে। তাপ সর্বদা অধিকতর — বস্তু হইতে — বস্তুতে প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ না উভয়ের — সমান হয়।

(iii) — পরিমাণ তাপ পাইতে হইলে যে পরিমাণ — শক্তি ব্যয় করিতে হয়, তাহাকে বলা হয় তাপের —।

(iv) তাপ প্রয়োগ করিলে যে-কোন বস্তুর সংগঠক অণুসমূহের চাঞ্চল্য — পায় ও অণুগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ — পায় এবং এই কারণেই তাপ প্রয়োগে যে-কোন বস্তুর আয়তন — পাইয়া থাকে।

(v) সমান — বিশিষ্ট দুইটি বিভিন্ন বস্তুতে সমান তাপ প্রয়োগ করিলেও উহাদের — বৃদ্ধি সমান না-ও হইতে পারে।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আলোক

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. আলোক যে সরলরেখায় চলে, তাহা পরীক্ষার সাহায্যে কিরূপে প্রমাণ করিবে ? সূচীছিদ্র ক্যামেরার গঠন ও কার্যপ্রণালী সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

2. আলোকের প্রতিফলন বলিতে কি বুঝায় ? সমতল দর্পণে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব কিভাবে গঠিত হয়, উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে তাহা ব্যাখ্যা কর। প্রতিবিম্বের অবস্থান ও প্রকৃতি উল্লেখ কর।

3. আলোকের প্রতিফলনের সূত্রগুলি লিখ। পরীক্ষা দ্বারা সূত্রগুলি কিভাবে প্রমাণ করা যায়, তাহা বর্ণনা কর।

4. আলোকের প্রতিসরণ কাহাকে বলে ? প্রতিসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনা কর। আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলিতে কি বুঝায় তাহা ব্যাখ্যা কর।

5. আলোকের প্রতিসরণের সূত্রগুলি উল্লেখ কর এবং পরীক্ষা দ্বারা সূত্রগুলি কিভাবে প্রমাণ করা যায়, তাহা বর্ণনা কর।

6. লেন্স কাহাকে বলে ? লেন্সের আলোক-কেন্দ্র, প্রধান অক্ষ ও ফোকাস বলিতে কি বুঝায়, তাহা চিত্র আঁকিয়া বুঝাও। উত্তল লেন্সকে অভিসারী ও অবতল লেন্সকে অপসারী বলা হয় কেন, তাহা ব্যাখ্যা কর।

7. আলোকের বিচ্ছুরণ বলিতে কি বুঝায় ? বর্ণালী কাহাকে বলে ? বর্ণালী গঠনের একটি সহজ পরীক্ষা বর্ণনা কর।

8. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(i) আলোকের তরঙ্গ-প্রকৃতি, (ii) পেরিস্কোপ, (iii) সদ্ ও অসদ্ প্রতিবিম্ব, (iv) সংকট-কোণ, (v) বিবর্ধক কাঁচ, (vi) সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা, (vii) মরীচিকা, (viii) আলোকের বিচ্ছুরণ, (ix) বর্ণালী, (x) লেন্সের আলোক-কেন্দ্র।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. কোন্ উত্তরটির নির্ভুল, তাহা টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :—

(i) আলোকের প্রতিফলন কালে আপতন-কোণের তুলনায় প্রতিফলন-কোণ কিরূপ হয় ?—বেশী (…) ; সমান (…) ; কম (…)।

(ii) উত্তল লেন্সে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ আপতিত হইলে প্রতিসরণের পরে কিরূপ রশ্মিগুচ্ছ উৎপন্ন হয় ?—অভিসারী (…) ; সমান্তরাল (…) ; অপসারী (…)।

(iii) যে প্রতিবিম্ব চোখে দেখা যায়, কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না, তাহাকে কিরূপ প্রতিবিম্ব বলা হয় ?—সদ্ (…) ; অসদ্ (…)।

(iv) সূচী-ছিদ্র ক্যামেরায় কিরূপ প্রতিবিম্ব গঠিত হয় ?—খাড়া (…) ; উল্টানো (…)।

(v) ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে আলোকের প্রতিসরণকালে আলোক-রশ্মি কোন্ দিকে বাঁকিয়া যায় ?—অভিলম্বের দিকে (…) ; অভিলম্বের বিপরীত দিকে (…)।

2. উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, তাহা টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :—

(i) আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আলোক-উৎস ঘন মাধ্যমে অবস্থিত থাকে।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(ii) একটি পেন্সিলকে জলে আংশিক নিমজ্জিত করিলে উহাকে বাঁকা দেখায় ; ইহার মূল কারণ হইল আলোকের প্রতিফলন।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(iii) সাদা আলোক সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকের সমন্বয়ে গঠিত।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(iv) সমতল দর্পণে সদ্ প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(v) প্রিজমে প্রতিসরণের ফলে বেগুনী আলোকের তুলনায় লাল আলোক অপেক্ষাকৃত বেশী বাঁকে।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(vi) সূচী-ছিদ্র ক্যামেরার সম্মুখের ছিদ্রটি যত বড় করা হয়, প্রতিবিম্বটি তত বেশী স্পষ্ট হয়।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

৩. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তিগুলি নির্ভুল কর :—

(i) আলোক যতক্ষণ কোন একটি সুনির্দিষ্ট একক — ভিতর দিয়া চলে, ততক্ষণ তাহা সর্বদাই — পথে অগ্রসর হয় ; আলোক কখনই — পথে চলে না।

(ii) প্রতিফলনের ক্ষেত্রে — রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি — মাধ্যমে থাকে, কিন্তু প্রতিসরণের ক্ষেত্রে — রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মি — মাধ্যমে অবস্থান করে।

(iii) সাদা আলোক প্রিজমে — হইয়া পিছনে রক্ষিত কোন পর্দার উপর — বিভিন্ন বর্ণের যে আলোক-স্তর গঠন করে, তাহাকে বলা হয় —।

(iv) — রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি ও বিন্দুতে — উপর অঙ্কিত অভিলম্ব — তলে থাকে।

(v) কাঁচ হইতে বায়ুতে আলোক প্রবেশকালে — রশ্মিটি অভিলম্ব হইতে অপেক্ষাকৃত — সরিয়া যায়।

(vi) আলোক যখন এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন মাধ্যম দুইটির — আলোকের — পরিবর্তনকে — বলা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ঃ রসায়ন ঃ

পদার্থ (Matter)

পাঠ্যসূচী: (i) পদার্থের বিভিন্ন ভৌত অবস্থা; তিনটি অবস্থার অস্তিত্বের কারণ; স্ফুটনাংক ও গলনাংক; (ii) পদার্থের সনাক্তকরণ; ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম; পদার্থের বিভিন্ন ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক ধর্ম; (iii) পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন; রাসায়নিক পরিবর্তনের সহায়ক ও নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন উপায়· তাপ-উদ্গারী ও তাপ-শোষক বিক্রিয়া; (iv) মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ; ধাতু ও অধাতু।

পদার্থের ভৌত অবস্থা
(Physical States of Matter)

লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সাধারণ হিসাবে যাবতীয় পদার্থের মাত্র তিনটি ভৌতাবস্থা সম্ভব; যেমন—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা। যে-কোন পদার্থ স্বভাবতঃ এই **ত্রিবিধ** অবস্থার কোন একটিতে থাকে। মাটি, বালি, পাথর, গন্ধক, সোরা, লোহা প্রভৃতি **কঠিন** (solid) পদার্থ; জল, তেল, পারদ, স্পিরিট প্রভৃতি পদার্থ **তরল** (liquid); আর বায়ু, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি **গ্যাসীয়** (gaseous) পদার্থ। সাধারণ প্রাকৃতিক অবস্থায় বিভিন্ন পদার্থ ইহাদের কোন একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থায় থাকে।

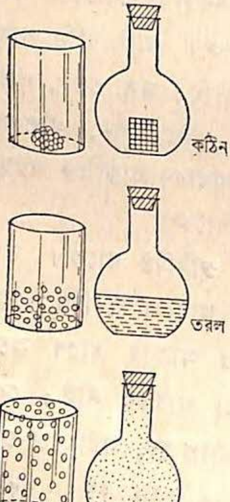
দেখা যায়, কঠিন পদার্থের আকার ও আয়তন সুনির্দিষ্ট থাকে। তরল পদার্থের কোন নির্দিষ্ট আকার থাকে না, কিন্তু উহার আয়তন সুনির্দিষ্ট; কোন তরল পদার্থ যে-পাত্রে রাখা যায়, উহা সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। পক্ষান্তরে, গ্যাসীয় পদার্থের কোন নির্দিষ্ট আকার, বা আয়তন নাই; কোন গ্যাস যে-পাত্রে রাখা যায়, উহা তাহার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে-কোন গ্যাস সর্বদা তাহার ধারক পাত্রের আকার ও আয়তন প্রাপ্ত হয়। পদার্থের বিভিন্ন ভৌতাবস্থার এইরূপ বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতা বস্তুতঃ তাহার ভৌত গঠনের বিভিন্নতার ফল মাত্র। ইহার মূল কারণ নিম্নে আলোচনা করা হইল।

পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থার কারণঃ পদার্থের ভৌত গঠনঃ (Reasons for existence of the three states: Physical structure of Matter)

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই উহার অসংখ্য ক্ষুদ্রতম কণিকার সমবায়ে গঠিত।

যে-কোন পদার্থের সমধর্মী ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণিকাকে বলা হয় পদার্থটির **অণু** (molecule)। যে-কোন পদার্থ তাহার এইরূপ অসংখ্য অণুর পাশাপাশি অবস্থানের ফলে গঠিত হইয়া থাকে। লবণের একটি দানাকে কোন কৌশলে ক্রমাগত ভাঙিয়া যদি এমন সূক্ষ্মতম কণিকায় পরিণত করা যায়, যখন প্রত্যেকটি কণিকাতে লবণের যাবতীয় গুণ ও ধর্ম বজায় থাকে, আরও ভাঙিলে লবণের গুণ ও ধর্ম আর থাকে না ; তাহা হইলে সেই সূক্ষ্মতম কণিকাই হইবে লবণের অণু। অণুকে ভাঙিলে পদার্থটির নিজস্ব সত্তা লোপ পায়, উহার সংগঠক মৌলিক পদার্থের **পরমাণু** (atom)-তে বিভক্ত হইয়া যায়।

কোন পদার্থের অণুগুলি কিন্তু পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংবদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ নিরেট অবস্থায় থাকে না, পরস্পরের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ফাঁক, বা ব্যবধান থাকে। পদার্থের সংগঠক অণুসমূহের এইরূপ পারস্পরিক ব্যবধানকে বলা হয় **আন্তঃআণবিক ব্যবধান** (inter-moleculer space)। এই ব্যবধানের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া অণুগুলি স্বভাবতঃ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করে; পদার্থের অণুসমূহের এই পারস্পরিক আকর্ষণকে বলা হয় **আন্তঃআণবিক আকর্ষণ** (inter-moleculer attraction)।



পদার্থের বিভিন্ন ভৌতাবস্থার ধারণা-চিত্র

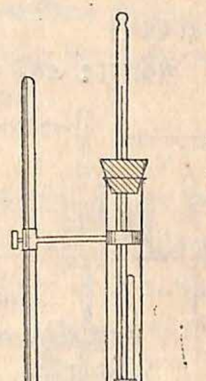
স্বাভাবিক অবস্থায়, অর্থাৎ সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা ও চাপে যে পদার্থের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ ও ব্যবধান যেরূপ থাকে, বস্তুতঃ তাহার উপরেই পদার্থটির স্বাভাবিক ভৌতাবস্থা নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে কোন পদার্থেরই নির্দিষ্ট কোন অবস্থা নাই; পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা ও চাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে সাধারণতঃ সকল পদার্থেরই আন্তঃআণবিক ব্যবধান ও আকর্ষণ পরিবর্তিত হইয়া উহার ভৌতাবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে কঠিন অবস্থায় পদার্থের আন্তঃ-আণবিক ব্যবধান সর্বাপেক্ষা কম এবং আন্তঃআণবিক আকর্ষণ সর্বাধিক থাকে। তরল পদার্থের অণুগুলির আন্তঃআণবিক ব্যবধান অপেক্ষাকৃত বেশী

এবং আন্তঃআণবিক আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম। আর গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা কম এবং আন্তঃআণবিক ব্যবধান সর্বাধিক হয়। পূর্ব-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্র হইতে পদার্থের আণবিক গঠন ও তাহার ত্রিবিধ অবস্থার উল্লিখিত মূল কারণ সম্পর্কে সহজে ধারণা করা যাইবে।

গলনাংক (Melting Point) :

সাধারণতঃ যে-কোন কঠিন, অদাহ্য পদার্থকে যথোপযুক্ত উত্তপ্ত করিলে তাহা তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়; এই পরিবর্তন-ক্রিয়াকে বলা হয় **গলন** (melting)। কোন কঠিন পদার্থ যে সুনির্দিষ্ট উষ্ণতা, বা তাপমাত্রায় গলে, তাহাকে বলা হয় ঐ পদার্থটির **গলনাংক** (melting point)। বিভিন্ন পদার্থের গলনাংকের মান বিভিন্ন; যেমন—লোহার গলনাংক 1530°C, কপারের 1068°C, ন্যাপ্‌থালিনের 80°C, খাদ্য-লবণের 815°C, বরফের 0°C ইত্যাদি। পরীক্ষাগারে ন্যাপ্‌থালিনের গলনাংক নির্ণয়ের একটি সহজ পরীক্ষা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

পরীক্ষা : একটি কাঁচ-নির্মিত একমুখ-বন্ধ কৈশিক নলের (capillary tube) কিছু অংশ ন্যাপথালিনের গুঁড়া দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। এই নলটিকে এখন রবার-বন্ধনীর সাহায্যে একটি থার্মোমিটারের সঙ্গে এমনভাবে আঁটিতে হইবে, যাহাতে থার্মোমিটারের পারদ-বাল্বটি কৈশিক নলের ন্যাপ্‌থালিন-পূর্ণ অংশের সঙ্গে জুড়িয়া থাকে। এইবার একটি দীর্ঘ-নাল কাঁচ-কুপীতে রক্ষিত জলে পরস্পর সংযুক্ত ঐ কৈশিক নল ও থার্মোমিটারটির নিম্নাংশ নিমজ্জিত রাখিয়া কাঁচ-কুপীর মুখে সংযুক্ত একটি কর্কের সাহায্যে উহাকে দণ্ডায়মান রাখিতে হইবে। এখন এই অবস্থায় কাঁচ-কুপীটিকে স্পিরিট-ল্যাম্পের মৃদু শিখায় ধীরে-ধীরে উত্তপ্ত করিতে হইবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা যাইবে, উত্তপ্ত জলের সংস্পর্শে থার্মোমিটারের পারদ-স্তম্ভ ক্রমে উপরে উঠিয়া তাপমাত্রা-বৃদ্ধি প্রকাশ করিতেছে। এইভাবে উষ্ণতা 80°C-এ পৌঁছিলে দেখা যাইবে, কৈশিক নলের ন্যাপ্‌থালিন গলিয়া স্বচ্ছ হইতে শুরু করিয়াছে এবং সম্যক



ন্যাপ্‌থালিনের গলনাংক নির্ণয়

ন্যাপ্থালিন গলিয়া তরল না হওয়া পর্যন্ত উষ্ণতা আর বাড়িতেছে না। ইহাতে বুঝা যায়, ন্যাপ্থালিনের **গলনাংক** হইল 80°C। উত্তাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখিলে ঐ তরল ন্যাপ্থালিনের তাপমাত্রা অবশ্য ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

এখন স্পিরিট-ল্যাম্পটি সরাইয়া কাঁচ-কুপীর জলকে ঠাণ্ডা হইতে দিলে দেখা যাইবে, তাপমাত্রা ধীরে-ধীরে হ্রাস পাইবার সময় থার্মোমিটারের পারদ-স্তম্ভ 80°C তাপাংকে কিছুক্ষণ স্থির থাকে ; এই অবস্থায় তরল ন্যাপ্থালিন জমিয়া কঠিন হইতে শুরু করে এবং কঠিন অবস্থায় রূপান্তর-ক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রা আর হ্রাস পায় না, 80°C-এই স্থির থাকে।

স্ফুটনাংক (Boiling Point) :

কোন তরল পদার্থ যে উষ্ণতায় ফুটিয়া বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, তাহাকে বলা হয় তরলটির **স্ফুটনাংক** (boiling point)। স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রত্যেক তরলেরই কোন সুনির্দিষ্ট স্ফুটনাংক থাকে ; যেমন—জলের স্ফুটনাংক 100°C, অ্যালকোহলের 68°C, ইথারের 34·5°C ইত্যাদি। পরীক্ষাগারে জলের স্ফুটনাংক নির্ণয়ের একটি সহজ পরীক্ষা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

পরীক্ষা : একটি কাঁচ-কুপীর মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ বিশুদ্ধ পাতিত জলে পূর্ণ করিতে হইবে। কুপীটির মুখ তিনটি ছিদ্রযুক্ত একটি কর্ক দ্বারা বন্ধ করিতে হইবে ; মধ্যবর্তী ছিদ্রে একটি থার্মোমিটার, এক পার্শ্বের ছিদ্রে একটি U-আকৃতি সরু কাঁচ-নল ও অপর পার্শ্বের ছিদ্রে বাষ্প-নির্গমনের জন্য একটি সমকোণী কাঁচ-নল থাকিবে। থার্মোমিটারটির পারদ-বাল্ব কুপীর জলের উন্মুক্ত তলের সামান্য উপরে থাকিতে হইবে, অপর নল দুইটির নিম্ন-প্রান্ত কর্কের ঠিক নীচে শেষ হইবে। এখন, U-নলটির বাহিরের খোলা-মুখে কিছু পারদ ঢালিলে নলটির দুই বাহুতে পারদ স্বভাবতঃ সমান উচ্চতায় থাকিবে। এই অবস্থায় সর্বসমেত কাঁচ-কুপীটিকে একটি তার-জালির উপরে স্থাপন করিয়া উহাকে বুনসেন দীপের শিখায় উত্তপ্ত করিতে হইবে। দেখা যায়,



জলের স্ফুটনাংক নির্ণয়

কুপীর জল ক্রমে উত্তপ্ত হইয়া তাহাতে বুদ্‌বুদ উঠিতে থাকে, পরে জলের মধ্যে উপরে-নীচে আলোড়ন দেখা দেয় এবং ক্রমে প্রচুর বাষ্প উত্থিত হইতে থাকে ; ইহাই হইল জলের **স্ফুটন** (boiling)। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এই অবস্থায় থার্মোমিটারটি 100°C তাপমাত্রা নির্দেশ করিতেছে ; এই তাপমাত্রাই হইল জলের **স্ফুটনাংক** (boiling point)। কুপীটির অভ্যন্তরভাগ জলীয় বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া অতিরিক্ত বাষ্প নির্গম-নলের পথে বাহির হইয়া যায় ; U-নলের দুই বাহুতে পারদ একই উচ্চতায় থাকিয়া ভিতরের বাষ্পীয় চাপ ও বাহিরের বায়ুচাপের সমতা প্রমাণ করে। লক্ষ্য করা যায়, সম্যক জল ফুটিয়া বাষ্পাকারে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত উহার উষ্ণতা স্ফুটনাংকে, অর্থাৎ 100°C-এর স্থির থাকে।

পদার্থের সনাক্তকরণ
(Identification of Matter)

রসায়ন-বিজ্ঞানে অজানা পদার্থকে জানা, অর্থাৎ কোন পদার্থের প্রকৃত রাসায়নিক স্বরূপ নির্ধারণ করিবার পদ্ধতিকে বলা হয় **অভীক্ষণ** (testing), বা **সনাক্তকরণ** (identification)। ইহার জন্য বিভিন্ন পদার্থের বিশেষ-বিশেষ গুণ, বা ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পদার্থের ধর্ম (Properties of Matter) **:**

পদার্থ মাত্রেরই সাধারণ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, বা গুণ থাকে, যাহাদের বলা হয় পদার্থ টির **ধর্ম** (properties)। একই ধর্ম একাধিক বিভিন্ন পদার্থে থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক পদার্থেরই এমন কিছু-কিছু বিশেষ-বিশেষ ধর্ম থাকে, যাহা অপর কোন পদার্থে থাকে না। কোন পদার্থের এইরূপ স্বকীয় অনন্য ধর্মগুলি লক্ষ্য করিয়া পদার্থটির সঠিক পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়।

পদার্থের ধর্ম দুই প্রকার ; যেমন, (a) ভৌত ধর্ম ও (b) রাসায়নিক ধর্ম।

(a) **ভৌত ধর্ম** (physical properties) **:** যে-সকল ধর্ম পদার্থের ভৌত প্রকৃতি, বা অবস্থার উপরে নির্ভরশীল, তাহাদের বলা হয় পদার্থের **ভৌত ধর্ম** (physical properties)। বিভিন্ন পদার্থের **স্পর্শগত** (touch) অনুভূতি বিভিন্ন ; গ্রাফাইট, ট্যাল্ক, বোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি স্পর্শ করিলে বেশ নরম, মোলায়েম ও পিচ্ছিল বোধ হয়, কিন্তু একখণ্ড প্রস্তর, বা চকের স্পর্শ-অনুভূতি যথেষ্ট অমসৃণ, খসখসে। বিভিন্ন পদার্থের **বর্ণের** (colour) মধ্যেও

যথেষ্ট বিভিন্নতা থাকে ; যেমন, সাধারণ খাদ্য-লবণ বর্ণহীন ; কিন্তু অনেক রাসায়নিক লবণই রঙীন, যেমন— ফেরাস সাল্‌ফাইড (FeS) কালো, ক্যাডমিয়াম সাল্‌ফাইড (CdS) হল্‌দে, মারকিউরিক আয়োডাইড (HgI_2) লাল, ইত্যাদি। বিভিন্ন ধাতুরও বর্ণ আলাদা ; সোনা (গোল্ড) উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ, রূপা (সিলভার) ও দস্তা (জিঙ্ক) সাদা, তামা লাল্‌চে, লোহা ধূসর। বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের বর্ণের মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় ; ক্লোরিন ঈষৎ হরিদ্রাভ-সবুজ বর্ণ, আয়োডিন-বাষ্প বেগুনী, নাইট্রোজেন-ডাইঅক্সাইড (NO_2) গ্যাস বাদামী।

কোন-কোন পদার্থের নিজস্ব এক প্রকার বিশেষ **গন্ধ** (smell) থাকে, যাহা দ্বারা অনেক সময় পদার্থটিকে সনাক্ত করা যায়। গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি বর্ণ ও গন্ধহীন ; ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, সালফার ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি তীব্র ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত, আবার হাইড্রোজেন-সালফাইডের গন্ধ পচা ডিমের ন্যায়। অনেক তরল পদার্থেরও বিশেষ-বিশেষ গন্ধ থাকে ; যেমন—ক্লোরোফর্ম, অ্যালকোহল, ইথার, ফেনল ইত্যাদি তরল পদার্থের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক বিভিন্ন গন্ধ আছে।

দ্রাব্যতা (solubility)-র বিচারেও বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা বর্তমান। বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন দ্রাবকে (solvent) দ্রবীভূত হয়। সাধারণ খাদ্যলবণ, চিনি ইত্যাদি জলে দ্রবণীয়, কিন্তু সাল্‌ফার, আয়োডিন ইত্যাদি জলে দ্রবীভূত হয় না ; সাল্‌ফার কার্বন-ডাইসালফাইড নামক তরলে এবং আয়োডিন কার্বন ডাইসালফাইড, বা কার্বন টেট্রাক্লোরাইড নামক তরলে দ্রবীভূত হয়। ক্লোরোফর্ম জলে দ্রবণীয় নহে, কিন্তু উহা অ্যালকোহল, ইথার বা কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের সহিত স্বচ্ছন্দে মেশে। বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যেও দ্রাব্যতার যথেষ্ট বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় ; যেমন—হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস জলে প্রায় অদ্রবণীয়, অথচ ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, বা সালফার-ডাইঅক্সাইড গ্যাস জলে সবিশেষ দ্রবণীয়।

কোন-কোন ধাতু, বিশেষতঃ লোহা (আয়রন) নিকেল ও কোবাল্ট চৌম্বক-ধর্মী, অর্থাৎ ইহারা চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয়। ম্যাগ্‌নেটাইট (magnetite) নামক কালো রঙের এক প্রকার লোহার অক্সাইড খনিজ পাওয়া যায়, যাহার **চৌম্বকীয় ধর্ম** (magnetic property) আছে ; এই শ্রেণীর

লৌহ-খনিজ মিশ্রিত প্রস্তর **লোড-স্টোন** (lode-stone) নামে পরিচিত, যাহা প্রাকৃতিক চুম্বকরূপে প্রাচীনকাল হইতেই ব্যবহৃত হইতেছে।

(b) **রাসায়নিক ধর্ম** (chemical properties): যে-সকল ধর্মে পদার্থের উপাদানগত মৌলিক পরিবর্তন লক্ষিত হয়, তাহাদের বলে পদার্থের **রাসায়নিক ধর্ম** (chemical properties)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন-কোন পদার্থকে যথোচিত **উত্তপ্ত করিলে** (on heating) উহার রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে; বায়ুর অক্সিজেনের সহিত উহার রাসায়নিক সংযোগ, অর্থাৎ দহন-ক্রিয়ার ফলে সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ গঠিত হয়। চিনি বায়ুতে যথেষ্ট উত্তপ্ত করিলে, অথবা মোম, কেরোসিন, স্পিরিট ইত্যাদি জ্বালাইলে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া যায়; কারণ, উহাদের সহিত বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া অদৃশ্য গ্যাসীয় পদার্থরূপে বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়। উত্তাপে বিভিন্ন পদার্থের এইরূপ উপাদানিক, বা রাসায়নিক রূপান্তরের মাধ্যমে উহাদের রাসায়নিক ধর্ম প্রকাশ পায়।

বিভিন্ন পদার্থের উপরে **অ্যাসিড ও ক্ষারের ক্রিয়া** (action of acids and alkalies) বিভিন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অধিকাংশ ধাতুই হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক, নাইট্রিক প্রভৃতি কোন-না-কোন খনিজ অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়; কিন্তু সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম ইত্যাদি কয়েকটি **সম্ভ্রান্ত ধাতু** (noble metals) ইহার ব্যতিক্রম; উহারা কোন একক অ্যাসিডে গলে না। এই ধাতুগুলি অবশ্য আয়তন-ভিত্তিক এক ভাগ গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ও তিন ভাগ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণে দ্রবীভূত হইয়া থাকে; এইরূপ মিশ্রণকে বলা হয় **অ্যাকোয়া রিজিয়া** (aqua regia)। সাধারণ খনিজ অ্যাসিডে অধিকাংশ রাসায়নিক পদার্থই দ্রবীভূত হয়, অর্থাৎ রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় বিভিন্ন লবণ উৎপন্ন হয়। আবার, ক্ষারজাতীয় পদার্থের সহিত বিভিন্ন অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায়ও বিভিন্ন লবণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় পদার্থের বিভিন্ন রাসায়নিক ধর্ম প্রকাশ পায় এবং ইহার সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের সনাক্তকরণ সম্ভব হয়।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন
(Physical and Chemical Changes)

পৃথিবীতে অহরহঃ নানা ভাবে পদার্থের নানা রূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। উত্তপ্ত করিলে জল বাষ্পীভূত হয়, ঠাণ্ডা করিলে জমিয়া কঠিন বরফে পরিণত হয়। জলে চিনি, বা লবণ যোগ করিলে স্বচ্ছ দ্রবণ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম ধাতব তারের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ চালাইলে তাহা উত্তপ্ত ও ভাস্বর হইয়া উঠে। আবার, আর্দ্র বায়ুতে কিছুকাল রাখিলে লোহায় মরিচা ধরে; কাঠ, বা কয়লা পোড়াইলে সামান্য ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। এই সকল পরিবর্তন লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝা যায়, পদার্থের পরিবর্তন, বা রূপান্তর দুই প্রকার; যেমন—

(i) **ভৌত পরিবর্তন** (Physical Change) : জল, বাষ্প ও বরফ রাসায়নিক বিচারে মূলতঃ একই; উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে জলের কেবল ভৌত অবস্থাগত রূপান্তর ঘটে। চিনি, বা লবণের দ্রবণ উত্তপ্ত করিলে জল বাষ্পীভূত হইয়া উবিয়া গিয়া চিনি, বা লবণ আবার কঠিন আকারে ফিরিয়া পাওয়া যায়। তড়িৎ-প্রভাবে প্রদীপ্ত ধাতব তার তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করিলে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে; তারের কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। এই সকল ক্ষেত্রে পদার্থের রাসায়নিক উপাদানের কোনরূপ মৌলিক পরিবর্তন ঘটে না; পদার্থটির সাময়িক একটি ভৌত রূপান্তর ঘটে মাত্র, মূল পদার্থ একই থাকে। পদার্থের ভৌত অবস্থাগত এইরূপ পরিবর্তনকে বলা হয় **ভৌত পরিবর্তন**।

(ii) **রাসায়নিক পরিবর্তন** (Chemical Change) : লোহায় যে মরিচা ধরে তাহা লোহা নহে, সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ,—লোহার একটি অক্সাইড যৌগ; মরিচা হইতে লোহা পুনরুদ্ধার করা দুঃসাধ্য। কয়লা, বা কাঠ পোড়াইলে যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে তাহা কয়লা, বা কাঠ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; সেই ভস্ম হইতে কয়লা, বা কাঠ আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালাইলে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে পদার্থের উপাদানগত স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। এইরূপ যে-সকল পরিবর্তনের ফলে পদার্থের মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়া পৃথক ধর্ম-বিশিষ্ট সম্পূর্ণ নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহাদের বলে **রাসায়নিক পরিবর্তন**।

পদার্থের উক্ত দ্বিবিধ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে সংক্ষেপে তুলনামূলক আলোচনা করা হইল।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
1. পদার্থের উপাদানগত কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না, মূল পদার্থটি পরিবর্তিত ভিন্ন অবস্থায় থাকে মাত্র।	1. পদার্থের উপাদানগত মৌলিক পরিবর্তন ঘটে এবং এক, বা একাধিক নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়।
2. ভৌত পরিবর্তন অস্থায়ী ; পরিবর্তনের কারণ, যথা চাপ, তাপ, দ্রাবক, তড়িৎ-শক্তি প্রভৃতি অপসারিত করিলে পদার্থটি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে।	2. রাসায়নিক পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ; পরিবর্তনের কারণ, বা সহায়ক অবস্থার অপসারণেও উৎপন্ন পদার্থকে সহজে মূল পদার্থে পরিণত করা যায় না।
3. ইহাতে কেবল পদার্থের ভৌত ধর্মের পরিবর্তন ঘটে, রাসায়নিক ধর্ম ও উপাদানিক গঠন অপরিবর্তিত থাকে।	3. পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক উভয় প্রকার ধর্মই পরিবর্তিত হয় এবং পদার্থটির মৌলিক রূপান্তর ঘটে।
4. ভৌত পরিবর্তনে উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতেও পারে, না-ও পারে।	4. রাসায়নিক পরিবর্তনে উষ্ণতার হ্রাস, বা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ; ইহাতে তাপ উদ্ভূত, বা শোষিত হইবেই।

রাসায়নিক পরিবর্তনের সহায়ক, বা নিয়ন্ত্রক বিষয়সমূহ :
(Factors influencing Chemical Action)

বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়া কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ শর্ত (condition) অনুযায়ী সম্পন্ন হয় ; কারণ, বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া বিভিন্ন উপায়, বা পদ্ধতিতে সংঘটিত হইয়া থাকে। রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটনের সহায়ক বিভিন্ন উপায়গুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

(i) **সংস্পর্শ** (Contact) : যে-কোন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাইতে হইলে বিক্রিয়ক পদার্থগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংস্পর্শ, বা সংযোগ অবশ্যই প্রয়োজন। বিক্রিয়ক পদার্থসমূহ পরস্পরের সংস্পর্শে না আসিলে কোন বিক্রিয়াই সম্ভব হয় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক খণ্ড আয়োডিনকে এক টুকরা ফস্‌ফরাসের পার্শ্বে রাখিলে কোন বিক্রিয়া ঘটে না ; কিন্তু ফস্‌ফরাসের সহিত আয়োডিন মিশাইলে, অর্থাৎ উভয়ের সংস্পর্শ ঘটাইলেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ফস্‌ফরাস জ্বলিয়া উঠে এবং আয়োডিনের সংযোগে ফস্‌ফরাস ট্রাইআয়োডাইড যৌগ উৎপন্ন হয় : $4P + 6I_2 = 4PI_3$ ।

(ii) **দ্রবণ** (Solution): কোন-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হইলে বিক্রিয়ক পদার্থগুলিকে কোন উপযুক্ত দ্রাবকে, সাধারণতঃ জলে, দ্রবীভূত করিতে হয়; শুষ্ক অবস্থায় তাহাদের বিক্রিয়া ঘটে না। জলীয় দ্রবণে পদার্থগুলির সংস্পর্শ আরও নিবিড় হয়, যাহার ফলে ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শের দরুণ পারস্পরিক বিক্রিয়া সহজতর হইয়া থাকে।

সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ($NaHCO_3$) ও টার্টারিক অ্যাসিডের ($C_4H_6O_6$) শুষ্ক মিশ্রণে [ইহাকে বলা হয় সিড্‌লিজ পাউডার, (Seidliz powder)] পদার্থ দুইটির মধ্যে কোন বিক্রিয়া হয় না; কিন্তু মিশ্রণটি জলে দ্রবীভূত করিলে সঙ্গে-সঙ্গে উভয়ের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হইতে থাকে:

$$2NaHCO_3 + C_4H_6O_6 = Na_2C_4H_4O_6 + 2H_2O + 2CO_2$$

(iii) **তাপ** (Heat): সাধারণতঃ উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে যে-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগ না করিলে রাসায়নিক ক্রিয়া কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পারদ, বা মার্কারি বায়ু, বা অক্সিজেনের মধ্যে উত্তপ্ত করিলে মার্কিউরিক অক্সাইডের লাল চূর্ণ (পারদ-ভস্ম, HgO) পাওয়া যায়; আরও তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিলে ইহা আবার বিয়োজিত হইয়া পুনরায় মার্কারি ও অক্সিজেনে পৃথক হইয়া যায়:

$$2HgO + \text{তাপ} = 2Hg + O_2$$

(iv) **অনুঘটন** (Catalysis): কোন-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বিশেষ-বিশেষ কোন পদার্থের উপস্থিতি মাত্রেই ত্বরান্বিত, বা মন্দীভূত হয়; অথচ পদার্থ টি সেই বিক্রিয়ায় কোনরূপ অংশ গ্রহণ করে না, তাহার রাসায়নিক, বা পরিমাণগত কোন পরিবর্তনও ঘটে না; উহা যেমন ছিল তেমনিই থাকে। এইরূপ পদার্থকে বলা হয় **অনুঘটক** (catalyst) এবং এই প্রক্রিয়াকে বলে **অনুঘটন** (catalysis)। অনুঘটন-ক্রিয়া বস্তুতঃ দুই প্রকার। যে-ক্ষেত্রে অনুঘটকের উপস্থিতির ফলে বিক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়, তাহাকে বলে **ধনাত্মক অনুঘটন** (positive catalysis); সাধারণভাবে ইহাকেই **অনুঘটন** বলা হয়। পক্ষান্তরে, যে-ক্ষেত্রে অনুঘটকের প্রভাবে বিক্রিয়ার গতিবেগ মন্দীভূত হয়, তাহাকে বলে **ঋণাত্মক অনুঘটন**, বা **মন্দন** (negative catalysis)। যাহা হউক, অনুঘটন-ক্রিয়ার মূল শর্ত এই যে, অনুঘটক ব্যতিরেকেও বিক্রিয়াটি

অবশ্যই সংঘটিত হইতে হইবে ; অনুঘটকের প্রভাবে কেবল বিক্রিয়াটির গতিবেগ পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

পটাসিয়াম ক্লোরেটকে যথেষ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিলে তাহা বিয়োজিত হইয়া অক্সিজেন গ্যাস বিমুক্ত হয়। পক্ষান্তরে, পটাসিয়াম ক্লোরেটের সহিত কিছু পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2) মিশাইলে অনেক কম তাপমাত্রায়ই পটাসিয়াম ক্লোরেটের বিয়োজন-ক্রিয়া যথেষ্ট দ্রুত নিষ্পন্ন হয় ; কিন্তু বিক্রিয়া-অন্তে দেখা যায়, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের রাসায়নিক গঠন, বা পরিমাণের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না :

$$2KClO_3\ [+MnO_2] = 2KCl + 3O_2\ [+MnO_2]$$

পটাসিয়াম ক্লোরেটের তাপীয় বিয়োজন-ক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ধনাত্মক অনুঘটকের কাজ করে।

হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) একটি অস্থায়ী তরল যৌগ ; উহা সাধারণ তাপমাত্রাতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যথেষ্ট দ্রুত বিয়োজিত হইয়া জল ও অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয় : $2H_2O_2 = 2H_2O + O_2$। কিন্তু হাইড্রোজেন পারক্সাইডের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ গ্লিসারল মিশাইলে উহার বিয়োজন-ক্রিয়ার হার যথেষ্ট হ্রাস পায়, অর্থাৎ যৌগটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বিয়োজন-ক্রিয়ায় গ্লিসারল ঋণাত্মক অনুঘটকের কাজ করে।

তাপ-উদ্গারী ও তাপ-শোষক বিক্রিয়া
(Exothermic and Endothermic Reactions)

রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে কেবল যে এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয় তাহাই নহে, পদার্থের তাপীয় অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। বস্তুতঃপক্ষে, যে-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায়ই তাপের কিছু-না-কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই হিসাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া দুই প্রকার ;—(i) তাপ-উদ্গারী (Exothermic) ও (ii) তাপ-শোষক (Endothermic) বিক্রিয়া।

(i) **তাপ-উদ্গারী বিক্রিয়া (Exothermic Reactions)** : যে-সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তাহাদের বলা হয় তাপ-উদ্গারী বিক্রিয়া।

কার্বন, বা কয়লার দহনে কার্বনের সহিত অক্সিজেনের সংযোগে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্গে প্রচুর তাপের উদ্ভব ঘটে: $C + O_2 = CO_2 + 97,000$ ক্যালোরি তাপ। অনুরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কাঠ, মোম, পেট্রোল প্রভৃতির দহনেও প্রচুর তাপের উদ্ভব হইয়া থাকে।

শুষ্ক পোড়া-চুন, বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO)-এর সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় কলি-চুন বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড $Ca(OH)_2$ উৎপন্ন হয় এবং তাহা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে; ইহাও একটি তাপ-উদ্গারী বিক্রিয়া।

(ii) **তাপ-শোষক বিক্রিয়া (Endothermic Reactions):** যে-সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয়, অর্থাৎ বিক্রিয়ার ফলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়, তাহাদের বলে **তাপ-শোষক বিক্রিয়া**। কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস উত্তপ্ত কোক-কয়লার উপর দিয়া প্রবাহিত করিলে উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাস উৎপন্ন হয়; সেই সঙ্গে যথেষ্ট তাপ শোষিত হয় এবং ইহার ফলে কোক-কয়লার তাপমাত্রা ক্রমে হ্রাস পায়: $CO_2 + C = 2CO - 39,000$ ক্যালোরি তাপ। ইহা একটি তাপ-শোষক বিক্রিয়া।

বৈদ্যুতিক আর্ক-শিখার (electric arc) মধ্য দিয়া বায়ু প্রবাহিত করিলে বায়ুর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের রাসায়নিক সংযোজনের ফলে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহা তাপ-শোষক বিক্রিয়ার আর একটি দৃষ্টান্ত: $O_2 + N_2 = 2NO - 43,200$ ক্যালোরি তাপ।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ
(Elements and Compounds)

পৃথিবীতে দৃশ্য-অদৃশ্য অগণিত পদার্থ রহিয়াছে। বিভিন্ন পদার্থকে নানা-ভাবে রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষাদি করিয়া জানা গিয়াছে, উপাদানিক গঠন হিসাবে যাবতীয় পার্থিব পদার্থকে মূলতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ।

মৌলিক পদার্থ (Elements): যে-সকল পদার্থ একটি মাত্র উপাদানে গঠিত, কোন রকম ভৌত, বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করিয়াও যাহাদের মধ্যে পৃথক গুণ ও ধর্ম-বিশিষ্ট অপর কোন পদার্থ

পাওয়া যায় না, তাহাদের বলা হয় মৌলিক পদার্থ, বা মৌল (element)। লোহা, সোনা, পারদ, তামা, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ; কারণ, ইহারা একক মূল পদার্থে গঠিত বলিয়া ইহাদের মধ্যে অপর কোন ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। কোন প্রকার বিশ্লেষণেও বিশুদ্ধ লোহা হইতে লোহা, হাইড্রোজেন হইতে হাইড্রোজেন ব্যতীত অপর কোন ভিন্ন পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে না।

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের মূল উপাদান এইরূপ কয়েকটি মাত্র মৌলিক পদার্থ। মৌলিক পদার্থের সংখ্যা অতি সীমিত; এযাবৎ মাত্র 104-টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার 92-টি মৌল স্বাভাবিক অবস্থায় পৃথিবীতে পাওয়া যায়; অবশিষ্টগুলি কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করা হইয়াছে—যেমন, কুরিয়াম (Curium), ক্যালিফোর্নিয়াম (Californium) ইত্যাদি। এই সকল মৌল অস্থায়ী বলিয়া পৃথিবীতে ইহাদের স্বাভাবিক অস্তিত্ব নাই। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র মৌল পৃথিবীতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়; অবশিষ্ট অধিকাংশ মৌল অপরাপর বিভিন্ন মৌলের সহিত যুক্ত হইয়া যৌগিক পদার্থের আকারে রহিয়াছে।

যৌগিক পদার্থ (Compounds): যাবতীয় পার্থিব পদার্থের মধ্যে বস্তুতঃ মাত্র 92-টি পদার্থ মৌলিক শ্রেণীভুক্ত; অবশিষ্ট সকল পদার্থই দুই, বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের পারস্পরিক রাসায়নিক মিলনে গঠিত কোন যৌগিক পদার্থ, বা **যৌগ**। সুতরাং উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করিলে এই ধরনের যে-কোন যৌগ হইতে ভিন্ন প্রকৃতি ও ধর্মবিশিষ্ট একাধিক বিভিন্ন মৌল পাওয়া যাইবেই। অতএব বলা যায়, **যে বিশুদ্ধ ও সমসত্ত্ব পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে একাধিক বিভিন্ন মৌল পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় যৌগিক পদার্থ, বা যৌগ** (compound)। কোন যৌগে তাহার সংগঠক মৌল উপাদানগুলির কোন গুণ, বা ধর্ম বর্তমান থাকে না, মৌলগুলি পরস্পর একীভূতভাবে মিলিয়া সম্পূর্ণ পৃথক একটি নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, জল একটি যৌগিক পদার্থ; কারণ, জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে উহা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি মৌলিক গ্যাসে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। হাইড্রোজেন দাহ্য গ্যাস, আর অক্সিজেন গ্যাস দাহক; কিন্তু ইহাদের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন জলের দাহ্য, বা

দাহক কোন ধর্মই নাই,—পরন্তু, জল একটি তরল পদার্থ। অনুরূপভাবে, সোডিয়াম ক্লোরাইড, বা খাদ্য-লবণ নোন্‌তা স্বাদযুক্ত, কিন্তু উহার মৌলিক উপাদানদ্বয় সোডিয়াম ও ক্লোরিনের কোনটিই খাওয়া চলে না; সুতরাং খাদ্য-লবণ অবশ্যই একটি যৌগিক পদার্থ।

একাধিক মৌলের পারস্পরিক রাসায়নিক মিলনে যৌগের সৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু মৌলগুলি যে-কোন অনুপাতে পরস্পর যুক্ত হয় না। দুই, বা ততোধিক মৌল উহাদের ওজন, বা আয়তনের কোন **সুনির্দিষ্ট অনুপাতে** পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া যৌগ উৎপন্ন করে, ইহাই রাসায়নিক সংযোগের নিয়ম; যেমন — হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌল দুইটির ওজন-ভিত্তিক 1 : 8 অনুপাতে রাসায়নিক মিলনের ফলে যৌগিক পদার্থ জল উৎপন্ন হয়; কোন একটি মৌল এই অনুপাত অপেক্ষা অতিরিক্ত থাকিলে তাহা অপরিবর্তিত অবিকৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। রাসায়নিক সংযোগের এই নিয়মের কখনই কোন ব্যতিক্রম ঘটা সম্ভব নহে।

মৌলিক, বা যৌগিক, যে-কোন পদার্থ ই উহার অসংখ্য অণুর পাশাপাশি সংঘবদ্ধ অবস্থানের ফলে গঠিত। অণু হইল **যে-কোন পদার্থের** ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণিকা, যাহাতে পদার্থটির যাবতীয় গুণ ও ধর্ম বজায় থাকে। অণুকে আরও ভাঙিলে পাওয়া যায় পরমাণু, কিন্তু উহাতে মূল পদার্থটির গুণ, বা ধর্ম আর অক্ষুণ্ন থাকে না। পরমাণু হইল **মৌলিক পদার্থের** ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা, যাহার কোন **স্বাধীন** অস্তিত্ব নাই। যে-কোন যৌগিক পদার্থের অণু একাধিক (অন্ততঃপক্ষে দুইটি) বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু লইয়া গঠিত; কিন্তু কোন নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থের অণুতে কেবলমাত্র ঐ মৌলটিরই পরমাণু থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌল দুইটির প্রত্যেকটির অণু দুইটি করিয়া নিজ-নিজ পরমাণুর সমবায়ে গঠিত; কিন্তু যৌগিক পদার্থ জলের এক-একটি অণুতে একটি অক্সিজেন পরমাণু ও দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে। এই হিসাবে অণু দুই প্রকার;—**মৌলিক অণু ও যৌগিক অণু**।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতাসমূহের নিম্নলিখিতরূপ তুলনা করা যাইতে পারে।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের তুলনা

মৌলিক পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
1. মৌলিক পদার্থের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত; স্থায়ী প্রাকৃতিক মৌলের সংখ্যা মাত্র 92-টি।	1. যৌগিক পদার্থের সংখ্যা অগণিত; পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থ ই যৌগিক।
2. মৌলিক পদার্থ একক ও স্বাভাবিক মূল বস্তু; কোন প্রকার বিশ্লেষণেই তাহার মধ্যে ভিন্ন ধর্ম-বিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না।	2. যৌগিক পদার্থ একাধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিলনে গঠিত; কাজেই যে-কোন যৌগিক পদার্থকে উপযুক্ত রূপে বিশ্লেষণ করিয়া সংগঠক বিভিন্ন মৌল উপাদানে বিভক্ত করা যায়।
3. স্থায়ী প্রাকৃতিক মৌলগুলি কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়ই সৃষ্টি করা যায় না; প্রাকৃতিক যৌগ হইতে পৃথক করা যায় মাত্র।	3. যৌগিক পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা যায়; বিভিন্ন মৌলের সুনির্দিষ্ট আনুপাতিক রাসায়নিক মিলনের ফলে বিভিন্ন যৌগ গঠিত হয় এবং গঠন-কালে তাপীয় পরিবর্তন ঘটে।
4. মৌলিক পদার্থের অণু একই ধরনের পরমাণুর সমবায়ে গঠিত; যে-কোন মৌলের অণু সেই মৌলেরই এক, বা একাধিক পরমাণুর সমষ্টি মাত্র।	4. যে-কোন যৌগিক পদার্থের অণু একাধিক বিভিন্ন মৌলের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর সমবায়ে গঠিত।

ধাতু ও অ-ধাতু
(Metals and Non-metals)

মৌলিক পদার্থগুলিকে তাহাদের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের প্রভেদ অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে;—**ধাতু** (metals) ও **অ-ধাতু** (non-metals)। কোন-কোন মৌলের ধর্ম অবশ্য ধাতু ও অ-ধাতুর মাঝামাঝিও হয়, উভয়ের ধর্মই তাহাতে কিছু-কিছু বর্তমান থাকে; এই সকল মৌলিক পদার্থকে বলা হয় উপ-ধাতু, বা ধাতুকল্প (metalloid)।

পৃথিবীতে মোট মৌলিক পদার্থের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ধাতু, অবশিষ্টগুলি অ-ধাতু। সাধারণতঃ ধাতু মাত্রেই কঠিন, উজ্জ্বল ও অপেক্ষাকৃত ভারী। ধাতু আঘাতে প্রসারিত হয়, ভাঙে না; উত্তাপে নরম হয়, টানিলে বাড়ে। ধাতুর

এইরূপ কাঠিন্য, ঔজ্জ্বল্য, ঘাতসহতা, অ-ভঙ্গুরতা, প্রসার্যতা প্রভৃতি ভৌত ধর্ম অ-ধাতুতে সচরাচর দেখা যায় না। বিভিন্ন রাসায়নিক ধর্মের বিচারে ধাতু ও অ-ধাতুর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। সোনা, রূপা, তামা, লোহা, টিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি **ধাতুর** পর্যায়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, কার্বন, ফসফরাস, সালফার, আয়োডিন, ব্রোমিন, ক্লোরিন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি **অ-ধাতু** শ্রেণীভুক্ত। আর, অ্যান্টিমনি, বিস্মাথ, আর্সেনিক প্রভৃতি কয়েকটি মৌলে ধাতু ও অ-ধাতু উভয়ের ধর্মই কিছু-কিছু লক্ষ্য করা যায় ; ইহাদের বলা হয় **ধাতুকল্প**।

যাহা হউক, যে-সকল ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে মৌলগুলিকে ধাতু ও অ-ধাতুতে বিভক্ত করা হইয়াছে নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা হইল ;

ধাতু ও অ-ধাতুর পার্থক্য :

1. স্বাভাবিক অবস্থায় ধাতুগুলি সাধারণতঃ কঠিন অবস্থায় থাকে, সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় কোন ধাতুই গ্যাসীয় হয় না ; আর অ-ধাতুগুলি কঠিন ও গ্যাসীয় দুই-ই হইতে পারে। **ব্যতিক্রম :** ধাতুর মধ্যে পারদ ও অ-ধাতুর মধ্যে ব্রোমিন তরল অবস্থায় থাকে।

2. ধাতু সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত ভারী এবং উচ্চ স্ফুটনাংক ও গলনাংক-বিশিষ্ট হয় ; অ-ধাতুগুলি অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা এবং নিম্ন গলনাংক ও স্ফুটনাংক-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। **ব্যতিক্রম :** সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতু যথেষ্ট হাল্‌কা এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন গলনাংক ও স্ফুটনাংক-বিশিষ্ট।

3. ধাতু-মাত্রেরই এক প্রকার বিশেষ ধাতব ঔজ্জ্বল্য (metallic lustre) থাকে ; অ-ধাতুর সাধারণতঃ এইরূপ কোন ঔজ্জ্বল্য থাকে না। **ব্যতিক্রম :** আয়োডিন ও হীরক অ-ধাতু হইলেও ধাতুর ন্যায় উজ্জ্বল এবং আলোক-প্রতিফলনে সক্ষম।

4. ধাতু মাত্রেই সাধারণতঃ ঘাতসহ, প্রসারণশীল ও অভঙ্গুর হয়। উহা উত্তাপে নরম হয় ও গলে, আঘাতে ভাঙে না, প্রসারিত হয় এবং উহাকে টানিয়া সরু তারে পরিণত করা যায়। অ-ধাতুর এইরূপ ঘাতসহতা, প্রসার্যতা ও অ-ভঙ্গুরতা কোন ক্ষেত্রেই দেখা যায় না।

5. ধাতু সাধারণতঃ তড়িৎ ও তাপের সু-পরিবাহী, আর অ-ধাতুগুলি

ৎ-পরিবাহী। **ব্যতিক্রম**ঃ পারদ ধাতু-শ্রেণীভুক্ত হইলেও উহার তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা অতি সামান্য ; আবার, গ্র্যাফাইট ও গ্যাস-কার্বন অ-ধাতু হইলেও উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ।

6. ধাতু মাত্রেই **ধন-তড়িদ্বাহী** (electro-positive), অর্থাৎ ধাতব যৌগের তড়িৎ-বিশ্লেষণ কালে ধাতু সর্বদাই **ঋণ-তড়িৎদ্বার**, বা ক্যাথোডে (cathode) যায়। পক্ষান্তরে, অ-ধাতুগুলি **ঋণ-তড়িদ্বাহী** (electro-negative) এবং কোন যৌগের তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যৌগের অ-ধাতব অংশ **ধন-তড়িৎদ্বার**, বা অ্যানোডে (anode) বিমুক্ত হয়। **ব্যতিক্রম**ঃ হাইড্রোজেন অ-ধাতু হইয়াও ধাতুর ন্যায় ধন-তড়িদ্বাহী।

7. ধাতু সাধারণতঃ হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক, নাইট্রিক ইত্যাদি খনিজ অ্যাসিডে (mineral acids) দ্রবীভূত হইয়া থাকে ; অ-ধাতু সচরাচর সাধারণ তাপমাত্রায় কোন খনিজ অ্যাসিডে আক্রান্ত হয় না। **ব্যতিক্রম**ঃ সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু কোন একক খনিজ অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় না ; উহাদের দ্রবীভূত করিতে হইলে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের আয়তন-ভিত্তিক 3 : 1 মিশ্রণ (**অ্যাকোয়া রিজিয়া**, Aqua Regia) প্রয়োজন হয়।

8. ধাতব অক্সাইড সাধারণতঃ ক্ষার-ধর্মী ও অ-ধাতব অক্সাইড অ্যাসিড-ধর্মী হইয়া থাকে ; অর্থাৎ ধাতব অক্সাইড অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ায় এবং অ-ধাতব অক্সাইড ক্ষারের সহিত বিক্রিয়ায় লবণ ও জল গঠন করে। **ব্যতিক্রম**ঃ জল অ-ধাতুর অক্সাইড, অর্থাৎ হাইড্রোজেনের অক্সাইড হইলেও উহার অ্যাসিড, বা ক্ষারীয় কোন ধর্মই নাই। আবার, টিন, জিংক, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর অক্সাইড যৌগের অ্যাসিড ও ক্ষারীয় উভয় ধর্মই বর্তমান।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে, মৌলগুলির এইরূপ শ্রেণীবিভাগ তেমন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নহে ; ধাতু ও অ-ধাতুগুলির ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই কিছু-কিছু ব্যতিক্রম রহিয়াছে। ধাতু ও অ-ধাতুর প্রধান-প্রধান ধর্মগুলি যাহাতে যেমন প্রাধান্য লাভ করে তাহাকে তদনুযায়ী ধাতু, বা অ-ধাতু বলা হয়।

দ্রবণ ও দ্রাব্যতা
(Solution and Solubility)

পাঠ্যসূচী: দ্রবণ : দ্রাবক ও দ্রাব ; সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ ; তাপমাত্রার সহিত দ্রাব্যতার সম্পর্ক।

সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা জানি, লবণ, চিনি, সোরা প্রভৃতি কঠিন পদার্থ, অথবা অ্যালকোহল, গ্লিসারিন প্রভৃতি তরল পদার্থে জল মিশাইলে পদার্থগুলি জলে গলিয়া-মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায় ; জল যেমন স্বচ্ছ পরিষ্কার ছিল দৃশ্যতঃ তেমনই থাকে। কেবল জলই নহে, বিভিন্ন তরল পদার্থে বিভিন্ন কঠিন, তরল, বা গ্যাসীয় পদার্থ এইরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া দৃশ্যতঃ একীভূত হইয়া যায় ; যেমন — কার্বন ডাইসাল্‌ফাইডে সাল্‌ফার, অ্যালকোহলে আয়োডিন, জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রভৃতি।

দ্রবণ : দ্রাবক ও দ্রাব
(Solution : Solvent and Solute)

দুই, বা ততোধিক পদার্থ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া-মিশিয়া সমসত্ব মিশ্রণ গঠন করিলে তাহাকে বলা হয় **দ্রবণ** (Solution)। দ্রবণ বস্তুতঃ এক প্রকার **সমসত্ব** (homogenous) মিশ্র পদার্থ ; সংগঠক পদার্থসমূহের অণুগুলি ইহাতে সর্বত্র সমভাবে মিশিয়া থাকে, অর্থাৎ দ্রবণের যে-কোন অংশেই পদার্থগুলির অনুপাত সমান হয়। যে পদার্থের মধ্যে অপর কোন পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া দ্রবণ গঠিত হয়, তাহাকে বলা হয় **দ্রাবক** (Solvent) ; আর, যে-পদার্থটি দ্রাবকের মধ্যে দ্রবীভূত হয়, তাহাকে বলে **দ্রাব** (Solute)। অতএব বলা যায় : **দ্রবণ = দ্রাবক + দ্রাব।**

দ্রবণ বলিতে সাধারণতঃ কোন তরল দ্রাবকে কঠিন, তরল, বা গ্যাসীয় দ্রাবের সমসত্ব মিশ্রণকে বুঝায় ; যেমন—অ্যালকোহল, বা স্পিরিটে গালা ; জলে সোডা, চিনি, গ্লিসারিন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস প্রভৃতি। সাধারণতঃ তরল দ্রবণ, বিশেষতঃ জলীয় দ্রবণ লইয়াই দ্রবণের বিভিন্ন তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যাদি পরীক্ষা করা হয় ; কারণ, জল অধিকাংশ পদার্থই

দ্রবীভূত করিতে সক্ষম। বালি, পাথর, লোহা প্রভৃতি জলে গলে না; এইগুলি জলে **অদ্রাব্য (insoluble)**; আবার, সাল্‌ফার জলে না গলিলেও কার্বন ডাইসাল্‌ফাইড নামক তরলে গলে; কাজেই সাল্‌ফার জলে অদ্রাব্য, পক্ষান্তরে কার্বন ডাইসাল্‌ফাইড দ্রাবকে **দ্রাব্য (soluble)**।

সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ
(Saturated and Unsaturated Solution)

সংজ্ঞা: কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে সর্বোচ্চ পরিমাণ কোন দ্রাব দ্রবীভূত থাকিলে সেই দ্রবণকে বলে সম্পৃক্ত দ্রবণ (Saturated solution)। পক্ষান্তরে, নির্দিষ্ট উষ্ণতায় দ্রাবের পরিমাণ কম থাকিলে, অর্থাৎ দ্রবণে আরও দ্রাব দ্রবীভূত করা সম্ভব হইলে সেই দ্রবণকে বলা হয় অসম্পৃক্ত দ্রবণ (Unsaturated solution)।

একটি বীকারে কিছু পরিমাণ জল লইয়া তাহাতে অল্প-অল্প করিয়া লবণ মিশাইয়া নাড়িলে প্রথম দিকে দেখা যাইবে, লবণের চিহ্নমাত্র নাই, সম্যক দ্রবীভূত হইয়াছে। ক্রমে এক সময় দেখা যাইবে, লবণ আর দ্রবীভূত হইতেছে না, পাত্রের নীচে থিতাইয়া পড়িতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ পরিমাণ জলে স্থানীয় সাধারণ উষ্ণতায় সর্বোচ্চ পরিমাণ লবণ দ্রবীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ জল লবণে সম্পৃক্ত হইয়াছে। ইহাই হইল ঐ উষ্ণতায় লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণ। এখন এই দ্রবণে জল মিশাইলে দেখা যাইবে, আরও লবণ দ্রবীভূত হইতেছে, অর্থাৎ দ্রবণটি আর সম্পৃক্ত থাকিবে না। আবার, জল না মিশাইয়া বীকারের ঐ সম্পৃক্ত দ্রবণটিকে উত্তপ্ত করিলেও উহাতে অতিরিক্ত লবণ দ্রবীভূত হইবে। এইভাবে এক সময় ঐ বর্ধিত উষ্ণতায়ও পূর্বাপেক্ষা বেশী কোন একটি সর্বোচ্চ পরিমাণ লবণ দ্রবীভূত হইয়া অতিরিক্ত লবণ অদ্রবীভূত থাকিয়া যাইবে। এই বর্ধিত উষ্ণতায় এই দ্রবণই হইবে লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণ। কাজেই কোন একটি দ্রবণ কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সম্পৃক্ত হইলেও অধিকতর উষ্ণতায়, অথবা আরও দ্রাবক যোগ করিলে তাহাই আবার অসম্পৃক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে আরও দ্রাব দ্রবীভূত হইতে পারে।

দ্রাব্যতা (Solubility)

কোন নির্দিষ্ট দ্রাবকে বিভিন্ন দ্রাব সম-পরিমাণে দ্রবীভূত হয় না। সম-পরিমাণ জলে একই উষ্ণতায় চিনি, লবণ, বা সোরা বিভিন্ন পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। কোন নির্দিষ্ট দ্রাবকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের দ্রবণ-শক্তি, বা দ্রাব্যতার এই বিভিন্নতা বুঝাইবার জন্য একটি পরিমাণগত হিসাব নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

সংজ্ঞা: কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় 100 গ্র্যাম দ্রাবকে যত গ্র্যাম দ্রাব দ্রবীভূত হইলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত হয়, অর্থাৎ সর্বাধিক যত গ্র্যাম দ্রাব 100 গ্র্যাম দ্রাবকে দ্রবীভূত হইতে পারে, সেই সংখ্যাটিকে ঐ উষ্ণতায় ঐ নির্দিষ্ট দ্রাবকে দ্রাব পদার্থটির **দ্রাব্যতা** (Solubility) বলা হয়।

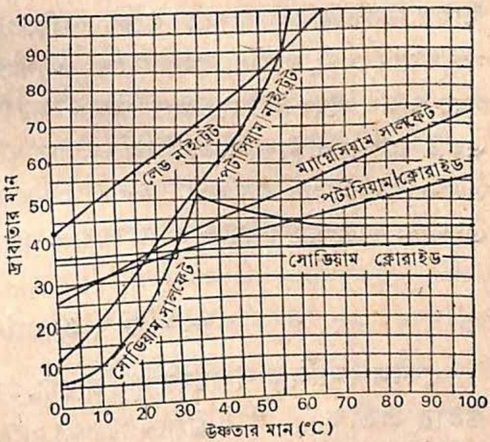
30°C উষ্ণতায় 100 গ্র্যাম জলে সর্বাধিক 45 গ্র্যাম সোরা দ্রবীভূত হইয়া সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করে; কাজেই বলা হয়, 30°C উষ্ণতায় জলে সোরার দ্রাব্যতা 45। এইভাবে '30°C উষ্ণতায় জলে খাদ্য-লবণের দ্রাব্যতা 36' বলিলে বুঝা যায়, এই উষ্ণতায় 100 গ্র্যাম জলে সর্বোচ্চ 36 গ্র্যাম লবণ দ্রবীভূত হইতে পারে, অর্থাৎ খাদ্য-লবণের সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণ প্রস্তুত করিতে হইলে 30°C উষ্ণতায় প্রতি 100 গ্র্যাম জলে 36 গ্র্যাম লবণ দ্রবীভূত করা প্রয়োজন হইবে।

তাপমাত্রার সহিত দ্রাব্যতার সম্পর্ক
(Relation of Solubility with Temperature)

সাধারণতঃ উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় সকল পদার্থেরই দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে তাহার উষ্ণতা অনুযায়ী কম-বেশী পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত থাকিতে পারে; উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে অধিকতর পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হয়, উষ্ণতা হ্রাস করিলে দ্রাব্যতা হ্রাস পায়। পরীক্ষায় জানা যায়, 50°C উষ্ণতায় 100 গ্র্যাম জলকে সম্পৃক্ত করিতে 85 গ্র্যাম সোরা দ্রবীভূত করা প্রয়োজন। এই সম্পৃক্ত দ্রবণটিকে ঠাণ্ডা করিয়া 40°C উষ্ণতায় আনিলে এই উষ্ণতায় সর্বাধিক মাত্র 65 গ্র্যাম সোরা ঐ পরিমাণ জলে দ্রবীভূত থাকিতে পারে; সুতরাং 65 গ্র্যাম সোরা দ্রবীভূত থাকিয়া অতিরিক্ত 20 গ্র্যাম সোরা দ্রবণ হইতে পৃথক হইয়া যায়; কিন্তু দ্রবণটি সম্পৃক্তই থাকে। উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে তরল দ্রাবকে সাধারণতঃ সকল কঠিন দ্রাব পদার্থের দ্রাব্যতার এইরূপ পরিবর্তন ঘটে।

তাপমাত্রা পরিবর্তনের সহিত বিভিন্ন দ্রাব পদার্থের দ্রাব্যতার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, তাহা দ্রাব্যতা-লেখ (solubility curve) রেখা-চিত্র হইতে সহজেই জানা যায়। বিভিন্ন উষ্ণতায় সাধারণতঃ জলে কোন দ্রাব পদার্থের দ্রাব্যতা নিরূপণ করিয়া গ্রাফ-কাগজে উহাদের বিভিন্ন উষ্ণতা ও দ্রাব্যতার সূচক-সংখ্যাকে স্থানাংক ধরিয়া রেখাঙ্কন করিলে ঐ দ্রাব পদার্থ টির **দ্রাব্যতা-লেখ** (solubility curve) পাওয়া যায়।

এইরূপ দ্রাব্যতা-লেখ হইতে যে-কোন উষ্ণতায় কোন নির্দিষ্ট দ্রাব পদার্থের দ্রাব্যতা সহজেই জানা যায়। বিভিন্ন পদার্থের এইরূপ দ্রাব্যতা-লেখ অঙ্কন করিলে ইহা হইতে পদার্থগুলির দ্রাব্যতার তুলনা করাও সম্ভব হয়।



বিভিন্ন দ্রাব-পদার্থের দ্রাব্যতা-লেখ

প্রদত্ত চিত্রে জল-দ্রাবকে সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম নাইট্রেট, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতা-লেখ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পটাশিয়াম নাইট্রেটের দ্রাব্যতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়; সোডিয়াম ক্লোরাইড, বা খাদ্য-লবণের দ্রাব্যতা 30°C উষ্ণতার পর অতি সামান্য বাড়ে। আবার, সোডিয়াম সালফেটের ক্ষেত্রে প্রায় 53°C উষ্ণতা পর্যন্ত দ্রাব্যতা বাড়িতে থাকে, তারপর উহার দ্রাব্যতা ক্রমশঃ হ্রাস পায়; সাধারণ নিয়মের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

রাসায়নিক সমীকরণ
(Chemical Equations)

পাঠ্যসূচী : প্রতীক, সংকেত, রাসায়নিক সমীকরণ ; সমীকরণের সঠিক তাৎপর্য এবং সহজ সমীকরণের সঠিক প্রকাশ-পদ্ধতি।

রসায়নের আলোচনা-কালে প্রায়শঃই দুই, বা ততোধিক পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ করিতে হয়। প্রতি বারই তাহাদের সম্পূর্ণ নাম লেখা, বা বলা বিরক্তিকর ও সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে ; কাজেই সময় ও শ্রম লাঘব করিবার জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের এক-একটি সংক্ষিপ্ত প্রতীক ও তাহাদের সংযোগে গঠিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের এক-একটি সংকেত স্থির করিয়াছেন। কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিষয়-বস্তু এইভাবে অপেক্ষাকৃত সহজে ও সংক্ষেপে প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

প্রতীক (Symbol)

কোন মৌলিক পদার্থের পূর্ণ নামের সংক্ষেপিত রূপকে বলা হয় উহার প্রতীক। 1813 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বার্জিলিয়াস (Berzelius) মৌলের প্রতীক লিখিবার একটি সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ; ইহাতে প্রত্যেকটি মৌলের সাধারণতঃ ইংরেজী নামের প্রথম অক্ষরটি প্রতীক হিসাবে ধরিয়া মৌলটিকে চিহ্নিত করা হয়। যে-সকল ক্ষেত্রে একাধিক মৌলের আদ্যক্ষর একই, সেই সকল ক্ষেত্রে কোন একটি মৌলকে আদ্যক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া অন্য মৌলগুলির ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষরের সহিত সুবিধামত আরও একটি অক্ষর যুক্ত করা হয়। নিম্নে কয়েকটি মৌলের প্রতীক প্রদত্ত হইল—

হাইড্রোজেন (Hydrogen), H
অক্সিজেন (Oxygen), O
কার্বন (Carbon), C
ক্লোরিন (Chlorine), Cl
নাইট্রোজেন (Nitrogen), N
ক্যালসিয়াম (Calcium), Ca
বোরন (Boron), B
ব্রোমিন (Bromine), Br ইত্যাদি

আবার, অনেক মৌলিক পদার্থের প্রতীক উহাদের ইংরেজী নাম হইতে না

লইয়া ল্যাটিন নামের সাধারণতঃ এক, বা একাধিক আদ্যক্ষর দ্বারা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে ; যেমন—

মৌল	ল্যাটিন নাম	প্রতীক
আয়রন (Iron)	Ferrum	Fe
পটাশিয়াম (Potassium)	Kalium	K
সোডিয়াম (Sodium)	Natrium	Na ইত্যাদি

প্রতীকের তাৎপর্য দুইটি ; (i) কোন মৌলিক পদার্থের প্রতীক দ্বারা তাহার এক-একটি পরমাণু বুঝায় ; যেমন, H প্রতীকটি হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু নির্দেশ করে। কোন মৌলের একাধিক পরমাণু বুঝাইতে হইলে উহার প্রতীকের বাম পার্শ্বে প্রয়োজনীয় সূচক-সংখ্যা বসাইতে হয় ; যেমন— 2H, বা 4H লিখিলে হাইড্রোজেনের দুইটি, বা চারিটি পরমাণু বুঝায়।

(ii) আবার, কোন মৌলের প্রতীক হইতে তাহার একটি পরিমাণগত, বা মাত্রিক (quantitative) তাৎপর্যও সূচিত হয়। প্রতীকের সাহায্যে মৌলের একটি পরমাণু বুঝানো হয়, উপরন্তু গ্র্যাম এককে তাহার পারমাণবিক ওজন (ইহাকে বলা হয় মৌলটির গ্র্যাম-পরমাণু) পরিমাণ পদার্থও বুঝায় ; যেমন—Cl লিখিলে এক গ্র্যাম-পরমাণু, অর্থাৎ 35·5 (পারমাণবিক ওজন) গ্র্যাম পরিমাণ ক্লোরিন বুঝায়। এইভাবে O প্রতীকটি 16 গ্র্যাম অক্সিজেন, N প্রতীকটি 14 গ্র্যাম নাইট্রোজেন নির্দেশ করে।

সংকেত (Formula)

মৌলিক, বা যৌগিক যে-কোন পদার্থের অণুকে যে-সকল প্রতীক-সমষ্টির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, তাহাকে বলে পদার্থের আণবিক সংকেত (Formula)।

যে-কোন যৌগের অণু একাধিক মৌলের কিছু সংখ্যক পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। কোন যৌগ যে-সকল মৌলের সংযোগে গঠিত, সেই মৌলগুলির প্রতীকসমূহ পর-পর লিখিয়া তাহাদের প্রত্যেকটির যতগুলি পরমাণু যুক্ত হইয়াছে সেই সংখ্যাটি প্রতীকের দক্ষিণ পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নীচে লিখিলেই যৌগটির আণবিক সংকেত প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেন (H) ও অক্সিজেন (O) মৌল দুইটির রাসায়নিক সংযোগে জল গঠিত ; উপরন্তু পরীক্ষায় জানা যায়, জলের এক-একটি অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন-পরমাণু ও

একটি অক্সিজেন-পরমাণু রহিয়াছে। সুতরাং, জলের আণবিক সংকেত লিখিতে হয় H_2O। যে-কোন মৌলের অণু যেহেতু উহার এক, বা একাধিক পরমাণুর সমবায়ে গঠিত ; অতএব মৌলের প্রতীকের দক্ষিণ পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নীচে নির্দিষ্ট সূচক-সংখ্যা বসাইলে মৌলটির আণবিক সংকেত প্রকাশিত হয় ; যেমন—ক্লোরিন-অণুর সংকেত Cl_2, অক্সিজেনের O_2, নাইট্রোজেনের N_2, ফস্‌ফরাসের P_4 ইত্যাদি। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে অণু ও পরমাণু সমার্থক ; এই সকল ক্ষেত্রে মৌলের প্রতীকটি উহার পরমাণু, বা অণু উভয়ই নির্দেশ করে, যেমন—Na, K, Fe, Cu, ইত্যাদি।

কয়েকটি সাধারণ যৌগের আণবিক সংকেত নিম্নে প্রদত্ত হইল :

নাইট্রিক অ্যাসিড : HNO_3

সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ) : NaCl

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড : HCl

অ্যামোনিয়া : NH_3

আণবিক সংকেতের তাৎপর্য দুইটি ; (i) যে-কোন পদার্থের আণবিক সংকেত দ্বারা পদার্থটির একটিমাত্র অণু বুঝায়। একাধিক সংখ্যক অণু বুঝাইতে হইলে আণবিক সংকেতের বাম দিকে নির্দিষ্ট সূচক-সংখ্যাটি বসাইতে হয় ; যেমন—$7CuSO_4$ বা $2H_2O$ লিখিলে কপার সালফেটের 7-টি অণু, বা জলের 2-টি অণু বুঝায়।

(ii) কোন পদার্থের আণবিক সংকেত দ্বারা উহার **গ্র্যাম-অণু**, অর্থাৎ, গ্র্যাম-এককে প্রকাশিত আণবিক ওজন-পরিমাণ বুঝায় ; যেমন—H_2SO_4 লিখিলে সালফিউরিক অ্যাসিডের এক গ্র্যাম-অণু পরিমাণ, অর্থাৎ $1 \times (2 \times 1 + 32 + 4 \times 16) = 98$ গ্র্যাম বুঝায়। এইরূপে, $6H_2O$ লিখিলে 6 গ্র্যাম-অণু, অর্থাৎ $6 \times (2 \times 1 + 16) = 108$ গ্র্যাম জল বুঝায়।

রাসায়নিক সমীকরণ (Chemical Equations)

কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও উৎপন্ন পদার্থগুলিকে প্রতীক ও সংকেতের সাহায্যে সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার পদ্ধতিকে বলা হয় **রাসায়নিক সমীকরণ** (chemical equation)। যে-সকল পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাহাদের যোগ চিহ্ন (+) দিয়া বাম দিকে এবং বিক্রিয়ার ফলস্বরূপ যে পদার্থ, বা পদার্থগুলি পাওয়া যায় তাহাদেরও যোগ চিহ্ন

(+) দিয়া ডান দিকে প্রতীক ও সংকেতের সাহায্যে লেখা হয় এবং ডান ও বাম উভয় পক্ষকে সমান চিহ্ন (=) দ্বারা সংযুক্ত করিতে হয়।

রাসায়নিক সমীকরণের সঠিক প্রকাশপদ্ধতি ঃ

(Balancing Chemical Equations)

যে-কোন রাসায়নিক সমীকরণকে সঠিকভাবে প্রকাশ করিতে হইলে কয়েকটি প্রয়োজনীয় নিয়ম মানিয়া চলা দরকার; যেমন—(i) বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলির প্রত্যেকটির আণবিক সংকেত লিখিতে হইবে, পরমাণুর প্রতীক মাত্র নহে। (ii) সমীকরণের ডান ও বাম উভয় দিকে যে-কোন মৌলের মোট পরমাণু-সংখ্যা সর্বদা সমান হইতে হইবে। অণুর মধ্যস্থিত কোন মৌলের পরমাণু-সংখ্যা উভয় পক্ষে সমান করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে যে-কোন দিকে প্রয়োজনীয় অণু সংখ্যা লিখিতে হয়।

একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে উপরোক্ত নিয়মগুলির উপযোগিতা সহজেই বুঝা যাইবে। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন মৌল দুইটির রাসায়নিক সংযোগে অ্যামোনিয়া (NH_3) যৌগটি উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াটির সমীকরণ যদি লেখা হয়ঃ $N + H = NH_3$, তাহা হইলে বিক্রিয়াটি যথাযথ প্রকাশিত হইবে না, ভুল হইবে; কারণ, উপরোক্ত প্রথম নিয়মানুযায়ী বিক্রিয়ক মৌল-গুলির আণবিক সংকেত লেখা হয় নাই। আবার, এই নিয়মানুযায়ী যদি লেখা হয়ঃ $N_2 + H_2 = NH_3$, তাহা হইলেও ভুল হইবে; কারণ, সমীকরণটির ডান দিকে রহিয়াছে একটি নাইট্রোজেন ও তিনটি হাইড্রোজেন-পরমাণু, অথচ বাম দিকে রহিয়াছে এই মৌলগুলির প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া পরমাণু; উভয় পক্ষের পরমাণু-সংখ্যা অসমান। এইজন্য দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে নির্ভুল সমীকরণ হইবে: $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$। সরল ধরনের কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

(i) $NaOH + HCl = NaCl + H_2O$

(ii) $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$ ইত্যাদি।

রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য ঃ

(Significance of chemical equation)

কোন রাসায়নিক সমীকরণ হইতে বিক্রিয়া সম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্যাদি সঠিকভাবে জানা যাইতে পারে ঃ

(i) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও উৎপন্ন পদার্থগুলির

রাসায়নিক পরিচয় বিক্রিয়াটির সমীকরণ হইতে সহজেই জানা যায়; যেমন—$2H_2 + O_2 = 2H_2O$ সমীকরণটি হইতে বুঝা যায়, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌল দুইটির রাসায়নিক সংযোগে জল উৎপন্ন হয়।

(ii) কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ হইতে বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলির অণুর **সংখ্যানুপাত** বুঝা যায়; যেমন—$2H_2 + O_2 = 2H_2O$ সমীকরণটি হইতে বুঝা যায়, দুইটি হাইড্রোজেন-অণু ও একটি অক্সিজেন-অণুর সংযোগে জলের দুইটি অণু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(iii) রাসায়নিক সমীকরণ হইতে বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলির **ওজন পরিমাণের অনুপাত** জানা যাইতে পারে; যেমন—$2H_2 + O_2 = 2H_2O$ সমীকরণটি হইতে বুঝা যায়, 2 গ্রাম-অণু [অর্থাৎ $2 \times (2 \times 1) = 4$ গ্রাম] হাইড্রোজেন 1 গ্রাম-অণু [অর্থাৎ($2 \times 16 = 32$ গ্রাম) অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়া করিয়া 2 গ্রাম-অণু (অর্থাৎ $2 \times (2 \times 1 + 16) = 36$ গ্রাম] জল উৎপন্ন করে। লক্ষ্য করিতে হইবে, বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলির মোট ওজন-পরিমাণ একই (36 গ্রাম) আছে।

(iv) কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও উৎপন্ন পদার্থগুলির সব কয়টিই যদি গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে বিক্রিয়াটির সমীকরণ হইতে বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলির **আয়তনের অনুপাত** জানা যায়; যেমন—$2H_2 + O_2 = 2H_2O$ সমীকরণটি হইতে বুঝা যায়, 2 আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাস 1 আয়তন অক্সিজেন গ্যাসের সহিত বিক্রিয়া করিয়া 2 আয়তন **জলীয় বাষ্প** (তরল জল নহে) উৎপন্ন করিবে। বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলির মধ্যে এক, বা একাধিক পদার্থ যদি কঠিন, বা তরল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে ঐ কঠিন, বা তরল পদার্থগুলির আয়তন সম্বন্ধে সমীকরণ হইতে কিছুই বুঝা যায় না। উপরোক্ত সমীকরণটি হইতে কেবলমাত্র ইহাই বুঝা যায় যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস দুইটি আয়তন-ভিত্তিক 2 : 1 অনুপাতে (যেমন—2. সি. সি. : 1 সি. সি., অথবা 2 লিটার : 1 লিটার, ইত্যাদি) পরস্পর মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। উৎপন্ন জল যদি তরল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে উহার আয়তন সমীকরণ হইতে জানা যায় না; কিন্তু বাষ্পীয় অবস্থায় থাকিলে তাহা অবশ্যই 2 আয়তন (যেমন, 2 সি. সি., অথবা 2 লিটার) অধিকার করিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তড়িৎবিশ্লেষণ
(Electrolysis)

পাঠ্যসূচী: তড়িৎবিশ্লেষণ : তড়িৎবিশ্লেষ্য ও অ-তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ ; জলের তড়িৎবিশ্লেষণ ; ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং (তড়িৎ-প্রলেপন)।

সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সকল পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িৎ চলাচল করিতে পারে না। কপার, বা অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর তারের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হয় ; অথচ কাঠ, বা কাঁচের দণ্ড তড়িৎ-পরিবহনে অক্ষম। আবার, খাদ্য-লবণ, বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের মধ্য দিয়া অনায়াসে তড়িৎ চলাচল করে, কিন্তু চিনির জলীয় দ্রবণের মধ্য দিয়া কোনক্রমেই তড়িৎ চালনা করা যায় না। এইভাবে তড়িৎ-পরিবহনের ক্ষমতা অনুযায়ী যাবতীয় পদার্থকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; — (i) **তড়িৎ-পরিবাহী** (conductor) ও (ii) **তড়িৎ-অপরিবাহী** (non-conductor, or insulator)। কপার, অ্যালুমিনিয়াম, গোল্ড, সিলভার, আয়রন প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় ধাতু, এবং উত্তাপে বিগলিত, বা কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় বিভিন্ন অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ জাতীয় পদার্থ তড়িৎ-পরিবাহী। পক্ষান্তরে, কাঠ, কাঁচ, মাটি, প্লাস্টিক ইত্যাদি তড়িৎ-অপরিবাহী।

তড়িৎবিশ্লেষণ (Electrolysis)

তড়িৎ-পরিবহনের ফলাফলের বিচারে তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থসমূহকে আবার দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

(a) কোন-কোন পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইলে উহাদের কোনরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না, অস্থায়ী কিছু ভৌত পরিবর্তন ঘটিতে পারে মাত্র। ধাতুগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে ; ইহাদিগকে বলে **ধাতব পরিবাহী** (metallic conductor)। কপার, প্ল্যাটিনাম ইত্যাদি যে-কোন ধাতব তারের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে তারটি উত্তপ্ত ও ভাস্বর হইয়া উঠে ; তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করিলে উহার তাপ ও ঔজ্জ্বল্য লোপ পায়, যেমন তার ছিল তেমনই থাকে। এইরূপ অস্থায়ী ভৌত পরিবর্তন ছাড়া তারটির

ধাতব উপাদানের সকল গুণ ও ধর্মই অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ তড়িতের প্রভাবে ধাতুটির কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না।

(b) পক্ষান্তরে, কোন-কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইবার ফলে পদার্থগুলি বিয়োজিত হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট একাধিক নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয়। এইরূপ পরিবাহী পদার্থকে বলা হয় **তড়িৎবিশ্লেয্য পদার্থ** (electrolyte) এবং এই সকল পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহের প্রক্রিয়াকে বলা হয় **তড়িৎবিশ্লেষণ** (electrolysis)। বিভিন্ন অ্যাসিড, ক্ষার ও রাসায়নিক লবণ তড়িংবিশ্লেয্য পদার্থের পর্যায়-ভুক্ত। অবশ্য সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও কঠিন অবস্থায় এইরূপ পদার্থসমূহ তড়িৎ-পরিবহনে সক্ষম হয় না ; কেবলমাত্র উত্তাপে বিগলিত, বা কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায়ই উহারা তড়িৎ-পরিবাহী হয় এবং তড়িতের প্রভাবে উহাদের রাসায়নিক রূপান্তর ঘটিয়া বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। চিনি, অ্যাল-কোহল, ইথার ইত্যাদি যে-সকল রাসায়নিক পদার্থ অনুরূপ অবস্থায় তড়িৎ-পরিবহনে অক্ষম, অর্থাৎ যাহাদের ক্ষেত্রে তড়িৎবিশ্লেষণ সম্ভব নহে, তাহাদের বলা হয় **অ-তড়িৎবিশ্লেয্য পদার্থ** (non-electrolytes)।

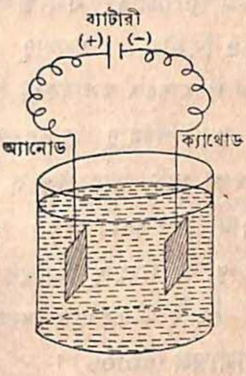
সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl), অর্থাৎ সাধারণ খাদ্য-লবণ তড়িৎবিশ্লেয্য পদার্থ। কিন্তু বিশুদ্ধ স্ফটিকাকার লবণের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হয় না ; যথোপযুক্ত উত্তাপে লবণকে বিগলিত করিলে, অথবা উহাকে জলে দ্রবীভূত করিলে সেই তরল লবণ, বা লবণের জলীয় দ্রবণের মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে তড়িৎ-প্রবাহ চলে, এবং তাহার ফলে খাদ্য-লবণের রাসায়নিক বিয়োজন ঘটিয়া উহার সংগঠক মৌল উপাদানদ্বয় সোডিয়াম ও ক্লোরিন বিমুক্ত হয়। কেবল বিভিন্ন রাসায়নিক লবণই নহে, বিভিন্ন অ্যাসিড ও ক্ষার জাতীয় পদার্থও তড়িৎ-প্রবাহের ফলে অনুরূপভাবে বিয়োজিত হইয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম-বিশিষ্ট একাধিক নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এখানে একটি কথা জানা দরকার, জল অ্যাসিড, ক্ষার, বা লবণ না হইয়াও সাধারণভাবে একটি তড়িৎবিশ্লেয্য পদার্থ ; যদিও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল অতি স্বল্প মাত্রায় তড়িৎ-পরিবাহী।

সংজ্ঞা : উত্তাপে বিগলিত, অথবা কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় যে-সকল তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের মাধ্যমে তড়িৎ চালনা করিলে উহাদের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়া সংগঠক বিভিন্ন উপাদানে বিয়োজিত হইয়া যায় এবং একাধিক নূতন পদার্থের উৎপত্তি ঘটে, তাহাদিগকে বলা হয়

তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ (electrolyte)। তড়িতের প্রভাবে পদার্থের এইরূপ বিয়োজন-প্রক্রিয়াকে বলা হয় **তড়িৎবিশ্লেষণ** (electrolysis)।

তড়িৎবিশ্লেষণের পদ্ধতি (Method of electrolysis) :

অ্যাসিড, ক্ষার, বা লবণ জাতীয় কোন পদার্থের তড়িৎবিশ্লেষণ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হইলে সাধারণতঃ উহার জলীয় দ্রবণ একটি পাত্রে রাখিয়া দুইটি ধাতব (সাধারণতঃ তামা, বা প্ল্যাটিনাম) তারের এক-এক প্রান্তে সংলগ্ন দুইখানা ধাতব চাকৃতি দ্রবণটির মধ্যে পরস্পর কিছু ব্যবধানে নিমজ্জিত রাখা হয়। ধাতব তার দুইটির মুক্ত প্রান্তদ্বয় একটি তড়িৎ-কোষ, বা ব্যাটারীর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ-প্রান্তের সহিত যুক্ত করা হয়। দ্রবণে নিমজ্জিত ধাতব চাকৃতি দুইটিকে বলা হয় **তড়িৎ-দ্বার** (electrode) ;



পদার্থের তড়িৎবিশ্লেষণ পদ্ধতি

যে-তড়িৎদ্বারটি ব্যাটারীর ধনাত্মক মেরুর সহিত যুক্ত থাকে তাহাকে বলা হয় **ধন-তড়িৎদ্বার, বা অ্যানোড** (anode), এবং ঋণাত্মক মেরুর সহিত সংযুক্ত তড়িৎদ্বারকে বলা হয় **ঋণ-তড়িৎদ্বার, বা ক্যাথোড** (cathode)। তড়িৎদ্বার দুইটির মাধ্যমে দ্রবণের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকে ; একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, তড়িতের প্রভাবে দ্রবীভূত তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থটির রাসায়নিক বিয়োজন, বা বিশ্লেষণ-ক্রিয়া ঘটে, যাহার ফলে তড়িৎদ্বার দুইটির নিকটে দ্রবণের মধ্যে সূক্ষ্ম বুদবুদ-সহ সাধারণতঃ কিছু চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়।

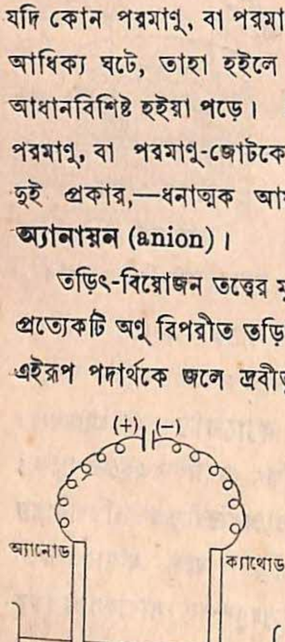
তড়িৎবিশ্লেষণের আয়নীয় মতবাদ :
(Ionic Theory of Electrolysis)

তড়িৎ-প্রবাহের ফলে তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের উল্লিখিত রূপ রাসায়নিক বিয়োজন প্রক্রিয়া কিভাবে সম্ভব হয়, তদ্বিষয়ে 1887 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস (Arrhenius) তাঁহার বিখ্যাত **তড়িৎ-বিয়োজন তত্ত্ব** (Theory of Electrolytic Dissociation) প্রবর্তন করেন। এই

তত্ত্বটি বুঝিতে হইলে পদার্থের **পারমাণবিক গঠন** সম্বন্ধে কিছু সাধারণ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, যে-কোন পরমাণু মূলতঃ তিন প্রকার অতি সূক্ষ্ম কণিকার সমবায়ে গঠিত ; ইহাদের মধ্যে ইলেকট্রন (electron) **ঋণাত্মক** তড়িৎ-আধানযুক্ত, প্রোটন (proton) **ধনাত্মক** তড়িৎ-আধানযুক্ত এবং নিউট্রন (neutron) **তড়িৎ-বিহীন**। পরমাণু যেহেতু সামগ্রিকভাবে নিস্তড়িৎ, অতএব যে-কোন পরমাণুতে স্বভাবতঃই ইলেকট্রন ও প্রোটন কণিকা থাকে সম-সংখ্যক। যদি কোন পরমাণু, বা পরমাণু-জোটে কোন কারণে ইলেকট্রনের স্বল্পতা, বা আধিক্য ঘটে, তাহা হইলে উহারা যথাক্রমে ধনাত্মক, বা ঋণাত্মক তড়িৎ-আধানবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। ইলেকট্রনের স্বল্পতা ও আধিক্য-জনিত তড়িতাহিত পরমাণু, বা পরমাণু-জোটকে বলা হয় **আয়ন** (Ion)। আয়ন স্বভাবতঃই দুই প্রকার,—ধনাত্মক আয়ন, **ক্যাটায়ন** (cation) ও ঋণাত্মক আয়ন, **অ্যানায়ন** (anion)।

তড়িৎ-বিয়োজন তত্ত্বের মূল বক্তব্য হইল, যে-কোন তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের প্রত্যেকটি অণু বিপরীত তড়িৎ-আধানবিশিষ্ট একাধিক আয়নের সমবায়ে গঠিত। এইরূপ পদার্থকে জলে দ্রবীভূত, অথবা উত্তাপে বিগলিত করিলে সংগঠক আয়নগুলি পরস্পর হইতে যথেষ্ট দূরে সরিয়া যায় এবং দ্রবণ, বা তরলের মধ্যে অগণিত ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন পরস্পরের প্রভাবমুক্ত অবস্থায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। যে-কোন তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের বিগলিত, বা দ্রবীভূত অবস্থায় এইরূপ বিপরীতধর্মী দুই প্রকার আয়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লিষ্ট হওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় **তড়িৎ-বিয়োজন** (electrolytic dissociation)। বিপরীতধর্মী তড়িৎ-আধানের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ-হেতু দ্রবণের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা-কালে ক্যাটায়নগুলি ক্যাথোডের দিকে ও অ্যানায়নগুলি অ্যানোডের দিকে ধাবিত হয়। আয়নগুলি তড়িৎ-দ্বারের সংস্পর্শে আসিয়া প্রয়োজনানুযায়ী তাহা হইতে এক,



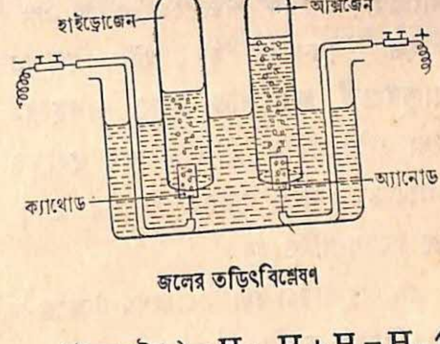
তড়িৎবিশ্লেষণের আয়নীয় ব্যাখ্যা

বা একাধিক ইলেক্‌ট্রন গ্রহণ, অথবা বর্জন করিয়া নিস্তড়িৎ পরমাণু, বা পরমাণু-জোটে পরিণত হয়; অতঃপর পরমাণু, বা পরমাণু-জোটের সমবায়ে অণুর উৎপত্তি ঘটে। এইভাবে তড়িৎবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের বিপরীত তড়িদ্বাহী দুইটি উপাদানিক অংশ দুই বিপরীত তড়িৎ-দ্বারে গিয়া সঞ্চিত হয়। ইহাই হইল তড়িৎবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মোটামুটি রাসায়নিক তথ্য। জলের তড়িৎবিশ্লেষণের ফলে পদার্থটির রাসায়নিক বিয়োজন ও তাহার ফলাফল নিম্নে আলোচনা করা হইল।

জলের তড়িৎবিশ্লেষণ
(Electrolysis of water)

বিশুদ্ধ জল বিশেষ তড়িৎ-পরিবাহী নহে; কারণ, জল তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ হইলেও উহার মোট অণু-সংখ্যার অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে তড়িৎ-বিয়োজিত হইয়া হাইড্রোজেন ক্যাটায়ন (H^+) ও হাইড্রক্সিল অ্যানায়ন (OH^-) উৎপন্ন করে: $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$,
এবং এইজন্যই জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ অতি স্বল্প মাত্রায় চলাচল করিয়া থাকে। জলের তড়িৎবিশ্লেষণ যথোপযুক্তভাবে করিতে হইলে বিশুদ্ধ জলে সামান্য কয়েক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক, বা সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড মিশাইতে হয়; কারণ, ইহার ফলে জলের তড়িৎ-পরিবাহিতা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

যাহা হউক, এইরূপ সামান্য অ্যাসিডযুক্ত জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে হাইড্রোজেন ক্যাটায়নগুলি ক্যাথোডের প্রতি ধাবিত হয় এবং ক্যাথোড-গাত্রে পৌঁছিয়া উহা হইতে ইলেক্‌ট্রন গ্রহণ করিয়া প্রথমে নিস্তড়িৎ হাইড্রোজেন-পরমাণু ও পরে হাইড্রোজেন-অণুতে পরিণত হয় এবং ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস উদ্ভূত হইতে থাকে: $H^+ + e$ (ইলেক্‌ট্রন) $= H$; $H + H = H_2 \uparrow$;



জলের তড়িৎবিশ্লেষণ

অপরপক্ষে, হাইড্রক্সিল অ্যানায়নগুলি অ্যানোডের প্রতি অগ্রসর হয় এবং অ্যানোড-গাত্রের সংস্পর্শে আসিয়া এক-একটি আয়ন এক-একটি ইলেক্‌ট্রন

বর্জন করিয়া অস্থায়ী হাইড্রক্সিল (OH) পরমাণু-জোটে পরিণত হয়। অতঃপর এই (OH) পরমাণু-জোটগুলির পারস্পরিক সংযোগে জল ও অক্সিজেন উৎপন্ন হইয়া অ্যানোডে কেবল অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হইতে থাকে :

$OH^- - e$ (ইলেক্‌ট্রন) $= OH$; $OH + OH = H_2O + O$; $O + O = O_2 \uparrow$।

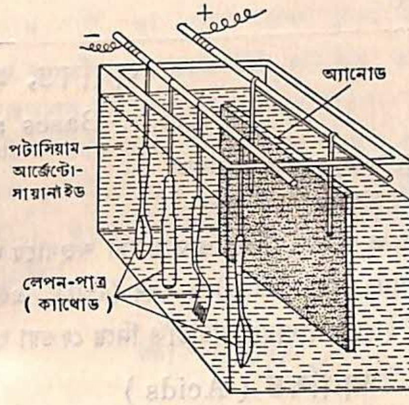
এইভাবে তড়িৎবিশ্লেষণের ফলে জল উহার মৌল উপাদানদ্বয় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

তড়িৎপ্রলেপন
(Electroplating)

তড়িৎবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক প্রয়োগ হইল তড়িৎপ্রলেপন-ক্রিয়া (Electroplating)। তড়িৎবিশ্লেষণের সাহায্যে কোন ধাতু-নির্মিত (সাধারণতঃ লোহা, বা পিতল) জিনিসের উপরে অন্য কোন ধাতুর একটি সূক্ষ্ম আস্তরণ গঠনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় তড়িৎপ্রলেপন। বায়ুতে দীর্ঘকাল উন্মুক্ত থাকিলে নিকৃষ্ট ধাতুসমূহের অক্সাইড গঠনের ফলে মলিন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা রোধ করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা অনেক সময় কোন ধাতু-নির্মিত জিনিসের চাক্‌চিক্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উহার উপর অন্য কোন উৎকৃষ্ট ধাতুর তড়িৎপ্রলেপন করা হয়। যে জিনিসের উপর তড়িৎপ্রলেপন করিতে হইবে তাহাকে কোন উপযুক্ত লবণের জলীয় দ্রবণে নিমজ্জিত করা হয়, এবং যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হইবে সেই ধাতুর একটি পাতকে দ্রবণে নিমজ্জিত রাখিয়া উহাকে একটি ব্যাটারীর ধনাত্মক তড়িদ্দ্বারের সহিত এবং জিনিসটিকে ঋণাত্মক তড়িদ্দ্বারের সহিত সংযুক্ত করা হয়; অর্থাৎ **লেপন-পাত্রটি ক্যাথোড রূপে** এবং **ধাতুখণ্ডটি অ্যানোড রূপে ব্যবহার করা হয়।** দ্রবণের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনার ফলে দ্রবীভূত লবণের তড়িৎবিশ্লেষণের দরুণ ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহৃত দ্রব্যটির উপর অ্যানোড-সংলগ্ন ধাতুটির একটি সূক্ষ্ম প্রলেপ গঠিত হয়।

লোহায় মরিচা ধরা নিবারণের উদ্দেশ্যে লৌহ-নির্মিত দ্রব্যের উপর অনেক সময় নিকেল-প্রলেপন (nickel-plating) করা হয়। এই ক্ষেত্রে তড়িৎ-বিশ্লেষণ-গাহের (electrolytic bath) মধ্যে সামান্য বোরিক অ্যাসিড সহ নিকেল অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেটের জলীয় দ্রবণ লওয়া হয় এবং একটি

নিকেল পাতকে অ্যানোডরূপে ও লৌহ-নির্মিত দ্রব্যটিকে ক্যাথোডরূপে ব্যবহার করা হয়। তড়িৎবিশ্লেষণের ফলে অ্যানোড হইতে নিকেল ধাতু ক্রমশঃ



তড়িৎপ্রলেপন পদ্ধতির যান্ত্রিক কৌশল

ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহৃত দ্রব্যটির উপরে নিকেলের একটি সূক্ষ্ম আস্তরণ, বা প্রলেপ গঠিত হয়।

নিকেল-প্রলেপনের ন্যায় সিলভার-প্রলেপন, বা গোল্ড-প্রলেপনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে পটাশিয়াম আর্জেন্টোসায়ানাইড, অথবা পটাশিয়াম অরোসায়ানাইডের জলীয় দ্রবণের তড়িৎবিশ্লেষণ করা হয়। অনেক ধাতব দ্রব্যের চাক্‌চিক্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উহার উপরে মূলতঃ অনুরূপ পদ্ধতিতে অনেক সময় ক্রোমিয়ামের প্রলেপনও করা হইয়া থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ
(Acids, Bases and Salts)

পাঠ্যসূচী: অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা; প্রশমন-ক্রিয়া।

রাসায়নিক প্রকৃতি ও ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য অনুসারে যাবতীয় যৌগকে প্রধানতঃ অ্যাসিড (acid), ক্ষার (base) ও লবণ (salt), এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের সাধারণ পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হইল।

অ্যাসিড (Acids)

সাল্‌ফার, ফস্‌ফরাস, কার্বন ইত্যাদি কোন-কোন মৌল মুক্ত বায়ুতে, বা অক্সিজেনের মধ্যে পোড়াইলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহাকে জলে দ্রবীভূত করিয়া প্রাপ্ত দ্রবণের দুইটি বিশেষ ধর্ম লক্ষ্য করা যায়,—উহাদের স্বাদ অম্ল হয় এবং উহারা নীল লিট্‌মাসকে (litmus) লাল করে; ইহাদের বলা হয় অ্যাসিড। হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড এইরূপ অ্যাসিডধর্মী পদার্থের অতি সুপরিচিত উদাহরণ। অ্যাসিড মাত্রেরই দুইটি সাধারণ ধর্ম থাকে,—উহারা অম্ল স্বাদযুক্ত হয় এবং উহাদের সংস্পর্শে নীল লিট্‌মাস লাল বর্ণে পরিবর্তিত হয়। এই দুইটি সাধারণ ভৌত ধর্ম ব্যতীত অ্যাসিডের নানা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যও রহিয়াছে।

রাসায়নিক গঠনের বিচারে দেখা যায়, অ্যাসিড মাত্রেরই অণুতে এক, বা একাধিক হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে; বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যাহারা সম্পূর্ণ, বা আংশিকভাবে কোন ধাতু-পরমাণু, বা যৌগ-মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া লবণ গঠন করে। অনেক ক্ষেত্রে অ্যাসিডের সহিত ধাতুর সরাসরি বিক্রিয়ায় এইরূপ প্রতিস্থাপন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়; যেমন: $2HCl + Zn = ZnCl_2 + H_2$; $H_2SO_4 + Zn = ZnSO_4 + H_2$, ইত্যাদি। ধাতু ছাড়াও কোন ক্ষারীয় পদার্থের সহিত বিক্রিয়ায়ও অ্যাসিডের হাইড্রোজেন-পরমাণু অনুরূপভাবে ক্ষারের পরমাণু, বা যৌগ-মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া লবণ গঠিত হইতে পারে; যেমন—$HCl + NaOH$ (ক্ষারীয় পদার্থ) $= NaCl + H_2O$।

অতএব বলা যায়, প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন-পরমাণু বিশিষ্ট যে-সকল যৌগিক পদার্থের হাইড্রোজেন-পরমাণু আংশিক, বা সম্পূর্ণরূপে কোন ধাতু, বা যৌগ-মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া লবণ উৎপন্ন করে, এবং যাহাদের স্বাদ অম্ল হয় ও নীল লিট্‌মাসকে লাল করে, তাহাদের বলা হয় অ্যাসিড (acid)।

নিম্নে কয়েকটি সাধারণ পরিচিত অ্যাসিডের উল্লেখ করা হইল : হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), কার্বোনিক অ্যাসিড (H_2CO_3), ফস্‌ফরিক অ্যাসিড (H_3PO_4), ইত্যাদি।

ক্ষার (Base)

ধাতব অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইড যৌগসমূহ এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ইত্যাদি কোন-কোন অধাতব হাইড্রক্সাইড যৌগ বিভিন্ন অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় জল ও লবণ উৎপন্ন করে, অর্থাৎ ইহারা অ্যাসিডের অ্যাসিড-ধর্মিতা প্রশমন করিতে সমর্থ। সাধারণতঃ, **অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইড শ্রেণীর যে-সকল যৌগ বিভিন্ন অ্যাসিড প্রশমিত করিয়া লবণ গঠন করে, তাহাদের বলা হয় ক্ষার** (base) ; যেমন—কপার অক্সাইড (CuO), ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH), ম্যাগ্‌নেসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Mg(OH)_2$], অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (NH_4OH) ইত্যাদি। ইহাদের বিক্রিয়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :

$$CaO + HCl = CaCl_2 + H_2O$$

$$NaOH + HNO_3 = NaNO_3 + H_2O$$

অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর হাইড্রক্সাইড জলে দ্রবণীয়, এবং উৎপন্ন দ্রবণ ক্ষারীয় প্রকৃতি-বিশিষ্ট। **জলে দ্রবণীয় হাইড্রক্সাইড ক্ষারগুলিকে বলা হয় ক্ষারক** (alkali) ; যেমন—NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, NH_4OH ইত্যাদি। এই সকল ক্ষারকের জলীয় দ্রবণের সংস্পর্শে লাল লিট্‌মাস নীল হয়। সকল ধাতব অক্সাইড, বা হাইড্রক্সাডই জলে দ্রবণীয় নহে ; কাজেই বলা যাইতে পারে, **ক্ষারক মাত্রেই ক্ষার, কিন্তু সকল ক্ষারই ক্ষারক**

নহে। $NaOH$, KOH, $Ca(OH)_2$ ইত্যাদিকে ক্ষার ও ক্ষারক উভয় শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কিন্তু CuO, Fe_2O_3, $Fe(OH)_3$, $Al(OH)_3$ ইত্যাদি ক্ষার পদার্থ (base) ; ক্ষারক (alkali) নহে।

লবণ (Salt)

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন অ্যাসিডের হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলি কোন ধাতু, বা যৌগ-মূলক দ্বারা আংশিক, বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হইলে যে পদার্থ গঠিত হয়, তাহাকে বলা হয় **লবণ** (Salt)। বিভিন্ন রূপ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার লবণ গঠিত হইতে পারে ; যেমন—

(a) **শমিত লবণ** (Normal Salt) : কোন অ্যাসিডের হাইড্রোজেন-পরমাণুসমূহ ধাতুর দ্বারা সম্যকরূপে প্রতিস্থাপিত হইয়া যে লবণ উৎপন্ন করে, তাহাকে বলে **শমিত লবণ**। এইরূপ হাইড্রোজেন-বর্জিত লবণ অ্যাসিড ও ক্ষারের পারস্পরিক পূর্ণ প্রশমনে গঠিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে সাধারণতঃ অ্যাসিড, বা ক্ষারের কোন ধর্মই থাকে না ; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় :

$$NaOH + HCl = H_2O + NaCl$$
$$2KOH + H_2SO_4 = 2H_2O + K_2SO_4$$

(b) **অম্ল-লবণ** (Acid Salt) : একাধিক হাইড্রোজেন-পরমাণু বিশিষ্ট অ্যাসিডের হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলি ধাতুর দ্বারা আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত হইয়া যে লবণ গঠিত হয়, তাহাকে বলা হয় **অম্ল-লবণ**। অম্ল-লবণগুলিকে সাধারণতঃ **বাই-লবণ** (Bi-salt), বা হাইড্রোজেন-লবণও বলা হয়। এইরূপ লবণ অ্যাসিডের আংশিক প্রশমনে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার কিছু অ্যাসিড-ধর্ম অবশিষ্ট থাকে এবং আরও ক্ষারের সহিত বিক্রিয়া ঘটাইয়া উহা অবশেষে শমিত লবণ উৎপন্ন করিতে পারে :

$$NaOH + H_2SO_4 = H_2O + NaHSO_4$$ (অম্ল-লবণ)
$$NaHSO_4 + NaOH = H_2O + Na_2SO_4$$ (শমিত লবণ)

(c) **ক্ষার-লবণ** (Basic Salt) : অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় একাধিক হাইড্রক্সিল (OH) মূলকযুক্ত কোন ক্ষার, বা ক্ষারকের হাইড্রক্সিল মূলকগুলি যদি আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত হয়, তাহা হইলে যে লবণ গঠিত হয় তাহাকে বলে **ক্ষার-লবণ**। এইরূপ লবণ কিছু ক্ষার-ধর্মী হইয়া থাকে ; যেমন—

$$Pb(OH)_2 + HNO_3 = H_2O + Pb(OH)NO_3$$ (বেসিক লেড-নাইট্রেট)

প্রশমন-ক্রিয়া (Neutralisation)

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় প্রকৃতিবিশিষ্ট ; উহা লাল লিট্‌মাসকে নীল করে এবং উহার স্পর্শানুভূতি সাবানের ন্যায় পিচ্ছিল। পক্ষান্তরে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণের স্বাদ অম্ল এবং উহার সংস্পর্শে নীল লিট্‌মাস লাল হয়। এখন, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্রমশঃ ফোঁটা-ফোঁটা করিয়া যোগ করা হইতে থাকে, তাহা হইলে অবশেষে এমন একটা সময় আসিবে যখন মিশ্র দ্রবণটির আম্লিক, বা ক্ষারীয় কোন ধর্মই পরিলক্ষিত হইবে না, অর্থাৎ এই দ্রবণে নীল লিট্‌মাস লাল হইবে না, লাল লিট্‌মাসও নীল হইবে না। এই দ্রবণটি **প্রশম দ্রবণ** (neutral solution), অর্থাৎ পূর্ণ-প্রশমিত লবণের জলীয় দ্রবণ। অ্যাসিড ও ক্ষারের এইরূপ যে পারস্পরিক বিক্রিয়ায় অ্যাসিডের অম্লত্ব ও ক্ষারের ক্ষারত্ব উভয়ই সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায়, সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **প্রশমন-ক্রিয়া** (neutralisation)।

বস্তুতঃপক্ষে, যে-কোন অ্যাসিড ও ক্ষারের পারস্পরিক প্রশমন-ক্রিয়ায় সর্বদাই কোন লবণ ও জল উৎপন্ন হইয়া থাকে ; যেমন—

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

$$2NH_4OH + H_2SO_4 = (NH_4)_2SO_4 + 2H_2O$$

জারণ ও বিজারণ
(Oxidation and Reduction)

পাঠ্যসূচী: জারণ ও বিজারণ।

জারণ-ক্রিয়া (Oxidation)

কোন পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ-ক্রিয়াকে সাধারণতঃ জারণ বলা হয়; কিন্তু ব্যাপক অর্থে আরও নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া জারণ-ক্রিয়ার পর্যায়ভুক্ত ; যেমন—

(i) **অক্সিজেন-সংযোগ :** কোন পদার্থের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়াকে সাধারণতঃ বলা হয় জারণ (oxidation), আর উৎপন্ন পদার্থটিকে বলে **জাড়িত পদার্থ** (oxidised substance), যথা—

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O \qquad 4P + 5O_2 = 2P_2O_5$$
$$2Mg + O_2 = 2MgO \qquad 2SO_2 + O_2 = 2SO_3$$

(ii) **ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌলের সংযোগ :** অক্সিজেনের ন্যায় ক্লোরিন, সাল্‌ফার প্রভৃতি কোন ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌল অপর কোন মৌলের সহিত যুক্ত হইলে, অথবা কোন যৌগিক পদার্থের ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌলিক, বা যৌগ-মূলক উপাদানের আনুপাতিক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সেই সকল বিক্রিয়াকেও ব্যাপক অর্থে জারণ-ক্রিয়া বলে ; যথা—

$$2Na + Cl_2 = 2NaCl \quad ; \quad 2FeCl_2 + Cl_2 = 2FeCl_3$$

(iii) **হাইড্রোজেন-অপসারণ :** যে-সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোন যৌগ হইতে তাহার হাইড্রোজেন উপাদান অপসারিত, বা বিদূরিত হয়, তাহাদেরও জারণ-ক্রিয়া বলা হয় ; যেমন—

$$4HCl + MnO_2 = MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$$
$$H_2S + Br_2 = S + 2HBr$$

(iv) **ধন-তড়িদ্বাহী মৌলের অপসারণ :** কেবল হাইড্রোজেনই নহে, কোন যৌগ হইতে যে বিক্রিয়ার ফলে উহার ধন-তড়িদ্বাহী ধাতব মৌল উপাদান অপসারিত হয়, তাহাকেও জারণ-ক্রিয়া বলে ; যথা—

$$2KBr + 4HNO_3 = 2KNO_3 + 2NO_2 + 2H_2O + Br_2$$

সংজ্ঞা ঃ যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন পদার্থের সহিত (*a*) অক্সিজেন, বা (*b*) কোন ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌল, অথবা যৌগ-মূলকের সংযোগ ঘটে, অথবা কোন পদার্থ হইতে (*c*) হাইড্রোজেন, বা (*d*) কোন ধন-তড়িদ্বাহী মৌলের অপসারণ ঘটে, তাহাকে বলা হয় **জারণ-ক্রিয়া** (oxidation)।

বিজারণ-ক্রিয়া (Reduction)

বিজারণ-ক্রিয়া জারণ-ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ অর্থে বিজারণ বলিতে অক্সিজেন-অপসারণের বিক্রিয়া বুঝাইলেও অনুরূপ বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া বিজারণ পর্যায়ভুক্ত ; যেমন—

(i) **অক্সিজেন-অপসারণ ঃ** যে বিক্রিয়ায় কোন যৌগ হইতে অক্সিজেন অপসারিত হয়, তাহাকে সাধারণভাবে বিজারণ-ক্রিয়া বলা হয় ; যথা—

$4H_2O + 3Fe = 4H_2 + Fe_3O_4$; $CuO + H_2 = Cu + H_2O$

(ii) **ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌল, বা যৌগ-মূলকের অপসারণ ঃ** যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন যৌগ হইতে উহার ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌলিক, বা যৌগ-মূলক উপাদান অপসারিত হয়, তাহাকেও বিজারণ-ক্রিয়া বলে ; যথা—

$$2HCl + Zn = ZnCl_2 + H_2$$

$$Fe_2(SO_4)_3 + 2H = 2FeSO_4 + H_2SO_4$$

(iii) **হাইড্রোজেন-সংযোগ ঃ** কোন মৌলের সহিত হাইড্রোজেনের সংযোগ-ক্রিয়াকেও বিজারণ-ক্রিয়া বলা হয় ; যেমন—

$Cl_2 + H_2 = 2HCl$; $SO_2 + 2H_2O + I_2 = 2HI + H_2SO_4$

(iv) **ধন-তড়িদ্বাহী মৌলের সংযোগ ঃ** যে বিক্রিয়ায় কোন ধাতব ধন-তড়িদ্বাহী মৌল অপর কোন মৌলের সহিত যুক্ত হয়, অথবা কোন যৌগিক পদার্থে তাহার সংগঠক ধন-তড়িদ্বাহী ধাতব মৌল উপাদানের আনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটে, তাহাকেও ব্যাপক অর্থে বিজারণ-ক্রিয়া বলা হয় ; যথা—

$2K + Cl_2 = 2KCl$; $Fe + S = FeS$

সংজ্ঞা ঃ যে-সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন পদার্থ হইতে (*a*) অক্সিজেন, বা (*b*) কোন ঋণ-তড়িদ্বাহী মৌল, অথবা যৌগ-মূলকের অপসারণ, বা আনুপাতিক পরিমাণের হ্রাস ঘটে, অথবা কোন পদার্থের সহিত (*c*) হাইড্রোজেন, বা (*d*) কোন ধন-তড়িদ্বাহী মৌলের সংযোগ ঘটে, তাহাদের **বিজারণ-ক্রিয়া** (reduction) বলা হয়।

জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক :

জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া পরস্পরের সহায়ক, বা পরিপূরক বিক্রিয়া। কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে একটি পদার্থ **জারিত** (oxidised) হইলে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অপর কোন একটি পদার্থ অবশ্যই **বিজারিত** (reduced) হইতে হইবে। যে-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় **জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া সর্বদা একই সঙ্গে ঘটিয়া থাকে** ; কোন বিক্রিয়ায়ই কেবল জারণ, বা বিজারণ ক্রিয়া এককভাবে ঘটিতে পারে না। জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া যে একই সঙ্গে ঘটে, তাহা নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝা যাইবে :

জারণ

(i) $3Fe + 4H_2O = Fe_3O_4 + 4H_2$

বিজারণ

জারণ

(ii) $H_2S + Cl_2 = 2HCl + S$

বিজারণ

যে-কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া যে একই সঙ্গে চলে, জারণ ব্যতীত বিজারণ ক্রিয়া চলিতে পারে না ; তাহা উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দুইটি হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বায়ু (Air)

পাঠ্যসূচী: তরল বায়ু; নাইট্রোজেন-চক্র ও কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র (সাধারণ ধারণা); বায়ুর বিরল গ্যাসীয় উপাদানগুলির ব্যবহার—নিয়ন-আলোক।

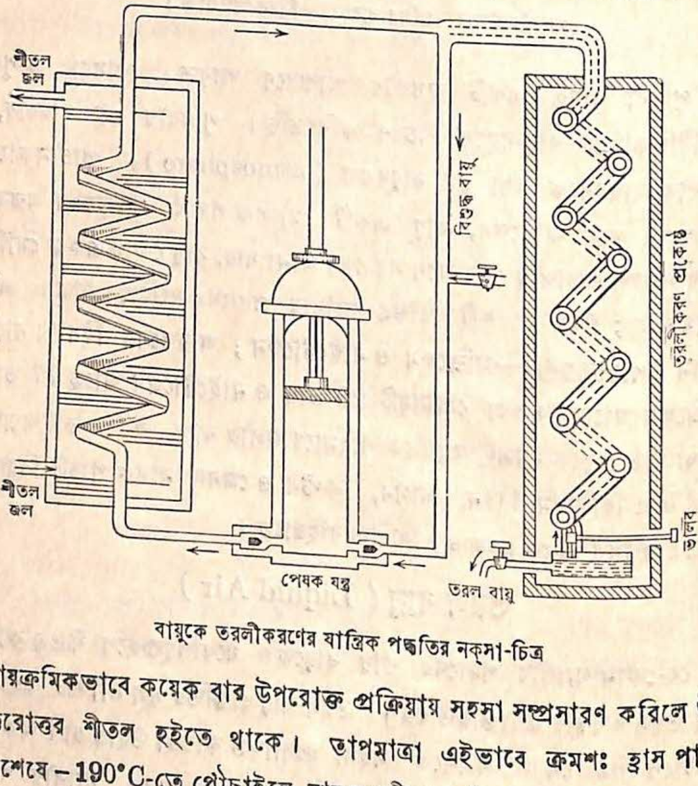
পৃথিবী বায়ুর একটি সুগভীর আস্তরণে আবৃত; আমরা ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থিত এই বায়ু-সমুদ্রে বিচরণ করিতেছি। পৃথিবীর এই বায়বীয়, বা গ্যাসীয় আবরণকে বলা হয় বায়ুমণ্ডল (atmosphere)। প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণ মনে করিতেন, বায়ু একটি মৌলিক পদার্থ, পঞ্চভূতের অন্যতম। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সর্বপ্রথম জানা যায়, বায়ু কোন একক মৌলিক পদার্থ নহে; ইহা কয়েকটি বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণ মাত্র। বায়ুর প্রধান উপাদান দুইটি—অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন; আয়তনের হিসাবে বায়ুতে অক্সিজেন আছে শতকরা মোটামুটি 20 ভাগ ও নাইট্রোজেন আছে 77 ভাগ। এতদ্ব্যতীত বায়ুতে সর্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস এবং হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন ও জেনন নামক পাঁচটি বিরল ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস (rare gases) মিশ্রিত রহিয়াছে।

তরল বায়ু (Liquid Air)

যে-কোন গ্যাসীয় পদার্থের ন্যায় বায়ুকেও যথোপযুক্তরূপে শীতল করিলে উহা তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। তরল-বায়ু প্রস্তুতির মূল নীতিটি এইরূপ: উচ্চচাপে পিষ্ট কোন গ্যাসকে সহসা প্রসারিত করিয়া উহার চাপ অকস্মাৎ অতি মাত্রায় হ্রাস করিলে গ্যাসটির তাপমাত্রা যথেষ্ট হ্রাস পায়। গ্যাসীয় পদার্থ শীতলীকরণের এই পদ্ধতিকে বলা হয় জুল-থমসন ক্রিয়া (Joule-Thomson Effect)।

বায়ুকে প্রথমে অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও কষ্টিক পটাস-পূর্ণ কয়েকটি স্তম্ভের মধ্য দিয়া পর-পর কয়েকবার চালনা করিয়া উহাকে বিশুষ্ক ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড মুক্ত করা হয়। অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বায়ুর জলীয়

বাষ্প এবং কষ্টিক পটাস কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষণ করিয়া লয়। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে এই বিশুদ্ধ ও বিশুষ্ক বায়ুকে অতি উচ্চ-চাপে পিষ্ট করিয়া প্রকোষ্ঠের বাহিরে ঠাণ্ডা জলস্রোতের সাহায্যে উহাকে শীতল করা হয়। এই শীতল ও উচ্চচাপ-পিষ্ট বায়ুকে একটি দীর্ঘ কুণ্ডলীকৃত সরু নলের মধ্য দিয়া চালিত করিয়া একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সহসা একটি বৃহদায়তন প্রকোষ্ঠে নির্গত করা হয়। এইরূপ সহসা সম্প্রসারণের ফলে বায়ু যথেষ্ট শীতল হইয়া পড়ে। এই শীতল বায়ুকে পুনরায় চাপপিষ্ট (compressed) করিয়া উহাকে



বায়ুকে তরলীকরণের যান্ত্রিক পদ্ধতির নক্সা-চিত্র

পর্যায়ক্রমিকভাবে কয়েক বার উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় সহসা সম্প্রসারণ করিলে উহা উত্তরোত্তর শীতল হইতে থাকে। তাপমাত্রা এইভাবে ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া অবশেষে $-190^\circ C$-তে পৌঁছাইলে বায়ু তরলীভূত হইয়া পড়ে।

তরল বায়ু জলের ন্যায় স্বচ্ছ তরল পদার্থ। উহা প্রধানতঃ তরল অক্সিজেন (স্ফুটনাংক $-183^\circ C$) ও তরল নাইট্রোজেন (স্ফুটনাংক $-195^\circ C$)-এর মিশ্রণ; এতদ্ব্যতীত উহাতে বিরল গ্যাসগুলিও তরল অবস্থায় সামান্য পরিমাণে (শতকরা মাত্র এক ভাগ) মিশ্রিত থাকে। তরল বায়ুর সর্বপ্রধান ব্যবহারিক প্রয়োগ হইল, ইহা বিশুদ্ধ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও বিরল গ্যাসগুলির

শিল্পোৎপাদনের প্রধান উৎস। তরল বায়ুর বারংবার আংশিক-পাতন প্রক্রিয়ায় অবশেষে প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পাওয়া যায়

নাইট্রোজেন-চক্র (Nitrogen Cycle)

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের কোষে **প্রোটিন** (Protein)-নামক নাইট্রোজেন-ঘটিত এক প্রকার জটিল জৈব যৌগের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক ; বস্তুতঃ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য নাইট্রোজেন একটি অপরিহার্য মৌল উপাদান। বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রধানতঃ অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বিভিন্ন উপায়ে এই বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া দেহের প্রয়োজনীয় প্রোটিন-উপাদান প্রস্তুত করে। আবার, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ হইতে এই প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হইয়া নাইট্রোজেন বিমুক্ত হয় এবং পুনরায় বায়ুমণ্ডলে মেশে। এইভাবে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনের পরিমাণ সর্বদা মোটামুটি স্থির থাকে। নানারূপ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল হইতে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে, এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ হইতে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের এইরূপ চক্রাবর্তনের বিভিন্ন পরিবর্তন-প্রক্রিয়াগুলিকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় **নাইট্রোজেন-চক্র** (Nitrogen Cycle)।

(ক) **নাইট্রোজেন আহরণ** ঃ উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন আহরণ করে বিভিন্ন রূপ মোটামুটি দুইটি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ; যথা—

(i) আকাশে মেঘের বিদ্যুৎক্ষরণ ও বজ্রপাত-কালে বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পারস্পরিক রাসায়নিক সংযোগে প্রথমে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ও পরে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) উৎপন্ন হয় এবং উহা বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড রূপে মাটিতে আসিয়া মেশে। মৃত্তিকাস্থিত বিভিন্ন ক্ষারীয় পদার্থ এই নাইট্রিক অ্যাসিডকে প্রশমিত করিয়া বিভিন্ন **নাইট্রেট**-লবণে পরিণত করে এবং উদ্ভিদেরা এই নাইট্রেট-লবণের জলীয় দ্রবণ শিকড়ের মাধ্যমে শোষণ করিয়া জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিজ দেহে নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন খাদ্যোপাদান প্রস্তুত করে।

(ii) ছোলা, শিম ইত্যাদি লিগুমিনাস (leguminous) জাতীয় কোন-কোন উদ্ভিদ-মূলের গুঁটিতে উপস্থিত অ্যাজোটোব্যাক্টার (azotobacter)

নামক এক প্রকার জীবাণু বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনকে সরাসরি নাইট্রেট যৌগে সংবদ্ধ করিয়া উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করে। মাটি হইতে এই নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণ শোষণ করিয়া উদ্ভিদেরা নিজ দেহ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

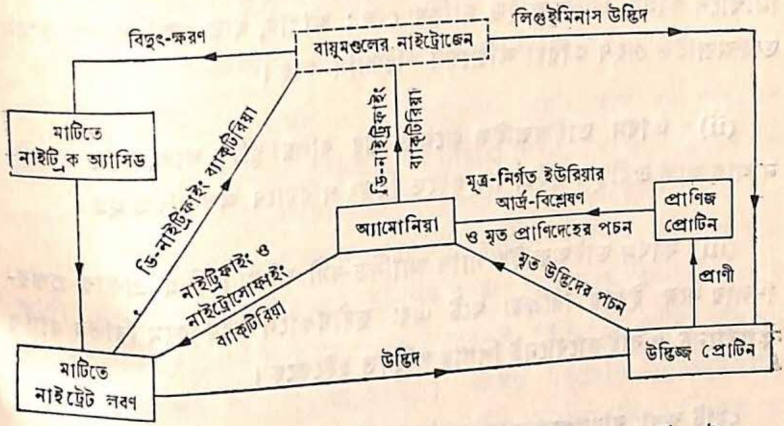
প্রাণীরা প্রোটিন-খাদ্যের মাধ্যমে নাইট্রোজেন আহরণ করে উদ্ভিদজগৎ হইতে; নিরামিষাশী প্রাণীরা সরাসরি বিভিন্ন উদ্ভিদ হইতে, এবং মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজী প্রাণিদেহের মাংস হইতে প্রোটিন আত্মসাৎ করিয়া নিজ দেহ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ এইভাবে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিলেও বায়ুতে কিন্তু নাইট্রোজেনের পরিমাণের বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটে না; কারণ, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণদেহের নাইট্রোজেন-উপাদান বিমুক্ত হইয়া পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া যায়।

(খ) **নাইট্রোজেন বর্জন :** বিভিন্ন প্রাণীর মূত্রে ইউরিয়া $[CO(NH_2)_2]$ নামক এক প্রকার জৈব যৌগ থাকে। ইহা জলের সংস্পর্শে আর্দ্র-বিশ্লেষিত (hydrolysed) হইয়া অ্যামোনিয়া (NH_3) বিমুক্ত করে। আবার, মৃত উদ্ভিদ, বা প্রাণিদেহ মাটিতে পচিয়াও অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয়। এই অ্যামোনিয়া মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রিফাইং (nitrifying) ও নাইট্রোসোফাইং (nitrosofying) নামক দুই প্রকার ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে প্রথমে নাইট্রাইট ও পরে নাইট্রেট লবণে পরিণত হয়। এই নাইট্রেট লবণের কতকাংশ উদ্ভিদেরা খাদ্য রসরূপে গ্রহণ করে এবং মাটিতে ইহার কিয়দংশ ও অ্যামোনিয়া মৃত্তিকাস্থিত ডি-নাইট্রিফাইং (de-nitrifying) নামক অপর এক প্রকার ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে বিশ্লিষ্ট হইয়া আবার নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয় এবং বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়।

এইভাবে বায়ুমণ্ডল এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাইট্রোজেন আদান-প্রদানের ফলে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষিত হয়; এই প্রাকৃতিক পদ্ধতিটিকে বলা হয় নাইট্রোজেন-চক্র। নিম্নের চিত্রটিতে নাইট্রোজেন-চক্রের উল্লিখিত বিভিন্ন ধারাগুলি ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা হইল :

নাইট্রোজেন চক্র :



নাইট্রোজেন-চক্রের বিভিন্ন পর্যায় ও প্রক্রিয়াগুলি নির্দেশিকার সাহায্যে প্রদর্শিত হইল

কার্বন চক্র (Carbon Cycle)

শ্বাস-ক্রিয়ায় প্রাণী ও উদ্ভিদেরা বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের সংগঠক কার্বনের মৃদু দহনে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইয়া নিঃশ্বাসের সহিত নির্গত হয়। কেবল এই প্রক্রিয়াই চলিতে থাকিলে বায়ুর সম্যক অক্সিজেন কালক্রমে ব্যয়িত হইয়া যাইত এবং অক্সিজেনের অভাবে কোন প্রাণী, বা উদ্ভিদ বাঁচিত না ; পৃথিবী জীবশূন্য হইত। কিন্তু জীবজগৎ ধ্বংসের এই আশঙ্কা প্রকৃতির আপন বিধানে স্বতঃই নিবারিত হইতেছে। নিম্নলিখিত তিনটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় বায়ুতে মিশ্রিত কার্বন ডাই-অক্সাইড বিশ্লিষ্ট হইয়া অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে বিমুক্ত হইতেছে :

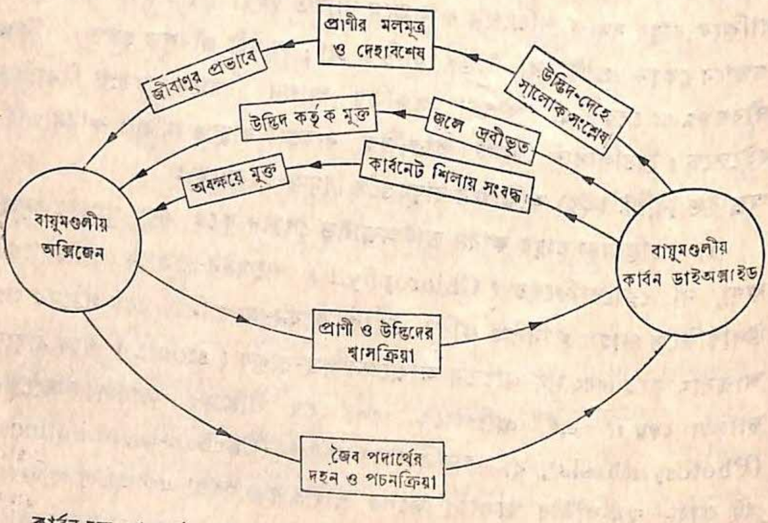
(i) উদ্ভিদেরা বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং পাতার সবুজ-কণা, বা ক্লোরোফিলের (Chlorophyll) অনুঘটন-প্রভাবে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উহার কার্বন-অংশ নিজ দেহ গঠনের জন্য আত্মসাৎ করে এবং সম-আয়তন অক্সিজেন পত্র-রন্ধ্রের (stoma) পথে বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় উদ্ভিদের **সালোকসংশ্লেষ** (Photosynthesis), বা **কার্বন-আত্তীকরণ** (Carbon-assimilation)। এই কার্বন সূর্য-শক্তির প্রভাবে জলের সহিত যুক্ত হইয়া এক জটিল প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ-দেহে বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট (carbohydrate), বা শ্বেতসার খাদ্যে

পরিণত হয়। এইভাবে উদ্ভিদেরা প্রশ্বাস-ক্রিয়ায় বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে ও নিঃশ্বাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়িয়া দেয়; আবার, খাদ্য-প্রস্তুতির জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করিয়া অক্সিজেন পরিত্যাগ করে।

(ii) কার্বন ডাইঅক্সাইড জলে দ্রবণীয় বলিয়া বৃষ্টির জলে, সমুদ্র ও নদী-নালার জলে দ্রবীভূত হইয়া বায়ু হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অপসারিত হয়।

(iii) কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস অ্যাসিড-ধর্মী বলিয়া বিভিন্ন প্রকার প্রস্তর-শিলার সঙ্গে ইহার বিক্রিয়া ঘটে এবং সুদীর্ঘকালে ক্রমে-ক্রমে বিভিন্ন ধাতব কার্বোনেট ও বাইকার্বোনেট শিলায় পরিণত হইতেছে।

মোট কথা, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমতা বিধানের জন্য প্রকৃতিতে নানারূপ জটিল ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলিতেছে। প্রকৃতিতে কার্বন, তথা কার্বন ডাইঅক্সাইডের এইরূপ ধারাবাহিক উৎপত্তি ও অপসারণের বিবিধ ক্রিয়া-বিক্রিয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় কার্বন, বা কার্বন ডাইঅক্সাইডের আবর্তন-চক্র, অথবা সংক্ষেপে **কার্বন-চক্র (Carbon Cycle)**। চিত্রের সাহায্যে ইহাকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে:



কার্বন চক্র, বা কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া-ঘটিত চক্রাবর্তনের চিত্ররূপ

বায়ুর বিরল গ্যাসীয় উপাদানগুলির ব্যবহার

(Use of the rare gases in air)

বায়ুতে প্রধানতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সহিত অতি স্বল্প পরিমাণে পাঁচটি বিরল গ্যাস মিশ্রিত রহিয়াছে: হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন ও জেনন। ইহাদের প্রধান প্রধান ব্যবহারিক প্রয়োগ নিম্নে আলোচিত হইল:

(i) **হিলিয়াম:** হিলিয়াম গ্যাস হাইড্রোজেন অপেক্ষা সামান্য মাত্র ভারী; কিন্তু ইহা একটি অদাহ্য গ্যাস। এই কারণে আজকাল বেলুন উত্তোলনে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে হিলিয়াম প্রায়শঃই ব্যবহৃত হয়। হিলিয়াম মানুষের রক্তে নাইট্রোজেন অপেক্ষা স্বল্প দ্রবণীয়; এইজন্য সমুদ্রগর্ভে অবতরণকালে ডুবুরি-কক্ষে (diving bell) সাধারণ বায়ুর পরিবর্তে আজকাল অক্সিজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। অতি নিম্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে তরল হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়; কারণ, সাধারণ অন্যান্য গ্যাস অপেক্ষা ইহার স্ফুটনাংক অনেক কম।

(ii) **নিয়ন:** নিয়ন গ্যাসের মধ্য দিয়া অতি নিম্নচাপে বিদ্যুৎক্ষরণ করিলে অত্যুজ্জ্বল লাল আলোক নির্গত হয়। নিয়নের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে অন্যান্য বিরল গ্যাস মিশ্রিত করিলে অনুরূপ অবস্থায় বিভিন্ন বর্ণের উজ্জ্বল আলোক পাওয়া যায়। এই প্রকার **নিয়ন-আলোক** (Neon-light) অতি সুদৃশ্য এবং বহু দূর হইতে ঘন কুয়াশার মধ্যেও দেখা যায়। এইজন্য সুদৃশ্য আলোক-সজ্জা ও সমুদ্রের আলোক-স্তম্ভে আলোক-সংকেতরূপে নিয়ন-আলোকের ব্যবহার যথেষ্ট ব্যাপক।

(iii) **আর্গন:** সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতিতে অতি স্বল্প চাপে আর্গন গ্যাস পূর্ণ থাকে; কারণ, এই গ্যাসের উপস্থিতিতে বাতির টাংস্টেন-তার কুণ্ডলী উত্তাপের প্রভাবে সহজে বাষ্পীভূত হয় না এবং ইহার ফলে বাতির বাল্ব দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

(iv) **ক্রিপ্টন ও জেনন:** বৈদ্যুতিক বাতিতে আর্গন অপেক্ষা এই গ্যাস দুইটির ব্যবহার অনেক বেশী কার্যকরী। খনি-গর্ভে আলোক-উৎপাদনের জন্য যে 'ক্যাপ-ল্যাম্প' ব্যবহার করা হয় তাহার বাল্বে ক্রিপ্টন থাকে। অপ্রতুল আলোকে ছবি তুলিবার জন্য যে ফ্ল্যাশ-লাইট (flash-light) ব্যবহার করা হয় তাহার বাল্বে জেনন গ্যাস ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

কয়েকটি সাধারণ গ্যাস
(Some Common Gases)

পাঠ্যসূচী : কয়েকটি সাধারণ গ্যাসের সহজ প্রস্তুত-প্রণালী ও ধর্ম : অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড।

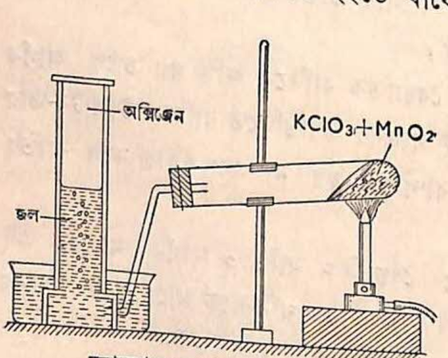
অক্সিজেন (Oxygen)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি) : পটাশিয়াম ক্লোরেটকে যথেষ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় (630°C) উত্তপ্ত করিলে উহা বিয়োজিত হইয়া পটাশিয়াম ক্লোরাইড (KCl)-এ রূপান্তরিত হয় এবং অক্সিজেন (O_2) গ্যাস বিমুক্ত হয় :

$$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2 \uparrow$$

কিন্তু উহার সহিত অনুঘটক হিসাবে সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2) মিশ্রিত করিলে কেবলমাত্র 240°C তাপমাত্রায়ই পটাশিয়াম ক্লোরেট হইতে যথেষ্ট অক্সিজেন গ্যাস বিমুক্ত হইতে থাকে।

পরীক্ষা : সাধারণতঃ চার ভাগ পটাশিয়াম ক্লোরেট ও এক ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের বিচুর্ণিত মিশ্রণ একটি শক্ত ও মোটা কাঁচ-নলে লইয়া উহাকে একটি ধারক-বন্ধনীর সাহায্যে প্রায় অনুভূমিকভাবে সম্মুখের দিকে সামান্য হেলাইয়া রাখা হয়। পরীক্ষা-নলের মুখ একটি নির্গম-নলযুক্ত কর্ক দ্বারা বন্ধ করিয়া মিশ্রণটিকে বুনসেন-বাতির শিখায় উত্তপ্ত করিলে পটাশিয়াম ক্লোরেটের বিয়োজনে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হইতে থাকে। নির্গম-নলের বাঁকানো সরু প্রান্তটি একটি পাত্রের জলে নিমজ্জিত রাখিয়া তাহার উপরে একটি জলপূর্ণ গ্যাস-জার উল্টাইয়া ধরা হয়। গ্যাস-জারে জলের নিম্নাপসারণে অক্সিজেন গ্যাস উহাতে পূর্ণ হইয়া থাকে। এখন জারটির মুখে একখানা কাঁচের ঢাকনি আঁটিয়া এইভাবে-প্রস্তুত অক্সিজেন সঞ্চয় করা যাইতে পারে।



রসায়নাগারে অক্সিজেন প্রস্তুতি

ভৌত ধর্ম ঃ অক্সিজেন স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ। ইহা বায়ু অপেক্ষা সামান্য ভারী এবং জলে অতি সামান্য মাত্রায় দ্রবণীয়।

রাসায়নিক ধর্ম ঃ (i) অক্সিজেন গ্যাস নিজে দাহ্য নহে, কিন্তু অপরাপর দাহ্য পদার্থের দহনের সহায়তা করে; বস্তুতঃ দহন-কালে যে-কোন দাহ্য পদার্থের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে কোন অক্সাইড যৌগ গঠিত হয়। অক্সিজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা সমধিক; উপযুক্ত তাপমাত্রায় অধিকাংশ ধাতব ও অধাতব মৌলের সহিত অক্সিজেন যুক্ত হইয়া উহাদের অক্সাইড যৌগ উৎপন্ন হয়।

(a) হাইড্রোজেন, কার্বন, সালফার প্রভৃতি বিভিন্ন অ-ধাতুর অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে দহন-ক্রিয়ার ফলে জল (জলীয় বাষ্প), কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসীয় অক্সাইড যৌগ উৎপন্ন হয়:

$$C + O_2 = CO_2 \; ; \quad S + O_2 = SO_2 \; ; \quad 2H_2 + O_2 = 2H_2O$$

(b) জলন্ত ম্যাগ্‌নেসিয়াম, উত্তপ্ত সোডিয়াম, বা পটাশিয়াম ধাতু অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করাইলে প্রবলভাবে জ্বলিয়া তীব্র আলোক-শিখার সৃষ্টি করে এবং ধাতব অক্সাইড গঠিত হয়:

$$2Mg + O_2 = 2MgO \quad ; \quad K + O_2 = KO_2$$

(iii) অক্সিজেন একটি তীব্র জারক পদার্থ; যেমন, বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস অক্সিজেনের সংস্পর্শে জারিত হইয়া বাদামী বর্ণের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়; এই বিক্রিয়াটি অক্সিজেন সনাক্তকরণের পক্ষে সহায়ক: $2NO + O_2 = 2NO_2$।

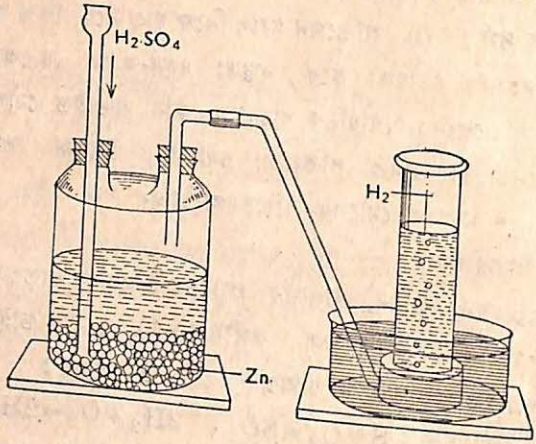
হাইড্রোজেন (Hydrogen)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি) ঃ রসায়নাগারে সাধারণ তাপমাত্রায় জিংকের সহিত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটাইয়া হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাস প্রস্তুত করা হয়:

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2 \uparrow$$

পরীক্ষা ঃ একটি দুই-মুখ-বিশিষ্ট উল্‌ফ্‌-বোতলে (Woulfe's Bottle) সাধারণ অবিশুদ্ধ কিছু জিংকের টুক্‌রা লইয়া তাহার এক মুখে একটি দীর্ঘ-নাল থিসেল-ফানেল (Thistle Funnel) ও অপর মুখে একটি বাঁকানো নির্গম-নল

সছিদ্র কর্কের সাহায্যে বায়ু-নিরুদ্ধভাবে আঁটিয়া দেওয়া হয়। ফানেলটির মধ্য দিয়া বোতলের মধ্যে এমনভাবে জল ঢালা হয় যাহাতে ফানেলের নিম্নপ্রান্তটি জলে



রসায়নাগারে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতি

নিমজ্জিত থাকে। এখন থিসেল-ফানেলের ভিতর দিয়া গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ধীরে ধীরে ঢালিলে জিংকের সহিত অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হইয়া নির্গম-নলের পথে বাহির হইতে থাকে। প্রথম দিকে নির্গত এই হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে উল্ফ্-বোতলের অভ্যন্তরস্থ বায়ু মিশ্রিত হইয়া আসে ; এইরূপ মিশ্রণ অত্যন্ত বিস্ফোরক প্রকৃতির বলিয়া উহাকে সংগ্রহ না করিয়া বায়ুমণ্ডলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে সম্যক বায়ু বাহির হইয়া গেলে নির্গম-নলের বাঁকানো সরু মুখটি একটি গ্যাস-দ্রোণীর জলে নিমজ্জিত রাখিয়া উহার উপরে একটি জলপূর্ণ গ্যাস-জার উল্টাইয়া ধরা হয়। গ্যাস-জারে জলের নিম্নাপসারণে হাইড্রোজেন গ্যাস সঞ্চিত হইতে থাকে। জারের মুখে একটি ঢাকনি আঁটিয়া এই হাইড্রোজেন সংগ্রহ করা হয়।

ভৌত ধর্ম ঃ হাইড্রোজেন একটি বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থ। যাবতীয় গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা হাল্কা ও জলে প্রায় অদ্রাব্য।

রাসায়নিক ধর্ম ঃ (i) হাইড্রোজেন গ্যাস নিজে দাহ্য, কিন্তু অন্যান্য দাহ্য পদার্থের দহনে ইহা সহায়তা করে না। বায়ু, বা অক্সিজেনের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালাইলে উহা নীলাভ শিখায় জ্বলে এবং জল (জলীয় বাষ্প) উৎপন্ন হয় : $2H_2 + O_2 = 2H_2O$। শুষ্ক হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ

অত্যন্ত বিস্ফোরকধর্মী : ইহাতে সামান্য অগ্নিসংযোগ করিলে গ্যাস দুইটির অতি দ্রুত সংযোগের ফলে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে।

(ii) অক্সিজেনের প্রতি হাইড্রোজেনের বিশেষ আসক্তির জন্য ইহা বিশেষভাবে **বিজারণ-ধর্মী**। উত্তপ্ত অবস্থায় কপার, লেড ইত্যাদি কোন-কোন ধাতুর অক্সাইডের উপর দিয়া হাইড্রোজেন গ্যাস চালিত করিলে উহাদের বিজারণের ফলে বিশুদ্ধ ধাতু পাওয়া যায় :

$$CuO + H_2 = Cu + H_2O \quad ; \quad PbO + H_2 = Pb + H_2O$$

জায়মান হাইড্রোজেন (Nascent Hydrogen) : কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় **সদ্য উৎপন্ন হাইড্রোজেনকে বলা হয় জায়মান হাইড্রোজেন** (H)। সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা জায়মান হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা অনেক বেশী ; সাধারণ (সঞ্চিত) হাইড্রোজেন ব্যবহার করিলে যে বিক্রিয়া আদৌ ঘটে না, সদ্যজাত হাইড্রোজেন ব্যবহার করিলে, অর্থাৎ বিক্রিয়ক পদার্থসমূহের ভিতরেই হাইড্রোজেন উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে সেই সদ্যজাত, বা জায়মান হাইড্রোজেন বিক্রিয়াটি অতি দ্রুত নিষ্পন্ন করে। জায়মান হাইড্রোজেনের বিশেষ রাসায়নিক সক্রিয়তার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের বেগুনী বর্ণের জলীয় দ্রবণের মধ্য দিয়া সাধারণ হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করিলে দ্রবণের কোন বর্ণ-পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ঐ দ্রবণের মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ও কয়েক টুকরা জিংক ফেলিলে জিংক ও অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জায়মান হাইড্রোজেন পারম্যাঙ্গানেটকে বিজারিত করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই বর্ণহীন করে :

$$2KMnO_4 + 3H_2SO_4 + 10H = K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8\ H_2O$$

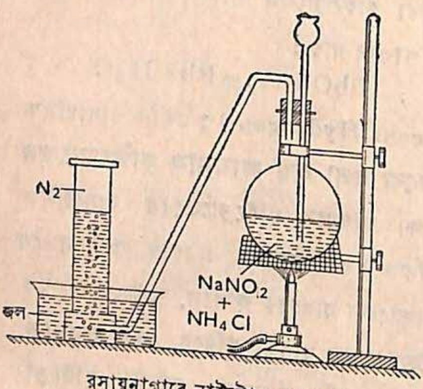
নাইট্রোজেন (Nitrogen)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি) : রসায়নাগারে সাধারণতঃ সোডিয়াম নাইট্রাইট ($NaNO_2$) ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl)-এর মিশ্র জলীয় দ্রবণ উত্তপ্ত করিয়া নাইট্রোজেন (N_2) গ্যাস প্রস্তুত করা হয় ; মিশ্রণের উপাদান দুইটির মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রথমে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট (NH_4NO_2) উৎপন্ন হয় এবং উহা অতঃপর উত্তাপে বিয়োজিত হইয়া নাইট্রোজেন ও জলে পরিণত হয় :

$$NaNO_2 + NH_4Cl = NH_4NO_2 + NaCl$$

$$NH_4NO_2 = N_2 + 2\ H_2O$$

পরীক্ষা ঃ একটি কাঁচ-কুপীতে তিন ভাগ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও চার ভাগ সোডিয়াম নাইট্রাইটের একটি মিশ্রণ লইয়া উহার মুখে থিসেল-ফানেল ও নির্গম-নল সমন্বিত একটি কর্ক আঁটিয়া দেওয়া হয়। থিসেল-ফানেলের ভিতর দিয়া জল ঢালিয়া কুপীতে মিশ্রণটির একটি গাঢ় দ্রবণ তৈয়ারী করা হয়; থিসেল-ফানেলটির নিম্নপ্রান্ত যেন দ্রবণে নিমজ্জিত থাকে সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। এখন কুপীটিকে বুনসেন-বাতির শিখায় উত্তপ্ত করিলে নির্গম-নল দিয়া নাইট্রোজেন গ্যাস বাহির হইতে থাকে। নির্গম-নলের বাঁকানো সরু মুখটি একটি গ্যাস-দ্রোণীর জলে নিমজ্জিত রাখিয়া উহার উপরে একটি জলপূর্ণ গ্যাস-জার উল্টাইয়া ধরিলে জলের নিম্নাপসারণে গ্যাস-জারে নাইট্রোজেন গ্যাস সঞ্চিত হয়। জারের মুখে একটি ঢাকনি আঁটিয়া এইভাবে প্রস্তুত নাইট্রোজেন গ্যাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে।



রসায়নাগারে নাইট্রোজেন প্রস্তুতি

ভৌত ধর্ম ঃ নাইট্রোজেন স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন একটি মৌলিক গ্যাস। ইহা জলে অতি সামান্য মাত্রায় দ্রবণীয় এবং বায়ু অপেক্ষা সামান্য হাল্‌কা।

রাসায়নিক ধর্ম ঃ (i) নাইট্রোজেন গ্যাস দাহ্যও নহে, দাহকও নহে; জলন্ত পাটকাঠি নাইট্রোজেন গ্যাসে প্রবেশ করাইলে কাঠিটি নিভিয়া যায়, গ্যাসটিও জলে না।

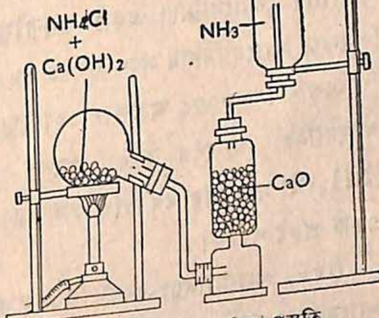
(ii) নাইট্রোজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা অত্যন্ত কম; সাধারণ তাপমাত্রায় ইহা কোন পদার্থের সঙ্গেই বিক্রিয়া করে না, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু উচ্চতর তাপমাত্রায় নাইট্রোজেনের সঙ্গে কোন-কোন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়; যেমন — নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের গ্যাসীয় মিশ্রণকে অতি উচ্চ চাপে (200 বায়ুচাপ) ও 550°C তাপমাত্রায় সামান্য মলিব্‌ডেনাম-মিশ্রিত সূক্ষ্ম আয়রন-চূর্ণ অনুঘটকের উপর দিয়া প্রবাহিত করিলে উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাস উৎপন্ন হয়ঃ

$$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$$

অ্যামোনিয়া (Ammonia)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি) : যে-কোন অ্যামোনিয়াম লবণের সঙ্গে যে-কোন ক্ষারের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন হয়। রসায়নাগারে সাধারণতঃ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) ও ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Ca(OH)_2$]-এর মিশ্রণকে উত্তপ্ত করিয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত করা হয় : $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$

পরীক্ষা : একটি শক্ত কাঁচ-কুপীতে এক ভাগ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও দুই ভাগ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড (জলীয় চুন)-এর মিশ্রণ লইয়া কুপীর মুখে একটি নির্গম-নলযুক্ত কর্ক দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া দেওয়া হয়। কুপীটিকে একটি ধারক-বন্ধনীর সাহায্যে তার-জালির উপরে বসাইয়া বুনসেন-দীপের শিখায় উত্তপ্ত করিলে নির্গম-নল দিয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস বাহির হয়। এই অ্যামোনিয়ার সহিত কিছু জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অ্যামোনিয়া পাইতে হইলে গ্যাসটিকে পোড়াচুন (CaO)-পূর্ণ একটি স্তম্ভের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া বিশুদ্ধ করা হয়। অতঃপর স্তম্ভের সহিত সংযুক্ত একটি নির্গম-নলের উর্ধ্বমুখী প্রান্তের উপরে একটি গ্যাস-জার উল্টাইয়া ধরিলে বায়ুর নিম্নাপসারণে গ্যাস-জারে অ্যামোনিয়া সঞ্চিত হয়; কারণ, অ্যামোনিয়া বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা। জারের মুখে একটি ঢাকনি আঁটিয়া এইভাবে প্রস্তুত অ্যামোনিয়া গ্যাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে।



রসায়নাগারে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি

ভৌত ধর্ম : অ্যামোনিয়া তীব্র ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ। ইহা বায়ু অপেক্ষা যথেষ্ট হাল্‌কা এবং জলে সবিশেষ দ্রবণীয়। ইহার সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণে ওজন-ভিত্তিক শতকরা 35 ভাগ অ্যামোনিয়া থাকে। এইরূপ দ্রবণকে বলা হয় 'অ্যামোনিয়া-দ্রাব' (Liquor Ammonia)।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) অ্যামোনিয়া দাহ্য, বা দাহক গ্যাস নহে; একটি জ্বলন্ত দেশলাই-কাঠি ইহার মধ্যে ধরিলে কাঠিটি নিভিয়া যায়, গ্যাসটিও জ্বলে না।

(ii) জলীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়া ও জলের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্ষারক উৎপন্ন হয় : $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH$; এইজন্যই অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণের ক্ষারীয় ধর্ম লক্ষ্য করা যায় এবং ইহার সংস্পর্শে লাল লিট্‌মাস নীল বর্ণ ধারণ করে।

অনেক ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়া-দ্রবণ যুক্ত করিলে ধাতুগুলি অদ্রাব্য হাইড্রক্সাইড যৌগরূপে অধঃক্ষিপ্ত হয় :

$$FeCl_3 + 3NH_4OH = 3\ NH_4Cl + Fe(OH)_3 \downarrow$$

কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়া-দ্রবণ যোগ করিলে প্রথমে ক্ষারীয় কপার সালফেটের হাল্‌কা নীল অধঃক্ষেপ পড়ে ; ইহা আবার অতিরিক্ত অ্যামোনিয়ার সহিত বিক্রিয়ায় জলে দ্রাব্য কিউপ্র্যামোনিয়াম সালফেট $[Cu(NH_3)_4SO_4]$ উৎপন্ন করিবার ফলে গাঢ় নীল বর্ণের দ্রবণ পাওয়া যায়।

(iii) অ্যামোনিয়া একটি **ক্ষারীয়** পদার্থ ; উহার সহিত অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম লবণ উৎপন্ন হয় : $NH_3 + HCl = NH_4Cl$।

একটি কাঁচ-দণ্ডের অগ্রভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ডুবাইয়া উহাকে অ্যামোনিয়া গ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করাইলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের (NH_4Cl) গাঢ় সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় ; ইহা অ্যামোনিয়া গ্যাস সনাক্তকরণের একটি প্রকৃষ্ট পরীক্ষা।

(iv) অ্যামোনিয়া একটি **বিজারক পদার্থ**। ক্লোরিনের সহিত বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া জারিত হইয়া নাইট্রোজেন বিমুক্ত হয় ; অ্যামোনিয়ার পরিমাণ অধিক থাকিলে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়ার সহিত উৎপন্ন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড গঠিত হয় :

$$2NH_3 + 3Cl_2 = 6HCl + N_2\ ;\ NH_3 + HCl = NH_4Cl$$

(v) 500°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত প্ল্যাটিনামের অনুঘটন-প্রভাবে অ্যামোনিয়া অক্সিজেন (বা বায়ু) দ্বারা জারিত হইয়া নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয় : $4NH_3 + 5O_2 = 4NO + 6H_2O$

(vi) লোহিত-তপ্ত সোডিয়াম ধাতুর উপর দিয়া অ্যামোনিয়া চালিত করিলে হাইড্রোজেন গ্যাস বিমুক্ত হইয়া সোডামাইড ($NaNH_2$) যৌগ উৎপন্ন হয় ; ইহা আবার জলের সংস্পর্শে আর্দ্র-বিশ্লেষিত হইয়া পুনরায় অ্যামোনিয়া বিমুক্ত করে : $2Na + 2NH_3 = 2NaNH_2 + H_2$;

$$NaNH_2 + H_2O = NaOH + NH_3$$

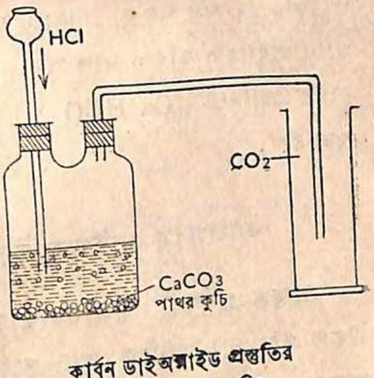
কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon Dioxide)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি): রসায়নাগারে সাধারণতঃ মার্বেল-পাথর (ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, $CaCO_3$)-এর সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস প্রস্তুত করা হয় :

$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2 \uparrow$$

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরিবর্তে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করিলে অসুবিধা ঘটে এই যে, উৎপন্ন ক্যালসিয়াম সালফেট ($CaSO_4$) জলে অদ্রাব্য বলিয়া মার্বেল-পাথরের উপরে উহার একটি আস্তরণ জমে এবং তাহার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিক্রিয়াটি বন্ধ হইয়া যায়।

পরীক্ষা : এক মুখে থিসেল-ফানেল ও অপর মুখে নির্গম-নলযুক্ত একটি উল্ফ্-বোতলে কিছু মার্বেল-পাথরের টুকরা ও জল লওয়া হয়, যাহাতে থিসেল-ফানেলের নিম্নপ্রান্ত জলে নিমজ্জিত থাকে। এখন ফানেলটির মধ্য দিয়া গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অল্প অল্প করিয়া যোগ করিলে মার্বেল-পাথরের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় বুদবুদের আকারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উদ্ভূত হইয়া নির্গম-নলের পথে বাহির হয়। নির্গম-নলের খোলামুখটি একটি গ্যাস-জারে প্রবেশ করাইলে বায়ুর উর্ধ্বাপসারণে গ্যাস-জারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সঞ্চিত হয় ; কারণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী।



কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতির রসায়নাগার পদ্ধতি

ভৌত ধর্ম : কার্বন ডাইঅক্সাইড ঈষৎ ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত একটি বর্ণহীন যৌগিক গ্যাস ; ইহার স্বাদ ঈষৎ অম্ল। কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ ভারী এবং জলে যথেষ্ট দ্রবণীয়। ইহা বিষাক্ত না হইলেও এই গ্যাসের মধ্যে জীবের শ্বাস-ক্রিয়া চলে না।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি **অ্যাসিড-ধর্মী** অক্সাইড ; উহার জলীয় দ্রবণে **কার্বনিক অ্যাসিড** (H_2CO_3) নামে একটি

মৃদু, অস্থায়ী অ্যাসিড উৎপন্ন হয়: $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$, এবং এই দ্রবণের সংস্পর্শে নীল লিট্মাস লাল বর্ণ ধারণ করে।

(ii) কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দাহ্যও নহে, দাহকও নহে; ইহার মধ্যে জলন্ত পাটকাঠি, বা মোমবাতি প্রবেশ করাইলে তাহা নিভিয়া যায়, গ্যাসটিও জ্বলে না। কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে জ্বলন্ত ম্যাগ্নেসিয়াম, সোডিয়াম, বা পটাশিয়াম ধাতু জ্বলিতে থাকে; ধাতুগুলির অক্সাইড যৌগ গঠিত হয় এবং সূক্ষ্ম কার্বন-কণিকা বিমুক্ত হওয়ার ফলে কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়:

$$2Mg + CO_2 = 2\ MgO + C$$

(iii) কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাসিড-ধর্মী অক্সাইড বলিয়া উহার সহিত ক্ষার, বা ক্ষারকের বিক্রিয়ায় কার্বোনেট ও বাইকার্বোনেট লবণ গঠিত হয়। পরিষ্কার স্বচ্ছ চুন-জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করিলে প্রথমে **জলে-অদ্রবণীয়** ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO_3$) লবণ উৎপন্ন হওয়ার ফলে পরিষ্কার চুন-জল অস্বচ্ছ, ঘোলাটে হইয়া যায়। উহার মধ্যে অতিরিক্ত CO_2 গ্যাস প্রবাহিত করিলে জলে-অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বোনেট **দ্রাব্য** ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেটে [$Ca(HCO_3)_2$] পরিণত হইয়া দ্রবণটি পুনরায় পরিষ্কার স্বচ্ছ হয়।

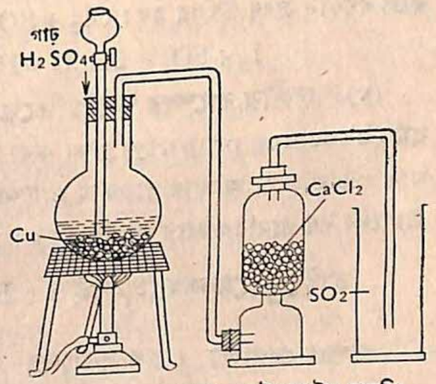
সালফার ডাইঅক্সাইড (Sulphur Dioxide)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি): রসায়নাগারে সাধারণতঃ উত্তপ্ত গাঢ় সাল্ফিউরিক অ্যাসিডকে ধাতব কপার দ্বারা বিজারিত করিয়া সাল্ফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) গ্যাস প্রস্তুত করা হয়:

$$2H_2SO_4 + Cu = CuSO_4 + 2H_2O + SO_2 \uparrow$$

পরীক্ষা: থিসেল-ফানেল ও নির্গম-নলযুক্ত একটি কাঁচ-কুপীতে কিছু ধাতব কপারের টুক্রা লইয়া ফানেলের মধ্য দিয়া গাঢ় সাল্ফিউরিক অ্যাসিড এমনভাবে ঢালা হয়, যাহাতে ফানেলের নিম্নপ্রান্ত অ্যাসিডে নিমজ্জিত থাকে। এখন কুপীটিকে ধারক-বন্ধনীর সাহায্যে একটি তার-জালির উপর বসাইয়া বুনসেন-দীপের শিখায় উত্তপ্ত করিলে কপার ও অ্যাসিডের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইয়া নির্গম-নলের পথে নির্গত হয়। এইভাবে প্রস্তুত সাল্ফার ডাইঅক্সাইডে কিছু জলীয় বাষ্প

মিশ্রিত থাকে। বিশুদ্ধ গ্যাস পাইতে হইলে উহাকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$), অথবা ফস্‌ফরাস পেণ্টক্সাইড (P_2O_5), যে-কোন একটি পদার্থ-পূর্ণ স্তম্ভের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া বিশুদ্ধ করা হইয়া থাকে এবং অতঃপর বায়ুর উর্ধ্বাপসারণ ব্যবস্থায় গ্যাস-জারে সংগ্রহ করা হয়; কারণ, ইহা বায়ু অপেক্ষা ভারী।



রসায়নাগারে সালফার ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতি

ভৌত ধর্ম : সালফার ডাইঅক্সাইড এক প্রকার তীব্র ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত, বর্ণহীন, বায়ু অপেক্ষা ভারী গ্যাস। ইহা জলে যথেষ্ট দ্রাব্য।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস দাহ্যও নহে, দাহকও নহে; জলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করাইলে কাঠিটি নিভিয়া যায়, গ্যাসটিও জ্বলে না।

(ii) সালফার ডাইঅক্সাইডের জলীয় দ্রবণে **সালফিউরাস অ্যাসিড** (H_2SO_3) নামে একটি মৃদু, অস্থায়ী অ্যাসিড উৎপন্ন হইবার ফলে জলীয় দ্রবণের আম্লিক ধর্ম পরিলক্ষিত হয়; উহা নীল লিট্‌মাসকে লাল করে :

$$SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$$

(iii) সালফার ডাইঅক্সাইড **অ্যাসিড-ধর্মী অক্সাইড** বলিয়া উহার সহিত ক্ষারের বিক্রিয়ায় সালফাইট ও বাইসালফাইট লবণ গঠিত হয়।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের ন্যায় সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসকেও পরিষ্কার স্বচ্ছ চুন-জলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিলে প্রথমে **অদ্রাব্য** ক্যালসিয়াম সালফাইট উৎপন্ন হওয়ার ফলে চুন-জল অস্বচ্ছ, ঘোলাটে হয়; কিন্তু দীর্ঘক্ষণ চালনা করিলে অবশেষে **দ্রাব্য** ক্যালসিয়াম বাইসালফাইট উৎপন্ন হইয়া দ্রবণটি পুনরায় স্বচ্ছ হয় :

$$Ca(OH)_2 + SO_2 = CaSO_3 + H_2O\ ;$$

$$CaSO_3 + H_2O + SO_2 = Ca(HSO_3)_2$$

(iv) সালফার ডাইঅক্সাইড **বিজারক পদার্থ**। ঈষৎ হরিদ্রাভ ক্লোরিন-জল, বা আয়োডিনের বেগুনী জলীয় অবদ্রবণের (suspension) মধ্য দিয়া সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করিলে ক্লোরিন, বা আয়োডিন

যথাক্রমে হাইড্রোক্লোরিক, বা হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিডে বিজারিত হইবার ফলে বর্ণহীন দ্রবণ উৎপন্ন হয় : $Cl_2 + SO_2 + 2H_2O = H_2SO_4 + 2HCl$;

$$I_2 + SO_2 + 2H_2O = H_2SO_4 + 2HI$$

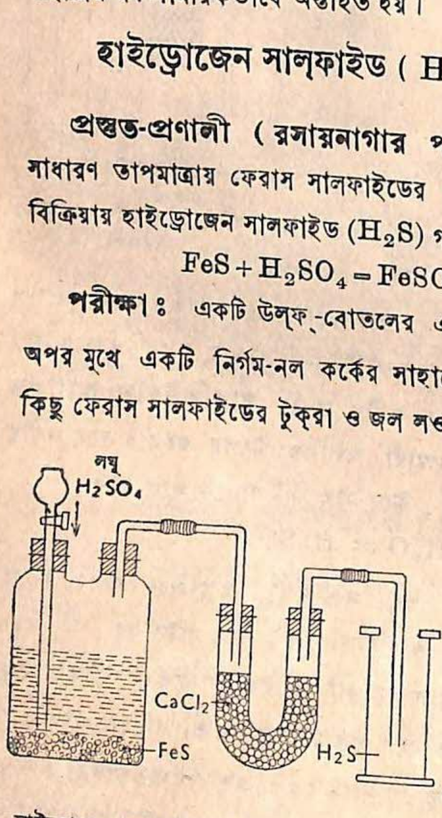
(v) **জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে** সালফার ডাইঅক্সাইডের **বিরঞ্জক ধর্ম** (bleaching property) লক্ষ্য করা যায়। পরিধেয় বস্ত্রাদি, রঙীন ফুল, ঘাস প্রভৃতি আর্দ্র অবস্থায় সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে উহাদের বর্ণ সাময়িকভাবে অন্তহিত হয়।

হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড (Hydrogen Sulphide)

প্রস্তুত-প্রণালী (রসায়নাগার পদ্ধতি) : রসায়নাগারে সচরাচর সাধারণ তাপমাত্রায় ফেরাস সালফাইডের সহিত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) গ্যাস প্রস্তুত করা হয় :

$$FeS + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2S$$

পরীক্ষা : একটি উল্‌ফ্‌-বোতলের এক মুখে একটি থিসেল-ফানেল ও অপর মুখে একটি নির্গম-নল কর্কের সাহায্যে সংযুক্ত করা হয়। বোতলটিতে কিছু ফেরাস সালফাইডের টুকরা ও জল লওয়া হয়, যাহাতে থিসেল-ফানেলটির নিম্নপ্রান্ত জলে নিমজ্জিত থাকে। এখন, ফানেলের মধ্য দিয়া গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড অল্প-অল্প করিয়া যোগ করিলে নির্গম-নলের পথে হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড গ্যাস নির্গত হইতে থাকে। এই গ্যাসের সহিত কিছু জলীয় বাষ্প মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড গ্যাস পাইতে হইলে উহাকে অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$), বা ফসফরাস পেণ্টক্সাইড (P_2O_5)-পূর্ণ স্তম্ভের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া গ্যাসটি বিশুদ্ধ করা হয় এবং অতঃপর বায়ুর ঊর্ধ্বাপসারণ পদ্ধতিতে গ্যাস-জারে সংগৃহীত হইয়া থাকে ; কারণ, হাইড্রোজেন সালফাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী।



হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুতির রসায়নাগার পদ্ধতি

ভৌত ধর্ম ঃ হাইড্রোজেন সালফাইড বর্ণহীন, বায়ু অপেক্ষা ভারী, পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত একটি যৌগিক গ্যাস। শ্বাস-প্রশ্বাসে কিছু হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস গ্রহণ করিলে উহার দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত বিক্রিয়ায় মানুষ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস জলে যথেষ্ট মাত্রায় দ্রবণীয়।

রাসায়নিক ধর্ম ঃ (i) হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস দাহক নহে, কিন্তু বায়ু, বা অক্সিজেনের মধ্যে জ্বালাইলে উহা নিজে নীলাভ শিখায় জ্বলে ; জলীয় বাষ্প ও সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন সরবরাহ অপ্রতুল হইলে হাইড্রোজেন সালফাইডের দহনে সালফার বিমুক্ত হয় :

$$2H_2S + 3O_2 = 2H_2O + 2SO_2 \; ; \; 2H_2S + O_2 = 2H_2O + 2S$$

(ii) হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস জলে যথেষ্ট দ্রবণীয় এবং জলীয় দ্রবণটি **মৃদু অ্যাসিড-ধর্মী** ; উহার সহিত ক্ষারীয় পদার্থের বিক্রিয়ায় হাইড্রোসালফাইড ও সালফাইড লবণ উৎপন্ন হয় :

$NaOH + H_2S = H_2O + NaHS$ (সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইড)

$2NaOH + H_2S = 2H_2O + Na_2S$ (সোডিয়াম সালফাইড)

(iii) হাইড্রোজেন সালফাইড **বিজারক পদার্থ** ; যেমন—

(a) ক্লোরিন-জল, অথবা আয়োডিনের জলীয় অবদ্রবণের মধ্য দিয়া হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করিলে হাইড্রোক্লোরিক, বা হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই H_2S এর জারণে হলুদ বর্ণের সালফারের বিমুক্তি ঘটে :

$$Cl_2 + H_2S = 2HCl + S \; ; \; I_2 + H_2S = 2HI + S$$

(b) অ্যাসিড-মিশ্রিত পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের বেগুনী বর্ণের দ্রবণে H_2S গ্যাস চালিত করিলে দ্রবণের বর্ণ অন্তর্হিত হয় :

$$2KMnO_4 + 3H_2SO_4 + 5H_2S = K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8H_2O + 5S$$

(iv) অনেক ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করিলে ধাতুগুলির সালফাইড লবণ অধঃক্ষিপ্ত হয়। কপার, লেড, প্রভৃতি ধাতুর লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যুক্ত দ্রবণ হইতে H_2S-এর বিক্রিয়ায় ধাতব সালফাইড অধঃক্ষিপ্ত হয় :

$CuSO_4 + H_2S = H_2SO_4 + CuS$ (কালো)

তৃতীয় অধ্যায় ঃ অনুশীলনী

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ পদার্থ

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. ভৌত গঠনের ভিত্তিতে পদার্থের ত্রিবিধ ভৌত অবস্থার মূল কারণ আলোচনা কর।

2. গলনাংক ও হিমাংক বলিতে কি বুঝায়? গলন, বা হিমায়ন-কালে পদার্থের তাপমাত্রার কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না কেন, তাহা ব্যাখ্যা কর। বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাংক ও হিমাংক যে সর্বদা একই হইয়া থাকে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা কিরূপে প্রমাণ করা যায়?

3. পরীক্ষাগারে ন্যাপথালিনের গলনাংক নির্ণয়ের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

4. তরল পদার্থের স্ফুটনাংক বলিতে কি বুঝায়? সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে জলের স্ফুটনাংক কি ভাবে নির্ণয় করা যায়, তাহা বর্ণনা কর। কোন তরলের স্ফুটনাংকের উপর উহার সংলগ্ন বাষ্পীয়, বা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রভাব আলোচনা কর।

5. বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাদির বিভিন্নতা দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা কর।

6. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন বলিতে কি বুঝায়? উহাদের পার্থক্যসমূহ আলোচনা কর। নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির কোন্‌টি কি প্রকার পরিবর্তন তাহার সমর্থনে যুক্তি দেখাও:— (i) জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে, (ii) মোমবাতি বায়ুতে জ্বালাইলে, (iii) লোহাকে চুম্বকে পরিণত করিলে, (iv) পোড়াচুনে জল যোগ করিলে, (v) বৈদ্যুতিক বাতির তারকুণ্ডলীর মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে, (vi) জলে চিনি, বা লবণ দ্রবীভূত করিলে ও (vii) আয়োডিনকে উর্ধ্বপাতিত করিলে।

7. রাসায়নিক ক্রিয়ার সহায়ক, বা নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন বিষয়সমূহ উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা কর।

8. মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ বলিতে কি বুঝায়? উহাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহের পারস্পরিক তুলনা কর।

9. ধাতু ও অ-ধাতুর মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্যসমূহ আলোচনা কর এবং ইহাদের কোন ব্যতিক্রম আছে কি না, তাহা উল্লেখ কর। ধাতুকল্প কাহাকে বলে?

10. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:—(i) অণু ও পরমাণু, (ii) মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ, (iii) অনুবটন, (iv) তাপ-উদ্গারী ও তাপ-শোষক বিক্রিয়া, (v) ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল, তাহা টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর ঃ

(i) মৌলিক, বা যৌগিক যে-কোন পদার্থের নিজস্ব ধর্মবিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণিকাকে কি বলা হয়? —অণু (…) ; পরমাণু (…)।

(ii) গ্যাসের তুলনায় তরলের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ কিরূপ? —বেশী (…) ; কম (…) ; সমান (…)।

(iii) কঠিন আয়োডিন জল ও কার্বন ডাইসালফাইডের মধ্যে কোন্‌টিতে দ্রবণীয়?— জল (…) ; কার্বন ডাইসালফাইড (…)।

(iv) যে ধরনের পরিবর্তনে পদার্থের উপাদানগত স্থায়ী মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, তাহাকে কি বলা হয় ?—ভৌত পরিবর্তন (...) ; রাসায়নিক পরিবর্তন (···)।

(v) হাইড্রোজেন গ্যাসের দহন-কালে কিরূপ তাপীয় পরিবর্তন ঘটে ?—তাপ উদ্ভূত হয় (...) ; তাপ শোষিত হয় (...)।

(vi) তড়িৎবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ধাতু ও অ-ধাতুর মধ্যে কোন্‌টি ঋণ-তড়িৎদ্বারে বিমুক্ত হয় ?—ধাতু (...) ; অ-ধাতু (···)।

2. নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, তাহা টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর ঃ

(i) তরল পদার্থের সুনির্দিষ্ট আয়তন থাকিলেও উহার কোন নির্দিষ্ট আকার থাকে না।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(ii) জলের উপরিস্থিত বাষ্পীয় চাপ বৃদ্ধি করিলে উহার স্ফুটনাংক বৃদ্ধি পায়।—ভুল(...) ; নির্ভুল (...)।

(iii) ভৌত, বা রাসায়নিক যে-কোন পরিবর্তনকালে উষ্ণতার অবশ্যই কিছু-না-কিছু পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। —ভুল (...) ; নির্ভুল (···)।

(iv) অ-ধাতুর তুলনায় ধাতুর গলনাংক ও স্ফুটনাংক সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া থাকে।—ভুল (···) ; নির্ভুল (...)।

(v) দুইটি মৌলিক পদার্থ যে-কোন অনুপাতে পরস্পর মিলিত হইয়া যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারে।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(vi) যে-কোন যৌগিক পদার্থের ধর্ম উহার মৌল উপাদানগুলির ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। —ভুল (...) ; নির্ভুল (···)।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তিগুলি নির্ভুল কর ঃ

(i) বিভিন্ন ভৌতাবস্থার মধ্যে — অবস্থায় পদার্থের আন্তঃআণবিক ব্যবধান সর্বাধিক।

(ii) যে পদার্থের উপস্থিতিতে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ — হয়, কিন্তু বিক্রিয়ান্তে পদার্থটির রাসায়নিক, বা — কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না, তাহাকে বলা হয় —।

(iii) এক ভাগ গাঢ় — অ্যাসিড ও তিন ভাগ গাঢ় — অ্যাসিডের মিশ্রণকে বলা হয় —।

(iv) যে সকল পদার্থ হইতে কোন প্রকার ভৌত, বা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারাও অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহাদের বলা হয় — পদার্থ।

(v) হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বিয়োজন-ক্রিয়ায় — ঋণাত্মক অনুঘটকের কাজ করে।

(vi) সাধারণতঃ ধাতব অক্সাইড যৌগ — সহিত বিক্রিয়ায়, এবং অধাতব অক্সাইড — সহিত বিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন করে।

(vii) মৌলিক পদার্থের অণু — ধরনের পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, কিন্তু যৌগিক পদার্থের অণুর সংগঠনে — ধরনের পরমাণু থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দ্রবণ ও দ্রাব্যতা

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. দ্রবণ বলিতে কি বুঝায়? দ্রবণ প্রস্তুতিকালে দ্রাবক ও দ্রাবের মধ্যে কোন রাসায়নিক মিলন ঘটে না, ইহার স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উল্লেখ কর।

2. সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ কাহাকে বলে? কোন সম্পৃক্ত দ্রবণকে শীতল করিলে উহার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে?

3. দ্রাব্যতার সংজ্ঞা লিখ এবং তরল দ্রাবকে কঠিন পদার্থের দ্রবণের ক্ষেত্রে তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে দ্রাব্যতার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে তাহা আলোচনা কর।

4. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(i) দ্রাব্যতা-লেখ, (ii) সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল, তাহা টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :

(i) যে-কোন দুইটি গ্যাস কি অনুপাতে পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া সমসত্ত্ব গ্যাস-দ্রবণ গঠন করিতে পারে?—কোন নির্দিষ্ট অনুপাতে (...) ; যে-কোন অনুপাতে (...)।

(ii) যে দ্রবণের সংস্পর্শে দ্রাব পদার্থ অদ্রবীভূত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহাকে কি বলা হয়?—সম্পৃক্ত দ্রবণ (...) ; অসম্পৃক্ত দ্রবণ (...)।

(iii) সোডা জলে দ্রবীভূত করিলে কিরূপ তাপীয় পরিবর্তন ঘটে?—তাপ উদ্ভূত হয় (...) ; তাপ শোষিত হয় (...)।

(iv) তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিলে জলে সাধারণ খাদ্য-লবণের দ্রাব্যতার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে? —দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায় (...) ; দ্রাব্যতা হ্রাস পায় (...)।

2. নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, তাহা টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :

(i) 25°C তাপমাত্রায় যে-দ্রবণ সম্পৃক্ত, তাহা 50°C তাপমাত্রায় অসম্পৃক্ত।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(ii) 53°C তাপমাত্রা পর্যন্ত জলে সোডিয়াম সালফেট লবণের দ্রাব্যতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, অতঃপর তাহা হ্রাস পাইতে থাকে।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(iii) কোন দ্রবণের উপাদানসমূহের পারস্পরিক অনুপাত একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যথেচ্ছ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তিগুলি নির্ভুল কর :

(i) যে পদার্থের মধ্যে অপর কোন পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া — উৎপন্ন করে, তাহাকে বলা হয় —, আর অপর পদার্থটিকে বলা হয় —

(ii) —গ্রাম দ্রাবকে যত গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত হইলে — দ্রবণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে দ্রাব পদার্থ টির — ।

(iii) দ্রবণ হইল — মিশ্র পদার্থ, অর্থাৎ দ্রবণের যে-কোন অংশে উপাদানগুলির পারস্পরিক অনুপাত — ।

(iv) কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে —পরিমাণ দ্রাব পদার্থ দ্রবীভূত থাকিলে এইরূপ দ্রবণকে বলা হয় — দ্রবণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাসায়নিক সমীকরণ

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. প্রতীক ও সংকেত বলিতে কি বুঝায়? উহাদের তাৎপর্য বিশদভাবে আলোচনা কর।

2. রাসায়নিক সমীকরণ কাহাকে বলে? সমীকরণের সঠিক প্রকাশ-পদ্ধতি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

3. রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য কি কি? '$N_2 + 3H_2 = 2NH_3$' সমীকরণটি হইতে কি কি বিষয় বুঝা যায়, তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

4. নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলিকে রাসায়নিক সমীকরণের আকারে প্রকাশ কর :—

(i) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড + নাইট্রিক অ্যাসিড = সোডিয়াম নাইট্রেট + জল।

(ii) কপার + নাইট্রিক অ্যাসিড = কপার নাইট্রেট + নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড + জল।

(iii) হাইড্রোজেন সালফাইড + ক্লোরিন = সালফার + হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

(iv) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড + ক্যালসিয়াম অক্সাইড = অ্যামোনিয়া + ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড + জল।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল, তাহা টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :

(i) পটাশিয়ামের প্রতীক কি ?—K (...) ; P (...)।

(ii) 2N বলিতে কি বুঝায় ?—একটি নাইট্রোজেন-অণু (...) ; দুইটি বিচ্ছিন্ন নাইট্রোজেন-পরমাণু (...)।

(iii) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনে জল গঠনের বিক্রিয়াটির সঠিক সমীকরণ কি ?—$H + O = H_2O$ (...) ; $H_2 + O_2 = H_2O$ (...); $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ (...)।

2. নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :

(i) '$2H_2+O_2=2H_2O$' সমীকরণটি হইতে বুঝা যায়, 2 সি. সি. হাইড্রোজেনের সহিত 1 সি. সি. অক্সিজেনের মিলনে 2 সি. সি. তরল জল উৎপন্ন হয়।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(ii) K প্রতীক দ্বারা পটাশিয়ামের অণু, বা পরমাণু যে-কোনটি বুঝায়।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(iii) কোন্ বিক্রিয়া কত দ্রুত নিষ্পন্ন হয় তাহা বিক্রিয়াটির সমীকরণ হইতে বুঝা যায়।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...)।

(iv) কোন মৌলের প্রতীক দ্বারা উহার গ্র্যাম-অণু ওজন পরিমাণ বুঝায়।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...) ;

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তিগুলি নির্ভুল কর :

(i) রাসায়নিক সমীকরণের দক্ষিণ ও বাম উভয় পক্ষে যে-কোন মৌলের মোট — সর্বদা — হইতে হইবে।

(ii) মৌলিক, বা যৌগিক যে-কোন পদার্থের অণু যে-সকল — সমষ্টির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, তাহাকে বলা হয় পদার্থটির —।

(iii) যে-কোন পদার্থের আণবিক সংকেত দ্বারা পদার্থ টির এক — ওজন-পরিমাণ বুঝায়।

(iv) মৌলের প্রতীক লিখিবার প্রচলিত পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী —।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তড়িৎবিশ্লেষণ

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ ও তড়িৎবিশ্লেষণ বলিতে কি বুঝায়? জলের তড়িৎবিশ্লেষণের পরীক্ষামূলক কৌশল বর্ণনা কর এবং তড়িৎবিশ্লেষণের ফলাফল লিখ।

2. খাদ্য-লবণের জলীয় দ্রবণের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হয়, কিন্তু চিনির জলীয় দ্রবণ তড়িৎ-অপরিবাহী ও আরহেনিয়াসের তড়িৎবিয়োজন তত্ত্বের ভিত্তিতে ইহার কারণ ব্যাখ্যা কর।

3. তড়িৎপ্রলেপন বলিতে কি বুঝায় তাহা দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা কর। কপারের পাত্রের উপর সিলভারের আস্তরণ ও আয়রণের পাত্রের উপর নিকেলের আস্তরণ কিভাবে গঠন করা যাইতে পারে?

4. জলের তড়িৎবিশ্লেষণ-ক্রিয়া কিছুক্ষণ চলিবার পর তড়িৎদ্বারের সহিত ব্যাটারীর সংযোগ উল্টাইয়া দিলে, অর্থাৎ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার দুইটিকে ব্যাটারীর যথাক্রমে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক প্রান্তের সহিত যুক্ত করিলে ফলাফল কি হইবে, তাহা যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর।

5. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(i) তড়িৎ-বিয়োজন, (ii) ক্যাথোড ও অ্যানোড, (iii) তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ ও তড়িৎবিশ্লেষণ, (iv) তড়িৎবিশ্লেষণের ব্যবহারিক প্রয়োগ, (v) আয়ন।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল, টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :

(i) তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থসমূহ কোন্ অবস্থায় তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম ?—কঠিন অবস্থায় (…) ; কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় (…)।

(ii) তড়িৎবিশ্লেষণ কালে যে তড়িৎদ্বারটি ব্যাটারীর ধনাত্মক প্রান্তের সহিত যুক্ত থাকে, তাহাকে কি বলা হয় ?—ক্যাথোড (…) ; অ্যানোড (…)।

(iii) কোন ধাতব পরিবাহীর মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে উহার কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে ?—ভৌত পরিবর্তন (…) ; রাসায়নিক পরিবর্তন (…)।

(iv) কোন ধাতব বস্তুর উপর অন্য কোন ধাতুর তড়িৎপ্রলেপন করিবার জন্য বস্তুটিকে কোন্ তড়িৎদ্বার হিসাবে ব্যবহার করিতে হয় ? —ক্যাথোড (…) ; অ্যানোড (…)।

2. নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :

(i) বিশুদ্ধ জল অতি উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(ii) সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্য দিয়া তড়িৎ চলাচল করিতে পারে, কিন্তু অ্যালকোহল তড়িৎ-পরিবহনে অক্ষম।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(iii) জলের তড়িৎবিশ্লেষণে সমান আয়তন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস বিমুক্ত হয়।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(iv) সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণকে জলে দ্রবীভূত করিলে উহা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সোডিয়াম ক্যাটায়ন ও ক্লোরাইড অ্যানায়নে বিয়োজিত হয়।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তিগুলি নির্ভুল কর :

(i) উত্তাপে বিগলিত, বা কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত অবস্থায় যে-কোন — পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িৎ চালনা করিলে উহার রাসায়নিক — ঘটিয়া — ধর্মবিশিষ্ট একাধিক নূতন — উৎপন্ন হয়।

(ii) কোন পরমাণু, বা পরমাণু-জোট হইতে ইলেকট্রন বর্জিত হইলে, অথবা উহার সহিত ইলেকট্রন সংযুক্ত হইলে যথাক্রমে — ও — তড়িৎ-আধানবিশিষ্ট আয়ন উৎপন্ন হয়। ধনাত্মক আয়নকে বলা হয় — ও ঋণাত্মক আয়নকে বলে —।

(iii) লৌহ-নির্মিত দ্রব্যের উপর নিকেল-প্রলেপন করিতে হইলে দ্রব্যটিকে — হিসাবে এবং নিকেল ধাতুর একটি পাতকে — হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

(iv) যে-সকল — পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িৎ চালনা করিলে উহাদের কোনরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না, তাহাদের বলা হয় — —।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. অ্যাসিড ও ক্ষার বলিতে কি বুঝায়? কোন পদার্থ অ্যাসিড না ক্ষার, তাহা কিভাবে পরীক্ষা করিবে?

2. নিম্নলিখিত লবণগুলির জলীয় দ্রবণ প্রশম, না আম্লিক, না ক্ষারীয়, তাহা উল্লেখ কর এবং ইহার কারণ ব্যাখ্যা কর :—(i) NaCl, (ii) $KHCO_3$, (iii) KNO_3, (iv) $Pb(OH)NO_3$।

3. ক্ষারের সংজ্ঞা লিখ। 'ক্ষারক মাত্রেই ক্ষার, কিন্তু সকল ক্ষারই ক্ষারক নহে'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

4. লবণ কাহাকে বলে? লবণ কয় প্রকার, তাহা উদাহরণ সহকারে আলোচনা কর।

5. প্রশমন-ক্রিয়া বলিতে কি বুঝায়? কোন প্রশমন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না, তাহা কিভাবে পরীক্ষা করিবে?

6. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(i) অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ, (ii) অম্ল-লবণ ও ক্ষার-লবণ, (iii) প্রশমন-ক্রিয়া।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল, টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর ঃ

(i) ধাতু, না অ-ধাতু, কাহার অক্সাইড যৌগকে জলে দ্রবীভূত করিলে সাধারণতঃ আম্লিক দ্রবণ উৎপন্ন হয়। —ধাতু (…) ; অ-ধাতু (…)।

(ii) ক্ষারের সহিত বিক্রিয়ায় কোন অ্যাসিডের হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলি কোন ধাতু দ্বারা আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত হইয়া যে লবণ গঠিত হয়, তাহাকে কি বলে?—ক্ষার-লবণ (…) ; অম্ল-লবণ (…)।

(iii) KCl-এর জলীয় দ্রবণের প্রকৃতি কিরূপ?—আম্লিক (…) ; প্রশম (…) ; ক্ষারীয় (…)।

(iv) $Fe(OH)_3$-কে কি ক্ষারক বলা যাইতে পারে?—হ্যাঁ (…) ; না (…)।

2. নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর ঃ

(i) ক্ষারের সংস্পর্শে নীল লিট্‌মাস লাল বর্ণ ধারণ করে।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(ii) সাধারণতঃ ধাতব অক্সাইড যৌগসমূহ আম্লিক প্রকৃতিবিশিষ্ট।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(iii) অম্ল-লবণের সহিত ক্ষারের বিক্রিয়ায় প্রশম লবণ উৎপন্ন হয়।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(iv) যে-কোন অ্যাসিড ও ক্ষারের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় সর্বদাই কোন-না-কোন লবণ গঠিত হয়, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই জল উৎপন্ন না-ও হইতে পারে।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তিগুলি নির্ভুল কর :

(i) যে-কোন অ্যাসিডের — পরমাণু ধাতু, বা যৌগ-মূলক দ্বারা আংশিক, বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হইলে — উৎপন্ন হয়।

(ii) — জাতীয় যে-সকল হাইড্রক্সাইড যৌগ জলে দ্রবণীয়, তাহাদের বলা হয় —।

(iii) অ্যাসিড ও ক্ষারের পারস্পরিক — প্রাপ্ত দ্রবণের সংস্পর্শে — কোনরূপ বর্ণ-পরিবর্তন ঘটে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : জারণ ও বিজারণ

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. জারণ ও বিজারণ-ক্রিয়া বলিতে কি বুঝায় উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা কর।

2. নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি জারণ না বিজারণ-ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত তাহা যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর :—(i) $FeSO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3$, (ii) $H_2O \rightarrow H_2$, (iii) $H_2SO_4 \rightarrow SO_2$, (iv) $HCl \rightarrow Cl_2$, (v) $KI \rightarrow I_2$।

3. 'কেবল অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়াকেই জারণ বলে না, জারণ-ক্রিয়ার অর্থ আরও ব্যাপক'—দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা কর। বিজারণ-ক্রিয়া কাহাকে বলে?

4. 'জারণ ও বিজারণ-ক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলিতে কোন্‌টি জারণ-ক্রিয়া ও কোন্‌টি বিজারণ-ক্রিয়া তাহা উল্লেখ কর :— (i) $2NaBr+2H_2SO_4=Na_2SO_4+SO_2+Br_2+2H_2O$; (ii) $SO_2+2H_2S=3S+2H_2O$; (iii) $2KI+Cl_2=2KCl+I_2$; (iv) $C+H_2O=CO+H_2$; (v) $AlCl_3+3Na=Al+3NaCl$।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. কোন্ উত্তরটির নির্ভুল, টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :

(i) যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন যৌগের ধাতব উপাদানের আনুপাতিক পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহাকে কি বলে?—জারণ (…) ; বিজারণ (…)।

(ii) কোন যৌগ হইতে হাইড্রোজেনের অপসারণ-ক্রিয়াকে কি বলা হয়?—জারণ (…) ; বিজারণ (…)।

(iii) যে পদার্থের প্রভাবে অন্য কোন পদার্থ জারিত হয়, তাহার নিজের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে?—জারিত হয় (…) ; বিজারিত হয় (…)।

(iv) কোন ধাতু ও অ-ধাতুর পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফলে অ-ধাতুটির কিরূপ পরিবর্তন ঘটে?—জারণ ঘটে (…) ; বিজারণ ঘটে (…)।

2. নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, টিক্ (√) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :

(i) কোন যৌগের অ-ধাতব উপাদানের অপসারণ-ক্রিয়াকে বলা হয় বিজারণ।—ভুল (…); নির্ভুল (…)।

(ii) '$Fe_2O_3+2Al=2Fe+Al_2O_3$' বিক্রিয়াটিতে অ্যালুমিনিয়াম ফেরিক অক্সাইডকে আয়রনে জারিত করিতেছে।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(iii) কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারণ, বা বিজারণ-ক্রিয়া কখনই এককভাবে ঘটা সম্ভব নহে।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তিগুলি নির্ভুল কর :

(i) যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন মৌলের সহিত কোন একটি অ-ধাতব মৌলের সংযোগ ঘটে, তাহাকে বলা হয় — ।

(ii) জারণ ও বিজারণ-ক্রিয়া পরস্পরের — প্রক্রিয়া।

(iii) '$Fe+H_2SO_4=FeSO_4+H_2$' বিক্রিয়াটিতে $Fe \rightarrow FeSO_4$ — ক্রিয়া এবং $H_2SO_4 \rightarrow H_2$ — ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

(iv) কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে-পদার্থটি জারিত হয় তাহা অবশ্যই অপর কোন পদার্থকে — করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বায়ু

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. তরল বায়ু কিভাবে প্রস্তুত করা হয়? এই পদ্ধতির মূল নীতি কি? তরল বায়ুর সর্বপ্রধান ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ কর।

2. উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে নাইট্রোজেন প্রধানতঃ কি আকারে থাকে? 'নাইট্রোজেন-চক্র' বলিতে কি বুঝায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

3. বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণের পারস্পরিক সঙ্গতি কিভাবে রক্ষিত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর। 'কার্বন-চক্র' বলিতে কি বুঝায়?

4. 'উদ্ভিদেরা শ্বাস-ক্রিয়ায় বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে, আবার খাদ্য-প্রস্তুতির জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করিয়া অক্সিজেন বিমুক্ত করে—ব্যাখ্যা কর।

5. বায়ুর বিরল গ্যাসীয় উপাদানগুলির নাম লিখ। কোন্ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বায়ু হইতে এই গ্যাসগুলিকে পৃথকীকৃত করা হয়? উহাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ আলোচনা কর।

6. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(i) নাইট্রোজেন-চক্র, (ii) তরল বায়ু প্রস্তুতি, (iii) সালোক-সংশ্লেষ, (iv) কার্বন-চক্র, (v) হিলিয়াম ও নিয়নের ব্যবহার।

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল, তাহা টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর ঃ

(i) বায়ু কি ধরনের পদার্থ ?—মৌলিক পদার্থ (···) ; যৌগিক পদার্থ (···) ; বিভিন্ন গ্যাসের সাধারণ মিশ্রণ (···) ।

(ii) তরল নাইট্রোজেন ও তরল অক্সিজেনের মধ্যে কোন্‌টি বেশী উদ্বায়ী ?—তরল নাইট্রোজেন (...) ; তরল অক্সিজেন (...) ।

(iii) কোন্ ধরনের ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে অ্যামোনিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া নাইট্রোজেন বিমুক্ত হয় ?—নাইট্রিফাইং (...) ; ডি-নাইট্রিফাইং (···) ।

(iv) উচ্চচাপ-পিষ্ট কোন গ্যাসকে সহসা প্রসারিত করিলে উহার তাপমাত্রার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে ?—তাপমাত্রা হ্রাস পায় (...) ; তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় (···) ।

2. নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর ঃ

(i) বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের আয়তন-ভিত্তিক শতকরা পরিমাণ মোটামুটিভাবে যথাক্রমে 20 ভাগ ও 77 ভাগ ।—ভুল (···) ; নির্ভুল (...) ।

(ii) উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পাতার সবুজ-কণা, বা ক্লোরোফিল অনুঘটকের কাজ করে ।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...) ।

(iii) সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতিতে নিয়ন গ্যাস থাকে ।—ভুল (...) ; নির্ভুল (...) ।

(iv) মৃত প্রাণী, বা উদ্ভিদ-দেহ মাটিতে পচনকালে অ্যামোনিয়া বিমুক্ত হয় ।—ভুল (···) ; নির্ভুল (···) ।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তিগুলি নির্ভুল কর ঃ

(i) বায়ুতে — বিরল ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস মিশ্রিত রহিয়াছে ।

(ii) যে-সকল উদ্ভিদ সরাসরি বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া যৌগ-আকারে সংবদ্ধ করিতে পারে, তাহাদের বলা হয় — উদ্ভিদ ; —, — প্রভৃতি এই জাতীয় উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত ।

(iii) উদ্ভিদেরা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে — অনুঘটন-প্রভাবে জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পারস্পরিক জটিল ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় নিজ দেহের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় — খাদ্য প্রস্তুত করে ; ইহাকে বলা হয় — প্রক্রিয়া ।

(iv) বায়ুর বিরল গ্যাসীয় উপাদানগুলি তরল বায়ুর — — প্রক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যায় ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : কয়েকটি সাধারণ গ্যাস

A. সাধারণ প্রশ্নাবলী (General Questions)

1. রসায়নাগারে অক্সিজেন গ্যাস কিভাবে প্রস্তুত করা হয় বর্ণনা কর এবং ব্যবহৃত যন্ত্রসজ্জার একটি পরিষ্কার চিত্র আঁক। এই পদ্ধতিতে MnO_2-কে অনুঘটক বলা হয় কেন তাহা ব্যাখ্যা কর। অক্সিজেনের জারণ-ধর্মের একটি উদাহরণ দাও।

2. হাইড্রোজেন প্রস্তুতির রসায়নাগার-পদ্ধতিটি বর্ণনা কর। CuO-এর সঙ্গে হাইড্রোজেনের কি অবস্থায় কিরূপ বিক্রিয়া ঘটে ?

3. জায়মান হাইড্রোজেন কাহাকে বলে? 'সাধারণ হাইড্রোজেনের তুলনায় জায়মান হাইড্রোজেনের বিজারণ-ক্ষমতা অনেক বেশী'—ইহার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর।

4. রসায়নাগারে নাইট্রোজেন প্রস্তুতির পদ্ধতি বর্ণনা কর। কোন একটি গ্যাস নাইট্রোজেন, না অক্সিজেন তাহা কিরূপ সনাক্ত করিবে ?

5. রসায়নাগারে কিভাবে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয়? অ্যামোনিয়া গ্যাস বিশুষ্ক করিতে হইলে গাঢ় H_2SO_4, বা P_2O_5 ব্যবহার করা যায় কি? অ্যামোনিয়া গ্যাস সনাক্ত করা যায় কিভাবে ?

6. 'অ্যামোনিয়া-দ্রাব' কাহাকে বলে? ইহা আম্লিক, না ক্ষারীয় প্রকৃতিবিশিষ্ট তাহা কিভাবে প্রমাণ করিবে? অ্যামোনিয়ার সহিত নিম্নলিখিত পদার্থগুলির রাসায়নিক বিক্রিয়া বর্ণনা কর :—(i) HCl, (ii) Na, (iii) Cl_2, (iv) $CuSO_4$, (v) O_2।

7. কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতির রসায়নাগার-পদ্ধতিটি বর্ণনা কর। কার্বন ডাইঅক্সাইডে কার্বন আছে, তাহা কিরূপে প্রমাণ করিবে ?

8. চুনাপাথর ($CaCO_3$) হইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতিতে HCl-এর পরিবর্তে H_2SO_4 ব্যবহার করিলে কি অসুবিধা ঘটে? নিম্নলিখিত বিক্রিয়াসমূহের ফলাফল সমীকরণ-সহ বর্ণনা কর :—(i) চুন-জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রবাহিত করিলে, (ii) উত্তপ্ত কার্বনের উপর দিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালিত করিলে, (iii) জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়াম-তার কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করাইলে।

9. রসায়নাগারে বিশুষ্ক সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করা যায় কিভাবে? সালফার ডাইঅক্সাইডের জারণ ও বিজারণ-ধর্মের একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দাও।

10. রসায়নাগারে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুতির পদ্ধতি বর্ণনা কর। ইহার দুইটি প্রধান প্রধান রাসায়নিক ধর্ম আলোচনা কর।

11. (ক) ক্লোরিন-জল, (খ) অ্যাসিড-যুক্ত পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ, (গ) অ্যাসিড-যুক্ত কপার সালফেট দ্রবণ, ও (ঘ) অ্যামোনিয়া-যুক্ত জিঙ্ক নাইট্রেট দ্রবণের মধ্য দিয়া হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করিলে কি ফলাফল ঘটে, তাহা সমীকরণ-সহ বর্ণনা কর। H_2S প্রস্তুতির রসায়নাগার-পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিডের পরিবর্তে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করা যায় কি ?

B. বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী (Objective Questions)

1. কোন্ উত্তরটি নির্ভুল, টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :

(i) H_2S-এর জলীয় দ্রবণের সংস্পর্শে লিটমাসের কিরূপ বর্ণ-পরিবর্তন ঘটে ?—নীল হইতে লাল (…) ; লাল হইতে নীল (…)।

(ii) অ্যামোনিয়া বিশুদ্ধীকরণে কোন্ পদার্থটি ব্যবহার করা হয় ?—P_2O_5 (…) ; CaO (…) ; H_2SO_4 (…)।

(iii) কপার সালফেট দ্রবণে কোন্ গ্যাস চালনা করিলে গাঢ় নীল বর্ণের দ্রবণ পাওয়া যায় ?—NH_3 (…) ; H_2S (…) ; SO_2 (…)।

(iv) বিরঞ্জক ধর্মবিশিষ্ট কোন্ গ্যাসের সংস্পর্শে চুন-জল অস্বচ্ছ, ঘোলাটে হইয়া যায় ?—SO_2 (…) ; CO_2 (…) ; H_2S (…)।

(v) অক্সিজেন ও নাইট্রিক অক্সাইডের বিক্রিয়ায় যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহার বর্ণ কিরূপ ?—হলুদ (…) ; বাদামী (…) ; সবুজ (…)।

2. নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ভুল না নির্ভুল, টিক্ (✓) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ কর :

(i) MnO_2 না মিশাইয়া শুধু পটাশিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করিলেও অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(ii) অ্যাসিড-মিশ্রিত লেড নাইট্রেট দ্রবণে H_2S গ্যাস চালনা করিলে লেড সালফাইডের অধঃক্ষেপ পড়ে। — ভুল (…) নির্ভুল (…)।

(iii) কার্বন ডাইঅক্সাইডের জলীয় দ্রবণ অ্যাসিডধর্মী।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

(iv) সাধারণ, সঞ্চিত হাইড্রোজেন গ্যাস অপেক্ষা সদ্য-উৎপন্ন, জায়মান হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা অনেক বেশী।—ভুল (…) ; নির্ভুল (…)।

3. শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া উক্তিগুলি নির্ভুল কর :

(i) একটি কাঁচ-দণ্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে নিমজ্জিত করিয়া অতঃপর — গ্যাসে প্রবেশ করাইলে — এর গাঢ় সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়।

(ii) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের — বর্ণের দ্রবণে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ও কয়েক খণ্ড জিংক যুক্ত করিলে সদ্য-উৎপন্ন — হাইড্রোজেন দ্বারা পারম্যাঙ্গানেটের — দরুণ দ্রবণটি — হইয়া পড়ে।

(iii) SO_2-এর জলীয় দ্রবণে H_2S গ্যাস চালনা করিলে SO_2 — ও H_2S — হয় এবং — অধঃক্ষিপ্ত হয়।

(iv) — মিশ্রিত কপার সালফেট দ্রবণে H_2S গ্যাস প্রবাহিত করিলে — এর কালো অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।

(v) হাইড্রোজেন গ্যাসকে বায়ু, বা অক্সিজেনের মধ্যে জ্বালাইলে উহা — শিখায় জ্বলিতে থাকে এবং — উৎপন্ন হয়।